ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ দশম সংখ্যা □ জুন ২০১৪ □ ৩০ টাকা

Read Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

মহাশ্বেতা দেবীর
বই পড়া কি কমে যাচ্ছে?

ড. অমল কে ভৌমিকের
লৌকিক প্রবাদে
গাণিতিক উপাদান

শুভাপ্রসন্নর
ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার ছবিজীবন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্ট্রিট লেন বাই-লেন

দিনাজপুরের ধাঁধা
হরিপদ পাল

ধারাবাহিক উপন্যাস
জাহাজঘাটা
হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি
অনুবাদ: তরুণ ঘটক

রাজ্যপাট
সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কমলহিরের আলো
নীলকণ্ঠ ঘোষাল

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ কথা
ভ্রমণে ভূমিকম্প

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক
ছিন্নবিচিন্তা

কেন লিখি
মণীন্দ্র গুপ্ত
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
সরল দে
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
দেবেশ রায়
বিজয়া মুখোপাধ্যায়

কালীকৃষ্ণ গুহর কলমে গ্রিক কথামৃত। নাসের হোসেনের কবিতা। চণ্ডীমণ্ডপ: কাঁঠাল-ভোজন। বই-ঠেক। ক্ষণের বচন। শব্দবক্র

৩০"×৩৬" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছোটদের পরামর্শ পত্রিকা

প্রকাশিত হয়েছে

সাতরাজার ধন ছুটিসংখ্যা ২০১৪

ছেলেবেলা

- ভূতের গল্প
- গোয়েন্দা গল্প
- হাসির গল্প
- রোমাঞ্চ গল্প
- মজার গল্প
- উপন্যাস
- উপকথা
- ছড়া-কবিতা
- আরও অনেক কিছু

সব গল্পই বারবার পড়তে ইচ্ছে হবে। সবাইকে পড়াতেও ইচ্ছে করবে।

১৩২ পাতা। দাম মাত্র ২৫ টাকা।

এই সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে
একশো বছর আগে লেখা
ছোটদের বড় হয়ে ওঠার
কালজয়ী ফরাসি উপন্যাস
হারামণি
মৈত্রেয়ী নাগের বাংলা কথনে

চণ্ডী লাহিড়ীর পেঁচোয় ধরলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
নতুন গল্প
মুড়োহাসা গ্রামে

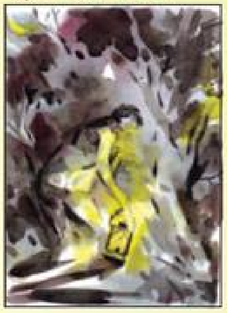

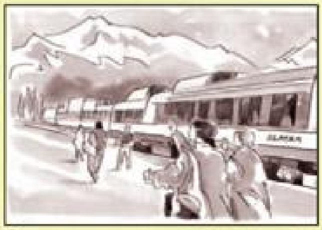

ফিরে পড়ার গল্প আলাস্কার সোনা

তরুণকুমার সরখেলের
মেছো ভালুক

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে
মারাঠি উপকথা রত্নবৃষ্টি

রতনতনু ঘাটির কলমে মিশমি উপকথা
কী করে আকাশে চাঁদ হল

অদ্ভুত সুন্দর পাখিরা

অরুণাভ দাসের
ভোরের ট্রেনের সেই লোকটা

অদিতি ভট্টাচার্যের
চোর ধরলেন পিসিমণি

মণিমাণিক্যের পাহাড়

আইভি চট্টোপাধ্যায়ের
বাহন নিয়ে সাত কাহন

অনন্যা দাসের
ভয়ানকের খপ্পরে

মৈত্রেয়ী নাগের অন্য ধাঁচের লেখা
জানছি মোরা আহ্লাদে

সৌম্যকান্তি গুপ্তর
ধারাবাহিক উপন্যাস
ভ্যানিশ

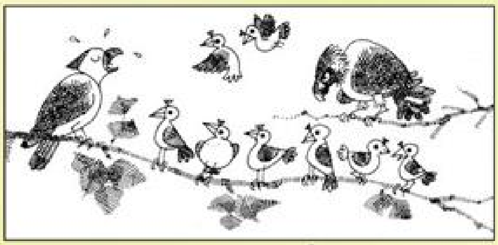

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পাখির খাতা

পুরো পত্রিকা জুড়েই এরকম লেখা ও ছবির মণিমাণিক্য

সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে ও পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে

সারা বছরের জন্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' ঘরে বসেই পেতে পারো। এখনই গ্রাহক হলে ছুটিসংখ্যাও পাবে। সেজন্য বাড়তি দাম লাগবে না।

আমাদের দপ্তরে ২৫ টাকা পাঠালে তোমার ঠিকানায় আমরাই ক্যুরিয়ারে ছুটিসংখ্যার 'ছেলেবেলা' পাঠিয়ে দেব।

অনলাইন গ্রাহক হতে ▶ www.swarnakshar.in

এজেন্টগণ ছুটিসংখ্যার বাড়তি চাহিদা জানিয়ে এখনই ফোন বা ফ্যাক্স করুন। নতুন এজেন্সির জন্যও যোগাযোগ:
ফোন: ২২৮৩ ২৩২০, ২২৮৩ ৫৫২৬ ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮
ই-মেল: info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane
Kolkata-700 019

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

স্টলে প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে অর্ধেক দামে

এবার ঘরে বসে
অর্ধেক দামে নিয়মিত
পত্রিকা পেতে গ্রাহক হোন

নীচের নামে ও ঠিকানায়
১৮০ টাকার চেক পাঠান

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

অনলাইন গ্রাহক হতে লগ অন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 Fax: 2287 6448 E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in
Editor's Website: www.amarendrachakravorty.com

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

₹২০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

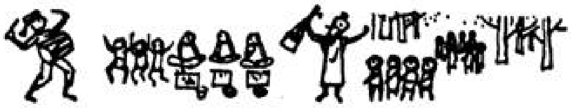

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

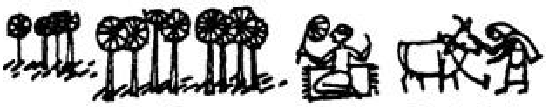

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

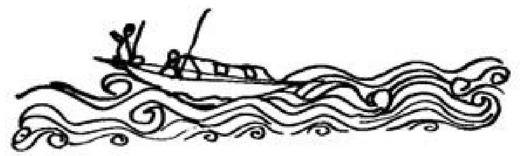

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

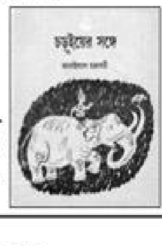

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। দশম সংখ্যা। জুন ২০১৪। আষাঢ় ১৪২১

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৭

ক্ষণের বচন ১২। শব্দবক্র ১২

চণ্ডীমণ্ডপ। কাঁঠাল-ভোজন। চণ্ডী লাহিড়ী ৯

বই পড়া কি কমে যাচ্ছে?। মহাশ্বেতা দেবী ২২

সাক্ষাৎকার। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ১৩

লৌকিক প্রবাদে গাণিতিক উপাদান। ড. অমল কে ভৌমিক ২৪

নি য় মি ত

গ্রিক কথামৃত। কালীকৃষ্ণ গুহ ২০

আত্মজীবনী

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৪৪

ছিন্নবিচিন্তা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯

বি শে ষ র চ না

কেন লিখি ৬৭

মণীন্দ্র গুপ্ত • শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় • সরল দে • সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
দেবেশ রায় • বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ক বি তা র পা তা

নাসের হোসেনের চারটি কবিতা ৭৪

ভ্র ম ণ ক থা

ভ্রমণে ভূমিকম্প। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩১

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এসপ্ল্যানেড ৭৭

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির। জাহাজঘাটা ৩৭
অনুবাদ: তরুণ ঘটক

কমলহিরের আলো। নীলকণ্ঠ ঘোষাল ৫৯

রাজ্যপাট। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৪১

অ ন্যা ন্য

দিনাজপুরের ধাঁধা। হরিপদ পাল ৬৫

পাঠকের চিঠি ৭৬। বই-ঠেক ৫২

প্রচ্ছদ: ৩০"× ৩৬" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

অনিবার্য কারণে মে সংখ্যা প্রকাশ করা গেল না। এর জন্য গ্রাহকেরা মেয়াদ শেষে ওই সংখ্যার পরিবর্তে অতিরিক্ত একটি সংখ্যা পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail : kashtipathar@swarnakshar.in

Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০
অনলাইনেও পাবেন www.swarnakshar.in
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
দ্বিতীয় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০
স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in
স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 Fax: 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকানে ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

আষাঢ় ১৪২১ □ জুন ২০১৪

... সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন,/
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বড়ো।'/
দেশে দেশে সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থড়োথড়ো/
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি/বুদ্ধদেব বসু

উৎসর্গ

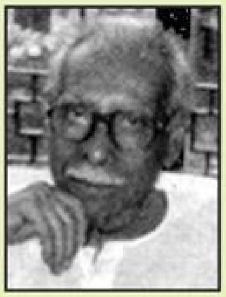

বাংলা কবিতায় জাদু-বাস্তবের স্রষ্টা, যিনি আমাদের দিনগত আত্মজীবনী থেকে মুক্ত করে নিয়ে যান যেখানে 'মৌপোকাদের গ্রাম', যেখানে অবিরাম 'বনে আজ কনচের্টো', সেই কবি মণীন্দ্র গুপ্তকে এ সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ করে আমরা গৌরবান্বিত।

স ম্পা দ কী য়

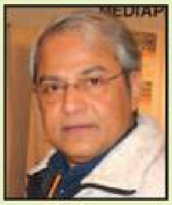

কত বড় বড় খবর চারদিকে শোরগোল তুলে, পাঠকের মন তোলপাড় করে অল্প কিছুদিনেই কর্পূরের মতো মিলিয়ে যায়। অথবা মাটি চাপা পড়ে। সেসব খবর কেউ আর খুঁড়েও দেখে না। সাহিত্যেও এমন ঘটে। সংবাদের যেমন দু-চার দিনের মেয়াদ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়তো তা দু-চার বছরের। সাময়িক এই গণ্ডি ছাড়িয়ে দূর কালের যাত্রী হতে পারে আর ক'টা সাহিত্যসৃষ্টি! প্রতি বছর যত বই লেখা হয়, এক দশকে যত বই প্রকাশিত হয়, তার দুয়েকটিই মাত্র দীর্ঘকাল ব্যাপী কয়েকজন নতুন পাঠকের আবিষ্কারের যোগ্য, তাই প্রকৃত পাঠকের অপেক্ষায় থাকে। সব দেশে, সব ভাষায়ই এটা ঘটে।

সংবাদের আয়ু আর সাহিত্যের স্থায়ীত্ব পরস্পরের একেবারেই বিপরীত, এটা খুব সাধারণ একটা সত্য। যা বিস্ময়কর তা হল, বড় লেখক তাঁর সাংবাদিক অভিজ্ঞতাকে নিজের মনোজগতে নাকানি-চোবানি খাইয়ে নতুন সৃষ্টির উপকরণ করে নিতে পারেন। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এত দূরও বলতে পারেন যে 'আমি সত্যি এমন সংবাদভাষ্য লিখতে চাই যা সম্পূর্ণত সত্যি এবং বাস্তব, কিন্তু শোনায় ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড-এর মতো আশ্চর্যজনক।'

বাংলা উপন্যাসে এরকম ভাবনার লেখক, নির্ভুল জানি না, বোধহয় তিনজন— সতীনাথ ভাদুড়ী, মহাশ্বেতা দেবী ও দেবেশ রায়। হয়তো তিনজনের মাঝখানে আছেন আরও দুয়েকজন। যদিও এই তিনজন তিন শৈলীর লেখক।

সাহিত্যে মহীরুহ সন্ধান যেমন আনন্দের, সমকালীন স্বল্পজীবী সাময়িকপত্রের পাতায় ভবিষ্যতের শক্তিশালী কবি-লেখক আবিষ্কারের চেষ্টাও তেমনই কম আনন্দের নয়। দীর্ঘকাল প্রকাশিত, বৃহদাকার, গভীর চিন্তা ও গবেষণা সমৃদ্ধ অবাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-পরিধির বাইরে সারা বাংলায় ছড়ানো ছোট ছোট প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিনের অনিয়মিত প্রকাশেও নতুন সাহিত্যচর্চার ঋতুপরিবর্তন লক্ষ্য করতে অনেকের মতো আমারও ভালো লাগে। ঠিক যে, সেইসব চর্চার অনেকগুলিই হয়তো চৈত্রে ঝরে যায়। তা সত্ত্বেও কে কোথায় নতুন কী লিখছেন, সাহিত্যমনস্ক পাঠকের পক্ষে তার একটা পরিনাম-নিরপেক্ষ পরিক্রমা হয়তো একেবারে নিরর্থক নয়। বরং কখনও কখনও বড়ই সার্থক। আমি তো এভাবেই 'আদম' পত্রিকায় তোর্সা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। 'জ্বলদর্চি' পত্রিকায় এই সেদিন পড়লাম ঋত্বিক ত্রিপাঠীর ৩৭ স্তবকের চমকে দেওয়া 'শ্মশালমঙ্গল কাব্য'। কিংবা ওই পত্রিকারই এই নববর্ষ সংখ্যায় বিমল মণ্ডল ও কৌস্তভ শতপথীর কবিতা। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 'দৈনিক কবিতা'য় আবিষ্কার করে রোমাঞ্চিত হয়েছি একালের বাঙালির হৃদ্বিজয়ী কবি জয় গোস্বামীকে। গড়িয়াহাটে তখনকার শংকরের স্টলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম প্রায় সদ্যোজাত এই কবির একগুচ্ছ কবিতা।

আসল কথা পাঠকের সাহিত্যমনস্কতা। আমার অভিজ্ঞতায়, যে-কোনও জাতির মনের ভাব ও আবেগ, বা হয়তো মূল্যবোধ পরিমাপের একটা মাপকাঠি এই সাহিত্যমনস্কতা। ওপার বাংলায় তার বাতাস বইলেও এপারে তা নিস্তেজ। দুই বাংলার শুধু একাডেমির ধানের গোলা নাড়াঘাটা করলেই তফাৎটা বোঝা যাবে। তফাৎ বোঝা যাবে ককেশাস-কৃষ্ণসাগরে আগলানো জর্জিয়া আর বলকান-দেশ বুলগেরিয়ার জনগনের মনের তাপ-উত্তাপ নিলে। কিংবা স্পেনের আন্দালুসিয়ার। শিল্প-মৈত্রী-স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্সের সাহিত্যপ্রবণতার কথা তো আমার চেয়ে অনেকেই অনেক বেশি জানেন।

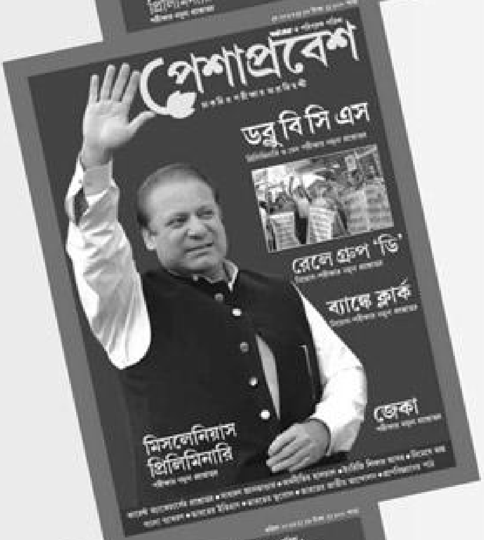

অনলাইনেও গ্রাহক হওয়া যায়
www.swarnakshar.in

কলেজে পড়তে পড়তেই
নিয়মিত পড়ুন
পেশাপ্রবেশ
আর স্নাতক হয়েই
যে কোনও চাকরির
পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

ঘরে বসে নিয়মিত 'পেশাপ্রবেশ' পেতে ২৩০ (ক্যুরিয়ারে ৪৯০) টাকার চেক/ড্রাফট নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হোন:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19
Ph: 2283-2320 □ **E-mail:** info@swarnakshar.in

কাঁঠাল-ভোজন

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

আম নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আদিখ্যেতা প্রচুর না হলেও, আছে। খোদ রবীন্দ্রনাথই তরুণী প্রেয়সীর কাছে একটিই প্রার্থনা করেছিলেন— সোনার থালায় রেশমি রুমাল টানা, অরুণবরণ আম এনো গোটা কত।

ঠাকুরবাড়ির রান্না নিয়ে বই বের হয়েছে অনেক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে যে খুব খেতে পারতেন এমন প্রমাণ নেই। তবু যাহোক আম নিয়ে কিছু লিখেছেন, কিন্তু কাঁঠাল? কাঁঠাল কাব্যে উপেক্ষিতা।

কাঁঠাল খাওয়া একটি ম্যাসকুলিন ব্যাপার— সবার জন্য নয়। কাঁঠালের জন্য চাই দস্তুরমতো সাহস। পেটরোগাদের জন্য কাঁঠাল নয়।

আমের যেমন অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ মধুকুলকুলি আছে, ন্যাংড়া, বোম্বাই, ভুতো বোম্বাই, বেগমফুলি, পেয়ারাফুলি থেকে আলফানসো পর্যন্ত তার অসংখ্য জাতিবিন্যাস, কাঁঠালও তাই।

খাজা কাঁঠাল আর রসা কাঁঠাল— এই রকম দু'টি প্রধান শ্রেণিবিভাগ হলেও— অভিজ্ঞরা জানেন, কুলীন, ভঙ্গ কুলীন, স্বকৃত ভঙ্গ ইত্যাদি নানা ধরনের জাতবিচার আছে কাঁঠালে। কাঁঠাল খাওয়া যেমন একটি আর্ট, গোটা কাঁঠাল থেকে বিচি বের করে পাতে পরিবেশন করাটাও একটি আর্ট। সবাই কাঁঠাল ছাড়াতে পারে না। আঠার হাত থেকে আঙুল বাঁচাতে সর্ষের তেল লাগবে কিন্তু কাঁঠালে সর্ষের তেল লাগবে না।

সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগেকার স্মৃতি। কাটোয়ার দেবেনবাবুর ঘাট (একেবারে গঙ্গার ওপর)— দুরদুরান্তের মেয়েদের আগমন ঘটে বারুণীর মেলায়। গামছা পরে শাশুড়ি বউ মেয়ে সবাই মুড়ি কাঁঠাল একডজন নীল মাছি-সহ খেয়ে গঙ্গাস্নান করে তিন মাইল পথ হেঁটে ঘরে ফেরে। কেউ ঘরে

ফিরে অ্যান্টাসিডের জন্য বায়না ধরত বলে শুনিনি। প্রত্যেক বাড়িতেই ছিল নিজেদের আম-কাঁঠালের বাগান। গঙ্গাতীরে বসে খেতে হবে এবং ভুতি জলে ভাসাতে হবে। এটাই রিচুয়াল।

কলকাতায় পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরুতে দৈনিক লোকসেবক-এ যোগ দিয়েছিলাম। বার্তা সম্পাদক ডাকসাইটে সাংবাদিক অমূল্য সেনগুপ্ত। তাঁর বাড়িতে গরমকালে রসাল উৎসব হত। সবাইকে ডেকে আম খাওয়াতেন। যে যত পারে— অবাধ ভোজন। শুনেছি পুরনো কলকাতার বনেদি জীবনের অঙ্গ ছিল এই রসাল উৎসব। কিন্তু কোথাও কাঁঠাল উৎসব হত বলে শুনিনি। ওই যে শুরুতেই বলেছি— কাঁঠাল-সেবন হল ম্যাসকুলিন ব্যাপার— পুরুষালি কাণ্ড। সুতানুটি সুতানুটি বলে যাঁরা সংস্কৃতির ধ্বজা তুলে নাচেন তাঁরা কাঁঠাল খেতে ভয় পান। অথচ নৈহাটি খুব দূরের শহর নয়। সেখানে কয়েকটি পরিবারের কাঁঠাল খাওয়ার প্রতিযোগিতা হত।

কাটোয়ার অদূরবর্তী এক গ্রামে আমার মধুর শৈশবের অনেকগুলি দিন কেটেছিল। সেখানে আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা ছিল কাঁঠাল-সেবন। খাজা কাঁঠাল খেতে হবে ক্ষীর দিয়ে। গৃহস্থ ঘরে গাইগরু সেকালে সুলভ বস্তু। ঘরের গরু থেকে দুধ। দুধ থেকে ক্ষীর।

খাজা কাঁঠাল খেতে হলে, ক্ষীরের বাটি চাই। দু'বাটি। এক বাটি কাঁঠাল-সহ সেব্য, আর এক বাটি নিমন্ত্রিতের বাড়ি যাবে।

কাঁঠালের পরিত্যক্ত ভুতি গরুর অতি প্রিয় খাদ্য। আমরা বালকের দল বসে থাকতাম কাঁঠালের বিচি ভাজা খাওয়ার জন্য। বন্ধু বসন্তের ঠাক্‌মা পাড়ার বহু বালক-বালিকাকে নিয়ে গোল হয়ে বসতেন। মাটির খোলায় গরম বালিতে পাকা কাঁঠালের বিচি ভাজা হত। শুকনো খোলায় ভাজা সে অমৃতের স্বাদ আজও আমার জিভ ধরে রেখেছে। কলকাতায় ফ্রান্স ইতালি চিন জাপান বহু দেশের শেফরা রান্না করে কাগজে তার বিজ্ঞাপন বের করেন। তাঁদের কেউ শুকনো বালির খোলায়, নারকেল কাঠির ঝাঁটা দিয়ে একটি কাঁঠাল বীজ ভেজে দেখান না?

নৈহাটির কবি ঈশ্বর গুপ্ত— রসিক মানুষ। নিরামিষ এঁচোর রান্নায় তিনি দক্ষ ছিলেন। নবদ্বীপ শান্তিপুরের গোস্বামীরা এঁচোরের সুস্বাদু-রন্ধনকে গাছ-পাঁঠা বলে রসিকতা করেছেন। গরম মশলা এবং কাজু-কিশমিশ দই সহযোগে সেই অমৃতআস্বাদী এঁচোর রান্না আমাদের বাড়িতেও হয়। পাঁঠা বলে রসিকতা করলেও পেঁয়াজ-রসুন বর্জিত রান্না।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে, তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়ত একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়

১৪/১২/২০০০

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র : www.ekarmakshetra.com

ক্ষনেরবচন

১১০
যত বাড়ে গালমন্দ
দু'পক্ষই তত অন্ধ

১১১
দেশপ্রেম জুঁই বা চাঁপা
সভামঞ্চে যায় না মাপা

১১২
ঝাল মাংস, কড়া মদ, পর্যাপ্ত পেঁয়াজ—
এখন ধর্ষণ শেষে খুনই রেওয়াজ।

১১৩
সূর্য যখন দুঃখে হ্যালে—
দেশের সেবা করতে গিয়ে
দেশসেবকের দলও খ্যালে
দেশবাসীর জীবন নিয়ে!

১১৪
অন্তরে যতই কালো
রাত্রিও তত কালো নয়,
মনের সমস্ত কালো
ধুলে আলো হয়।

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

১১১। ওবিভ্যানী

বিশেষণ; যথার্থ মহৎ কাজ করতে না পারার দুঃখ ভুলতে যে-ব্যক্তি মিডিয়ার নজরে পড়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মকাণ্ড অনায়াসে ঘটাতে পারেন।

— আমাদের এম এল এ-টি কিন্তু ভারি অমায়িক মানুষ। আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মতোই সকালবেলা থলে হাতে বাজারে যান।

— হ্যাঁ, তবে ওনার মতো ওবিভ্যানী লোকও বড় একটা দেখা যায় না। গত শনিবার তো তুমি ছিলে না, আগের রাতে পাশের পাড়ায় ডাকাতি হয়েছিল বলে কিছু টিভি চ্যানেলের গাড়ি এসেছিল। খবর পেয়েই উনি বাজারের মধ্যে হুলস্থুল ফেলে দিলেন। কোনও এক বেড়াল মাছ চুরি করে পালাচ্ছিল বলে তার দিকে একটা বিশাল বাঁধাকপি ছুড়ে মারলেন। বাঁধাকপিটা পড়বি তো পড় শাকওয়ালির গায়ে গিয়ে পড়ল। তাইতে রেগে গিয়ে তার ছেলে টিপ করে কিছু পচা টমেটো ছুড়ল এদিক-ওদিক।

তারপর এমন কাণ্ড বেধে গেল যে, একটা ওবিভ্যান এসে ক্যামেরা চালু করে দিল।

— সে কী! উনি কিছু বললেন না?

— কী আর বলবেন? দু'হাত তুলে 'থামুন থামুন, উত্তেজনা ছড়াবেন না, গুজব রটাবেন না' এইসব বলে নেতাগিরি করছিলেন।

১১২। আপত্তাড়িনি

বিশেষণ; যখন-তখন ফোনের মাধ্যমে এসে পড়া নানাবিধ অবাঞ্ছিত আবেদন রুখতে ব্যবহৃত কৌশলাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

— কাল থেকে কে যেন আমাকে লোন দিয়ে খুব উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। প্রায় দশ-বারোবার ফোন করেছে, ধমক দিয়েও কাজ হচ্ছে না। কী করি বলো তো?

— এসব ক্ষেত্রে অব্যর্থ আপত্তাড়িনি মন্ত্র হল সোৎসাহে বলে ওঠা, 'আলবাত লোন চাই। কখন দিতে পারবেন? আমি তো বেকার, যখন খুশি চলে আসুন কাগজপত্তর নিয়ে'। বেকার জানলে আর কেউ ফোন করবে না।

১১৩। প্রতিবেদনা

বিশেষ্য; সংবাদ পরিবেশনের গুণে যখন ঘটনার থেকে প্রতিবেদকের ভাবাবেগ বেশি গুরুত্ব পায়।

— মা গো, টিভিতে দেখাচ্ছে কোথায় যেন বিরাট কী একটা হয়ে গেছে।

— কোথায়? কী হয়েছে?

— কোথায় ঠিক জানি না, ডাকাত কিংবা বোম পড়েছে বোধহয়। রিপোর্টার মহিলা হাউমাউ করে কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। রক্তারক্তি কাণ্ড!

— এরকম প্রতিবেদনা দেখে কি কিছু ঠাওর করা যায়? ইন্টারনেট খুলে দেখ কী লিখেছে।

শব্দবক্রমুণি

তাঁর আবিষ্কৃত ভুবন কোথাও নেই, আবার সর্বত্র আছে। তাকে ঘিরে রয়েছে বাস্তবের খুঁটিনাটি বিষয় এবং সার্বজনীনতা।

ঝুম্পা লাহিড়ী

তাঁর কাজ সাহিত্যকে দিয়েছে মাহাত্ম্য এবং সম্মান। তাঁর উপন্যাসগুলি বেঁচে থাকবে আর সর্বত্র খুঁজে নেবে নতুন নতুন পাঠকদের।

মারিও ভার্গাস লোসা

সা ক্ষা ৎ কা র | গা ব্রি য়ে ল গা র্সি য়া মা র্কে জ

বইগুলো মৃত্যুর পর প্রকাশ পেলে খুশি হতাম

সাক্ষাৎকারে টেপ রেকর্ডার ব্যবহারের ব্যাপারে আপনার কী অনুভূতি?

সমস্যা হল, যে-মুহূর্তে আপনি জানছেন যে সাক্ষাৎকারটি টেপ করা হচ্ছে, আপনার আচরণ পাল্টে যায়। সাংবাদিক হিসেবে আমার ধারণা, সাক্ষাৎকার করার সময় টেপ রেকর্ডারের ব্যবহারবিধি এখনও আমরা জানি না। সবথেকে ভালো পন্থাটা আমার মতে, একটা দীর্ঘ কথোপকথন হবে, কিন্তু সাংবাদিক কোনও নোট নেবেন না। পরে গোটা কথোপকথনটা তিনি মনে করবেন এবং তাঁর গভীর অনুভূতি থেকে সেটা লিখে ফেলবেন। একদম সঠিক শব্দটাই লিখতে হবে এমন কথা নেই। আর-একটা উপযোগী পদ্ধতি নোট নেওয়া এবং পরে সাক্ষাৎকর্তার প্রতি অনুগত থেকে সেটি লেখা। টেপ রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা বিরক্তির বিষয় তা হল, যাঁর ইন্টারভিউ করা হচ্ছে তাঁর প্রতি যন্ত্রটি অনুগত নয়, কারণ, আপনি যখন বোকার মতো কথা বলবেন তখনও এটি সেসব রেকর্ড করবে এবং মনে রাখবে। এর জন্যই, টেপ রেকর্ডার থাকলে আমি সতর্ক হয়ে যাই যে আমার ইন্টারভিউ করা হচ্ছে। না থাকলে আমি অসাবধানে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলি।

বেশ! আপনার কথায় আমি স্বল্প অপরাধবোধে ভুগছি এটা ব্যবহার করার জন্য, কিন্তু আমার মনে হয় এই ধরনের ইন্টারভিউয়ের জন্য এটি আমাদের দরকার।

সে যা হোক, আমি যা বললাম তার পুরো উদ্দেশ্যটাই হল আপনাকে রক্ষণমূলক করে তোলা।

প্যারিসের একটি পুস্তক বিপণিতে মার্কেজ-তর্পণ

তো, আপনি কখনও ইন্টারভিউ করতে গিয়ে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করেননি?

সাংবাদিক হিসেবে আমি এটা কখনওই ব্যবহার করি না। আমার খুব ভালো একটা টেপ রেকর্ডার আছে, কিন্তু সেটা গান শোনার জন্য ব্যবহার করি। কিন্তু আবার, সাংবাদিক হিসেবে আমি কখনও ইন্টারভিউ নিইনি। আমি প্রতিবেদন লিখেছি, কিন্তু প্রশ্ন এবং উত্তর-সহ ইন্টারভিউ কখনও নয়।

আমি কিন্তু জাহাজডুবি হওয়া এক নাবিকের সঙ্গে বিখ্যাত ইন্টারভিউটির কথা শুনেছি।

সেটাও প্রশ্নোত্তরভিত্তিক ছিল না। নাবিকটি আমাকে তাঁর অভিযানের কথা বলে যেতেন এবং আমি সেসবেরই পুনর্লিখন করতাম তাঁর নিজের বলা শব্দগুলি ব্যবহারের চেষ্টা করে এবং উত্তম পুরুষে, যেন তিনিই লিখেছেন। লেখাটি যখন একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে, প্রত্যেক দিন একটি অংশ করে দু'সপ্তাহ ধরে, সেটিও ওই নাবিকের নামেই বের হতো, আমার নামে নয়। কুড়ি বছর পার করে লেখাটি যখন আবার প্রকাশিত হল, তখন লোকে জানল আমি সেটি লিখেছিলাম। ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড লেখার আগে কোনও সম্পাদকই মনে করতেন না লেখাটি ভালো।

আমরা যখন সাংবাদিকতা নিয়েই কথা শুরু করেছি, তখন জেনে নেওয়া যাক, আবার সাংবাদিকতায় ফিরে গেলে কেমন লাগবে, এতগুলি উপন্যাস লিখে ফেলার পর? আপনি কি কোনও আলাদা অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলি করেন?

আমি বরাবর জানি যে, আমার প্রকৃত পেশা হচ্ছে একজন সাংবাদিকের। আগে সাংবাদিকতার যে দিকটি আমার না-পসন্দ ছিল, সেটি হচ্ছে কাজের পরিস্থিতি। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট খবরের কাগজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমার ভাবনা ও ধারণাকে সাজাতে হতো। এখন, একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে কাজ করার পর এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করার পর, আমি প্রকৃত অর্থেই আমার পছন্দসই বিষয় বেছে নিতে পারি এবং আমার ধারণা থেকে লিখতে পারি। যে-কোনও ভাবে, আমি সবসময় ভালো সাংবাদিকতা করার সুযোগটি খুব উপভোগ করি।

উপন্যাস কি নির্দিষ্টভাবে এমন কিছু করতে পারে যা সাংবাদিকতা পারে না?

একেবারে না। আমি মনে করি না, দুটোর মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে। উৎস একই, উপাদান একই, সংস্থান এবং ভাষাও একই। ড্যানিয়েল ডিফোর 'দ্য জার্নাল অব দ্য প্লেগ ইয়ার' একটা মহান উপন্যাস এবং 'হিরোশিমা' (জন হার্সে লিখিত) অতি উৎকৃষ্ট সাংবাদিকতার কাজ।

সত্য এবং কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার ক্ষেত্রে সাংবাদিক এবং ঔপন্যাসিকের কি পৃথক দায়িত্ব রয়েছে?

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শুধু একটি অসত্য তথ্য গোটা কাজটিকে পক্ষপাতমূলক করে তুলতে পারে। অন্যদিকে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটামাত্র সত্যও গোটা কাজটিকে বৈধতা দেয়। এইটাই একমাত্র পার্থক্য, লেখকের দায়বদ্ধতার মধ্যে যার অধিষ্ঠান। একজন ঔপন্যাসিক যা চান তাই লিখতে পারেন, যতক্ষণ তিনি মানুষের কাছে সেটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারছেন।

কয়েক বছর আগে সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকতার পুরনো দিনগুলিকে ফিরে দেখতে গিয়ে আপনি সমীহের সঙ্গে বলেছিলেন তখন কত দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতেন!

এখন লেখালেখিটাকে আমার আগের চেয়ে কঠিন মনে হয়, উপন্যাস এবং সাংবাদিকতা উভয়ই। আমি যখন খবরের কাগজে কাজ করতাম, তখন লেখার সময় প্রত্যেকটা শব্দের ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক থাকতাম না, অথচ এখন থাকি। বোগোটায় 'এল এস্পেকটাডোর' কাগজের হয়ে যখন কাজ করছি, আমাকে প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত তিনটে স্টোরি করতে হতো, প্রত্যেক দিন দুটো থেকে তিনটে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে হতো এবং আমি চলচ্চিত্র সমালোচনাও করতাম। এরপর রাত্রিবেলা, সবাই বাড়ি চলে যাওয়ার পর, আমি উপন্যাস লেখার জন্য থেকে যেতাম। লিনোটাইপ মেশিনের শব্দ আমার ভালো

লাগত, অনেকটা বৃষ্টির শব্দের মতো শোনাত। শব্দটা যদি থেমে যেত আর আমাকে যদি ঠেলে দিত নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি কাজ করতে পারতাম না। এখন সেই তুলনায় উৎপাদন কম। একটা সার্থক কাজের দিনে সকাল ন'টা থেকে দুপুর দুটো-তিনটে পর্যন্ত কাজ করে আমি বড়জোর চার-পাঁচ লাইনের একটা ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে পারি, যেটিকে পরদিনই আমি ছিঁড়ে ফেলি সাধারণত।

আপনার কাজগুলির উচ্চপ্রশস্তি পাওয়া অথবা আপনার একধরনের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকেই কি এই পরিবর্তন?

দুটো থেকেই। আমি মনে করি, যা আমার কল্পনায় ছিল, তার চেয়েও আরও অনেক বেশি পাঠকের জন্য লিখছি, এই ধারণাটা, আমার মধ্যে এক নির্দিষ্টি সাধারণ দায়বদ্ধতা তৈরি করেছে যা সাহিত্যগত এবং রাজনৈতিক। যা আমি আগে লিখেছি তার চেয়ে খারাপ লিখব না, এর মধ্যে রয়েছে এমনকী অহংও।

কীভাবে লেখা শুরু করলেন?

ছবি এঁকে। কার্টুন এঁকে। পড়তে বা লিখতে শেখার আগেই আমি স্কুলে এবং বাড়িতে কার্টুন আঁকতাম। এখন আমার মজা লাগে ভেবে, যখন আমি হাইস্কুলে, আমার লেখক হিসেবে সুনাম হয়েছে, যদিও আমি প্রকৃত অর্থে কখনও কিছু লিখিনি। প্যামফ্লেট কী পিটিশন লিখতে হবে, আমাকে এসে ধরল, কারণ আমাকে মনে করা হতো লেখক। কলেজে যখন ঢুকলাম তখন সার্বিক ভাবে আমার একটা খুব ভালো সাহিত্যময় পটভূমি রয়েছে, যা প্রকৃতই আমার বন্ধুদের থেকে বেশি। বোগোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নতুন নতুন বন্ধু হল, পরিচিত মানুষদের সংখ্যা বাড়ল, যাঁরা সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচিতি ঘটালেন। এক বন্ধু এক রাতে আমায় ফ্রাঞ্জ কাফকার একটি ছোট গল্পের বই ধার দিল। সেসময় যেখানে থাকতাম, সেই বোর্ডিংয়ে ফিরে গেলাম এবং পড়তে শুরু করলাম 'দ্য মেটামরফোসিস'। প্রথম লাইনটি প্রায় বিছানা থেকে ফেলে দিল আমাকে, এত বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম! লাইনটা পড়ে নিজের মনেই বললাম, এমনভাবে লিখতে পারেন এমন কেউ আছেন বলে তো আমি জানতাম না। জানলে, অনেক আগেই লেখালেখি শুরু করতে পারতাম। তো, আমি তক্ষুনি ছোটগল্প লিখতে শুরু করে দিলাম। সেই ছোটগল্পগুলি সম্পূর্ণই ইন্টেলেকচুয়াল ধাঁচের, কেন না, আমার সাহিত্যগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আমি সেগুলো লিখছিলাম এবং সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে যে সম্পর্ক তখনও সেটা খুঁজে পাইনি। ছোটগল্পগুলি বোগোটার 'এল এস্পেকটাডোর'-এর সাহিত্য-সাময়িকীতে

> লিনোটাইপ মেশিনের শব্দ আমার ভালো লাগত, অনেকটা বৃষ্টির শব্দের মতো শোনাত। শব্দটা যদি থেমে যেত আর আমাকে যদি ঠেলে দিত নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি কাজ করতে পারতাম না।

প্রকাশিত হয় এবং সেই সময়ে বিশেষ সাফল্যও পায় গল্পগুলি— সম্ভবত এ কারণে যে, কলম্বিয়ায় তখন কেউই ইন্টেলেকচুয়াল ছোট গল্প লিখতেন না। তখন যে-বিষয়ে লেখালেখি হচ্ছিল, তার অধিকাংশই প্রান্তীয় অঞ্চলের জীবনযাত্রা এবং সামাজিক জীবন বিষয়ে। আমার লেখা প্রথম ছোটগল্পগুলি সম্পর্কে বলা হল, সেগুলিতে জয়েসের প্রভাব রয়েছে।

ততদিনে জয়েস কি আপনার পড়া?

আমি কখনও জয়েস পড়িনি, তাই ইউলিসিস পড়া শুরু করলাম। স্প্যানিশ অনুবাদে যে সংস্করণটি পাওয়া যেত সেটি। পরে ইংরেজিতে এবং খুব ভালো ফরাসি অনুবাদে ইউলিসিস পড়ে দেখলাম, মূল স্প্যানিশ অনুবাদটি খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু আমি তার থেকেও কিছু শিখেছিলাম, যা পরবর্তীকালে আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে খুব কাজে লেগেছে— স্বগতসংলাপের কৌশল। পরবর্তীকালে ভার্জিনিয়া উলফ-এর লেখায় এ ব্যাপারটি পেয়েছি এবং জয়েসের থেকেও ভালোভাবে তাঁর এই জিনিসটির প্রয়োগ আমার ভালো লাগে। যদিও পরে আমি জানতে পেরেছিলাম স্বগতসংলাপ যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি 'লাজারিলো ডি টর্মে'-এর অনামা লেখক।

আপনি কি মনে করেন এটাই স্বাভাবিক যে, তরুণ লেখকরা তাঁদের নিজেদের ছোটবেলা এবং সেই সময়ের অভিজ্ঞতাকে খারিজ করে ইন্টেলেকচুয়াল গল্প লিখবে, যেমন আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে লিখেছিলেন?

মার্কেজের সঙ্গে তিন সন্ধ্যা

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের এই সাক্ষাৎকারটি আমি নিই পুরনো মেক্সিকো সিটিতে দর্শনীয় বর্ণময় ফুলে ভরা এলাকায় তাঁর বাড়ি সান অ্যাঞ্জেল ইন-এর ঠিক পিছনে তাঁর স্টুডিও তথা অফিসে বসে। বাড়ি থেকে অল্প হাঁটাপথে স্টুডিও। নিচু লম্বাটে ধাঁচের বাড়ি, দেখে মনে হয় মূলত অতিথিদের থাকার জন্য তৈরি হয়েছিল। ভিতরে একপ্রান্তে একটি সোফা, দু'টি ইজি চেয়ার, একটা কাজ চালানোর মতো 'বার'— একটা ছোট সাদা রেফ্রিজারেটর, ওপরের তাকে মিনারেল ওয়াটারের জোগান-সহ।

ঘরের সবচেয়ে চমকপ্রদ জিনিস হল, মার্কেজের সোফার ওপরের দিকে বিশাল একটি ছবি, তাতে গার্সিয়া মার্কেজ একা, একটা স্টাইলিশ টুপি পরে যেন হাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে লাগছে অনেকটা অ্যান্টনি কুইনের মতো।

স্টুডিওর দূরতম প্রান্তে গার্সিয়া মার্কেজ বসে ছিলেন তাঁর লেখার ডেস্কে। আলতো পদক্ষেপে এগিয়ে এসে আমায় অভিবাদন জানালেন। সুঠাম শরীর। উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট আট বা নয় ইঞ্চি। দেখাচ্ছে ভালো মিডলওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার মতো— বিস্তৃত বক্ষপট, কিন্তু সম্ভবত পায়ের দিকটা কিছুটা সরু। পরনে খুব সাধারণ কর্ডুরয়ের ঢোলা প্যান্ট, সঙ্গে সোয়েটার এবং কালো চামড়ার বুট। মাথার চুল কোঁকড়ানো আর ঘন বাদামি। মোটা গোঁফ।

প্রতি সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করে মোট তিনটি সন্ধ্যায় গোটা সাক্ষাৎকারটা নেওয়া। তাঁর ইংরেজি যথেষ্ট ভালো হলেও গার্সিয়া মার্কেজ কথা বলেছেন মূলত স্প্যানিশে। তাঁর দুই ছেলে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছেন। যখন গার্সিয়া মার্কেজ কথা বলেন, তাঁর শরীর প্রায়ই সামনে পিছনে করেন। জোর দিয়ে কোনও বিষয় বোঝাতে কিংবা ভাবনার অভিমুখ বদলানোর সময় তাঁর হাতদু'টি প্রায়ই নাড়েন। কখনও তাঁর শ্রোতার দিকে ঝুঁকে পড়েন আবার কথা বলার সময় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান সোফার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত, তখন পায়ের ওপর তুলে নেন আর-এক পা।

পিটার এইচ স্টোন

না, প্রক্রিয়াটা সাধারণভাবে অন্যদিক থেকে রূপ নেয়, কিন্তু তরুণ লেখককে যদি আমায় পরামর্শ দিতে হয়, তাহলে বলব, তার ক্ষেত্রে ঘটেছে, এমন ঘটনা নিয়ে লিখতে। একজন লেখক তাঁর জীবনের কোনও ঘটনা নিয়ে লিখছেন নাকি পড়া বা শোনা কথার ভিত্তিতে লিখছেন, সেটা বলা সবসময় সহজ। পাবলো নেরুদার কবিতায় একটি লাইন আছে, 'আমি যখন গান করি, তখন পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে আমায় দূরে রাখুন ঈশ্বর!' আমাকে সবসময় অবাক করে যেটা, তা হল, আমার কাজের যত প্রশংসা করা হয় তার সিংহভাগটাই আমার কল্পনাশক্তির জন্য। কিন্তু সত্য হল, আমার কাজে একটি লাইনও এমন নেই, যা বাস্তবে ভিত্তিহীন। সমস্যা হল ক্যারিবীয় বাস্তবের সঙ্গে চূড়ান্ত কল্পনার মিল রয়েছে।

এইসময় আপনি কাদের জন্য লিখছিলেন? কারা আপনার পাঠক ছিলেন?

'লিফ স্টর্ম' লেখা হল আমার বন্ধুদের জন্য যাঁরা আমায় সাহায্য করছিলেন এবং তাঁদের বইপত্র ধার দিচ্ছিলেন এবং যাঁরা খুবই উৎসাহী ছিলেন আমার কাজ নিয়ে। সাধারণ ভাবে আমি মনে করি কেউ যখন লেখে তখন অবশ্যই কারও জন্য লেখে। আমি যখন লিখি তখন সবসময় মনের মধ্যে ঘোরে, ওই বন্ধুটি এই জায়গাটা পছন্দ করবে অথবা আর-একজন বন্ধুর খুব ভালো লাগবে ওই অনুচ্ছেদ কিংবা অধ্যায়টা, সবসময় কিছু বিশেষ মানুষের কথা ভাবছি। শেষ পর্যন্ত সব বই-ই লেখা হয় বন্ধুদের জন্য। ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড লেখার পর সমস্যাটা দাঁড়াল এই যে, এখন আমি আর জানি না, লক্ষ লক্ষ পাঠকদের মধ্যে কাদের জন্য আমি লিখছি, এই ঘটনা আমায় বিষাদ ও জড়তাগ্রস্ত করে। এ যেন লক্ষ লোক আপনার দিকে চেয়ে আছে এবং আপনি সত্যিই জানেন না তারা কী ভাবছে।

আপনার কাহিনির ওপর সাংবাদিকতার প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমার মনে হয় প্রভাবটা দু'তরফের। কাহিনি আমার সাংবাদিকতাকে সাহায্য করেছে তাতে সাহিত্যমূল্য দান করে। সাংবাদিকতা আমার কাহিনিকে সাহায্য করেছে কারণ এটি বাস্তবের সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করে রেখেছে।

লিফ স্টর্ম-এর পরে এবং ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড লেখার আগে আঙ্গিকের জন্য আপনার 'খোঁজ'-কে কীভাবে বর্ণনা করেন?

লিফ স্টর্ম লেখার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, দেশের রাজনৈতিক বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া এবং সে-সম্পর্কে লেখার থেকে পালাতে গ্রাম এবং আমার ছেলেবয়স নিয়ে লিখব। আমার

> যে নিঃসঙ্গতা ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড-এর পর আমায় বিপন্ন করে তুলেছিল, তা কোনও লেখকের নিঃসঙ্গতা নয়, খ্যাতির নিঃসঙ্গতা। আমার বন্ধুরা তার থেকে আমায় আড়াল করে রেখেছিল।

এরকম একটা মিথ্যে ধারণা ছিল যে, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হওয়ার বদলে এই ধরনের স্মৃতিরোমন্থনের আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখছি। এটা এমন একটা সময়, যখন সাহিত্য এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক খুবই চর্চিত। আমি এই দুটির মধ্যে ফারাকটা কমানোর চেষ্টা করে চললাম। আমার ওপর প্রভাব ছিল ফকনারের, এখন হেমিংওয়ের প্রভাব বাড়ল। আমি লিখতে লাগলাম নো ওয়ান রাইটস টু কর্নেল, ইন ইভিল আওয়ার এবং বিগ মামাস ফিউনারেল, যেগুলি কমবেশি একই সময়ে লেখা এবং অনেকগুলি ব্যাপার এক। এই গল্পগুলির প্রেক্ষাপট যে গ্রাম, তার থেকে লিফ স্টর্ম বা ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড-এর গ্রাম আলাদা। এটা এমন একটা গ্রাম যেখানে কোনও ম্যাজিক নেই। এটি একটি সংবাদমূলক সাহিত্য। কিন্তু ইন ইভিল আওয়ার শেষ করে আমি দেখলাম, আমার সব দৃষ্টিভঙ্গি আবারও ভুল ছিল। আমি বুঝতে পারলাম, আসলে ছেলেবেলা নিয়ে আমার লেখাগুলি অনেক বেশি রাজনৈতিক ছিল এবং আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশি আমার দেশের বাস্তবতায় এর প্রাসঙ্গিকতা। ইন ইভিল আওয়ার-এর পরে পাঁচ বছর আমি কিছু লিখিনি। আমি কী করতে চাইছি সে-সম্পর্কে সবসময় আমার একটা ধারণা ছিল, কিন্তু কিছু যেন নেই, এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম না সেটা কী, যতদিন না আমি সঠিক 'টোন'টা খুঁজে পেলাম— সেই বাচনভঙ্গি, যা আমি ঘটনাচক্রে ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড-এ ব্যবহার করেছি। এর ভিত্তি হল আমার ঠাকুরমার গল্প বলার পদ্ধতি। তিনি এমন সব কথা বলতেন, যা অলৌকিক এবং আশ্চর্যজনক শোনাত, কিন্তু তিনি সেগুলি বর্ণনা করতেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে। উপন্যাসে যে 'টোন'টা আমায় ব্যবহার করতে হবে, তা যখন আমি শেষপর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেললাম, তারপর আঠারো মাস প্রতিদিন কাজ করে গিয়েছি।

উনি কী করে 'আশ্চর্যজনক' ঘটনা এত স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করতেন?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর মুখের ভাব। গল্প বলার সময় তিনি তাঁর মুখের ভাব কখনও পরিবর্তন করতেন না এবং সবাই অবাক হয়ে যেত। ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড লেখার প্রথম প্রচেষ্টায় আমি গল্পটা বলতে চেয়েছিলাম গল্পটা নিজে বিশ্বাস না করে। আমি আবিষ্কার করলাম, আমাকে নিজেকে প্রথমে ওগুলি বিশ্বাস করতে হবে এবং আমার ঠাকুরমা যেভাবে বলতেন: কঠিন মুখে, সেই একই ভাব বজায় রেখে সেগুলি লিখতে হবে।

ওই কৌশল বা টোন-টায় একটা সাংবাদিকসুলভ গুণবত্তা আছে বলে মনে হয়েছে। আপনি আপাত অলৌকিক ঘটনাগুলির বর্ণনা এত নিখুঁত বিস্তারে দিয়ে থাকেন যে, সেটাই যেন ওগুলোতে সত্যতা আরোপ করে। এই জিনিসটা কি আপনার সাংবাদিকতা থেকে শেখা?

এটা একটা সংবাদ-সংশ্লিষ্ট কৌশল, যা আপনিও সাহিত্যে প্রয়োগ করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলি, আপনি যদি বলেন আকাশে হাতি উড়ে যাচ্ছে, মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনি যদি বলেন চারশো পঁচিশটা হাতি আকাশে উড়ছে, লোকে সম্ভবত আপনাকে বিশ্বাস করবে। ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড এই ধরনের জিনিসে ভর্তি। একদম এই কৌশলটাই আমার ঠাকুরমাও ব্যবহার করতেন। আমি সেই চরিত্রটির কথা বিশেষ করে মনে করতে পারি, যাকে ঘিরে থাকত হলুদ প্রজাপতিরা। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। ওঁর কাছে ছিল একটি বেল্ট, যা দিয়ে তিনি ইলেক্ট্রিক পোস্ট থেকে ঝুলে থাকতেন, সেই বেল্টটি সম্পর্কে আমি খুব কৌতূহলী হয়ে উঠি। আমার ঠাকুরমা বলতেন, এই লোকটি যতবার আসেন, ততবার বাড়িভর্তি হলুদ প্রজাপতি ছেড়ে যান। কিন্তু এই ঘটনাটা যখন আমি লিখি, তখন আবিষ্কার করি, প্রজাপতিগুলো যে হলুদ, সে-কথা আমি লিখিনি। মানুষ একথা বিশ্বাস করবে না। রেমেডিওস দ্য বিউটি স্বর্গে চলেছে, সেই এপিসোডটা যখন লিখছি, অনেক সময় দিয়েছি সেটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য।

একদিন বাগানে গিয়েছি। বাড়িতে যে মহিলা কাপড় কাচার জন্য আসত, দেখি সে কাপড়গুলি শুকোবার জন্য মেলে দিচ্ছে এবং খুব হাওয়া বইছে। সেই মহিলা হাওয়ার সঙ্গে তর্ক করছিল, যাতে সে কাপড়গুলিকে উড়িয়ে না নিয়ে যায়। আমি আবিষ্কার করি, যদি রেমেডিওস দ্য বিউটির জন্য আমি এই কাপড়গুলি ব্যবহার করি, তাহলে সে এগুলি বেয়ে উঠে যেতে পারে। সেটাই করলাম বিষয়টাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে। বিশ্বাসযোগ্যতা প্রত্যেক লেখকের সমস্যা। যে কেউ যা খুশি লিখতে পারে, যতক্ষণ সেসব বিশ্বাস করা যাচ্ছে।

ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড-এর ব্যানানা ফিভার সম্পর্কে কিছু বলুন। এ ব্যাপারে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির দায়ের ওপর এই উপন্যাস কতটা নির্ভরশীল?

বাস্তবের খুব কাছ ঘেঁষে ব্যানানা ফিভার গড়ে তোলা হয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে যা প্রমাণিত হয়নি, সেইসব ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমি আমার সাহিত্য-কৌশল প্রয়োগ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, গণহত্যার ঘটনাটি সত্যি। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথিপত্রের ভিত্তিতে যখন আমি ঘটনাটা লিখি, নিখুঁতভাবে জানা ছিল না মৃতের সংখ্যা। আমি তিন হাজার সংখ্যাটা ব্যবহার করি, যা স্পষ্টতই অতিশয়োক্তি। কিন্তু ছেলেবেলার অনেক স্মৃতির মধ্যে একটি যেন ছিল, একটি খুব খুব বড় দৈর্ঘ্যের ট্রেন সম্ভবত কলায় ভর্তি একটি কর্ষণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাতে তিন হাজার মৃতের শরীর থাকতে পারত, সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার জন্য। যেটা সত্যিকারের অবাক করা ব্যাপার তা হল, এখন ওঁরা কংগ্রেসে এবং সংবাদপত্রে খুবই স্বাভাবিক ভাবে 'তিন সহস্র মৃত'-এর কথা বলেন। আমার সন্দেহ, আমাদের ইতিহাসের অর্ধেকটাই বোধহয় এইভাবে তৈরি। দ্য অটাম অব দ্য প্যাট্রিয়ার্ক-এ একনায়ক বলে, এই মুহূর্তে এটা সত্যি না হলেও কিছু যায়-আসে না, কারণ ভবিষ্যতে কোনও একটা সময় এটা সত্যি হবে। আজ হোক বা কাল, মানুষ গভর্নমেন্টের চেয়েও লেখকদের বেশি বিশ্বাস করে।

ব্যাপারটা লেখককে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তোলে না?

হ্যাঁ, এবং এটা আমি টের পাই। এটা আমার ওপর বৃহৎ অর্থে দায়িত্ববোধ অর্পণ করে। আমি সত্যি এমন সংবাদভাষ্য লিখতে চাই, যা সম্পূর্ণত সত্যি এবং বাস্তব, কিন্তু শোনায় ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড-এর মতো আশ্চর্যজনক।

আমি যত বাঁচি আর অতীতের কথা মনে করি, ততই আমার মনে হয় সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত।

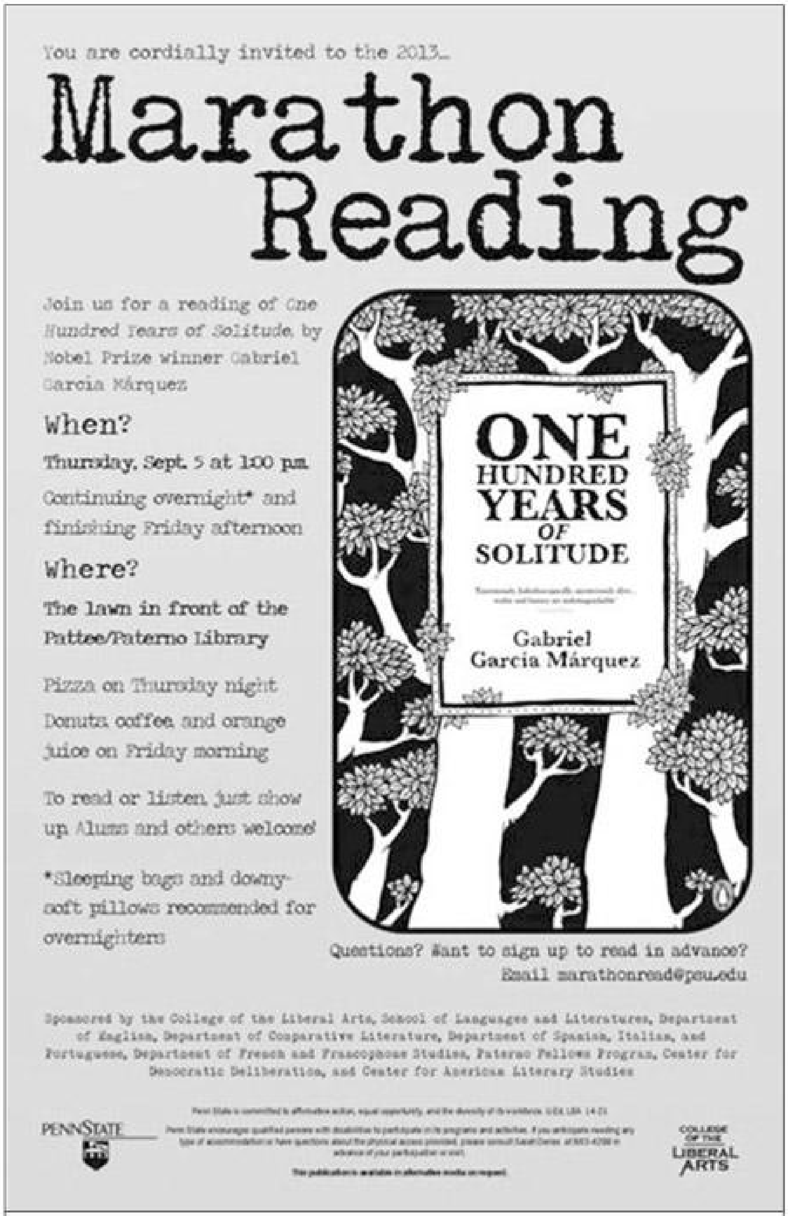

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ডিনার-সহ রাতভর 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড' পাঠে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে পোস্টার

আপনি প্রায়শই ক্ষমতার নিঃসঙ্গতা—এই থিমটি ব্যবহার করেন।

আপনার ক্ষমতা যত বাড়বে, ততই দেখবেন কে মিথ্যা বলছে আর কে নয়, সেটা বোঝা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। আপনি যখন চূড়ান্ত ক্ষমতায় পৌঁছে যাবেন, তখন বাস্তবের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্পর্ক নেই এবং সেটা সবচেয়ে খারাপ ধরনের নিঃসঙ্গতা যা হতে পারে তাই। একজন খুব ক্ষমতাবান মানুষ, একজন একনায়ককে ঘিরে থাকে স্বার্থ এবং সেইসব মানুষ যাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বাস্তবের থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়া, যা কিছু সবই তাঁকে একাকী করে দেওয়ার জন্য।

লেখকের নিঃসঙ্গতা কি এর থেকে আলাদা?

ক্ষমতার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এর। বাস্তবের ছবি আঁকার জন্য লেখকের প্রচেষ্টা অনেক সময় তাঁকে বাস্তবের বিকৃত ছবির দিকে চালিত করে। বাস্তবকে লেখায় প্রতিফলিত করার চেষ্টায় বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন

হয়, গজদন্ত মিনার যাকে বলে! সাংবাদিকতা এক্ষেত্রে প্রহরীর মতো এসে দাঁড়ায়। সেজন্যই আমি সবসময় সাংবাদিকতা করে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কারণ তা বাস্তব জগতের সংস্পর্শে রাখে আমাকে, বিশেষ করে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা এবং রাজনীতি। যে নিঃসঙ্গতা ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড-এর পর আমায় বিপন্ন করে তুলেছিল, তা কোনও লেখকের নিঃসঙ্গতা নয়, খ্যাতির নিঃসঙ্গতা। যার সঙ্গে ক্ষমতার নিঃসঙ্গতার অনেক বেশি মিল। আমার বন্ধুরা তার থেকে আমায় আড়াল করে রেখেছিল, আমার বন্ধুরা সবসময় রয়েছে আমার পাশে।

কী করে?

কারণ সারাজীবন আমি একই বন্ধুদের সঙ্গে চলতে পেরেছি। আমি বলতে চাইছি, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আমার কখনও বিচ্ছেদ হয়নি এবং তারাই আমাকে বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে আনে। তাদের পা সবসময় মাটিতেই থাকে, তারা বিখ্যাত নয়।

তাহলে শৃঙ্খলাবোধ আপনার কাছে একটা বড় ব্যাপার!

আমি মনে করি না অসাধারণ শৃঙ্খলা ছাড়া কেউ মনে রাখার মতো কোনও বই লিখতে পারেন।

আর কৃত্রিম উদ্দীপক?

হেমিংওয়ের লেখা একটা কথা আমায় গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল, উনি লিখেছিলেন, লেখালেখি তাঁর কাছে বক্সিংয়ের মতো। তিনি নিজের স্বাস্থ্য এবং সুস্থ থাকার বিষয়ে খুব যত্ন নিতেন। মদ্যপায়ী হিসেবে খুব নামডাক ছিল ফকনারের। কিন্তু তাঁর দেওয়া প্রতিটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, মদ্যপান করে এক লাইনও লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। হেমিংওয়েও একই কথা বলেছিলেন। কিছু খারাপ পাঠক আমায় জিজ্ঞেস করেছেন, আমার কয়েকটি কাজের ক্ষেত্রে, লেখার সময় আমি ড্রাগ নিতাম কিনা! কিন্তু এর থেকেই ছবির মতো পরিষ্কার হয়ে যায়, ওঁরা সাহিত্য কিংবা ড্রাগ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

ভালো লেখক হতে গেলে আপনাকে প্রত্যেক মুহূর্তে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং সুস্থ থাকতে হবে। লেখালেখি সম্পর্কে যে একটা ভাবপরায়ণ ধারণা রয়েছে যে, লেখালেখির অর্থ স্বার্থত্যাগ কিংবা অর্থনৈতিক অবস্থা বা মানসিক পরিস্থিতি যত খারাপ হবে, লেখা তত ভালো হবে— আমি সেই ধারণার ঘোর বিরোধী।

আমি মনে করি আপনাকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে খুব ভালো অবস্থায় থাকতে হবে। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য আমার কাছে শারীরিক সুস্থতা খুব প্রয়োজনীয় এবং পুরনো প্রজন্ম একথা অনুধাবন করেছিলেন। তাঁরা জীবনকে ভালোবেসেছিলেন।

ইদানীং আপনি লেখেন কখন? কোনও নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে কাজ করেন?

আমি যখন পেশাদার লেখক হয়ে গেলাম, সময়সূচিটাই হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে বড় সমস্যা। সাংবাদিকতা মানেই রাতেও কাজ। পূর্ণ সময়ের জন্য যখন লিখতে শুরু করলাম, তখন আমার চল্লিশ বছর বয়স। আমার কাজের সময় ছিল সকাল ন'টা থেকে দুপুর দুটো, যখন আমার ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে আসত। যেহেতু আমি পরিশ্রম করতে পারতাম, ফলে কেবল সকালটুকু কাজ করছি এটা মনে করে আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ তৈরি হল। সেজন্য আমি বিকেলেও কাজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি আবিষ্কার করলাম, বিকেলে যেটা করছি, পরদিন সকালে আবার সেটা নিয়ে বসতে হচ্ছে।

তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সকাল ন'টা থেকে দুপুর আড়াইটে পর্যন্তই শুধু লিখব এবং অন্য কোনও কাজ করব না। বিকেলে নানারকম কাজ, লোকের সঙ্গে দেখা করা এবং অন্যান্য কাজ যা যখন সামনে আসবে। আমার আর একটা সমস্যা হল, আমার পরিচিত জায়গা ছাড়া বা আমি কাজ করে অভ্যস্ত এমন জায়গা ছাড়া আমি লেখালেখি করতে পারি না। আমি হোটেলে বা ভাড়া করা ঘরে বা ভাড়া করা টাইপরাইটারে লিখতে পারি না। এটা একটা সমস্যা, কারণ যখন আমি সফরে থাকি, আমি লিখতে পারি না। এখন দেখো, কাজ কম করার একটা ছুতো তো খুঁজে নিতে হবে! সে কারণেই যেসব শর্ত নিজের ওপর চাপানো হয়, তা সবসময় খুব কঠিন। পরিস্থিতি যা-ই হোক, অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। এই শব্দটাকে ভাবতাড়িতরা কতভাবে ব্যবহার করেছে! শব্দটিকে মেনে নিতে আমার মার্ক্সবাদী বন্ধুদের খুবই আপত্তি, কিন্তু যে নামেই ডাকো তাকে, আমি বিশ্বাস করি, মনের একটা বিশেষ অবস্থায় অত্যন্ত সহজে লেখা আসে এবং যেন বয়ে যায়। সব ধরনের শর্ত— যেমন নিজের ঘর ছাড়া তুমি লিখতে পারো না— মুছে যায়। সেই রকম মুহূর্ত এবং সেই ধরনের মানসিক স্থিতি আসে তখনই, যখন আপনি লেখার সঠিক বিষয় এবং তা নিয়ে কাজ করার সঠিক পদ্ধতির সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন। এবং সেই গোটা বিষয়টা আপনার সত্যিকারের ভালোলাগার মতো হতে হবে। কারণ, যে কাজটা আপনি পছন্দ করেন না, সেই কাজটাই করার মতো খারাপ চাকরি তো আর হয় না!

সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা হচ্ছে প্রথম অনুচ্ছেদ। প্রথম অনুচ্ছেদটি নিয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু একবার সেটা পেয়ে গেলে, বাকিটা খুব সহজে চলে আসে। প্রথম অনুচ্ছেদেই বইটি নিয়ে আপনার অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বিষয় ব্যাখ্যায়িত, আঙ্গিক এবং বাচনভঙ্গিও। অন্তত আমার ক্ষেত্রে প্রথম অনুচ্ছেদটাই হল একরকমের নমুনা, যার থেকে বোঝা যায় বাকি বইটা কী হতে চলেছে। সে কারণেই ছোটগল্পের কোনও বই লেখা উপন্যাস লেখার চেয়েও কঠিন। প্রত্যেকবার যখন আপনি একটি ছোটগল্প লিখতে বসবেন, আপনাকে ফের নতুন করে শুরু করতে হবে।

স্বপ্ন কি প্রেরণার উৎস হিসেবে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ?

শুরুতে বিষয়টার প্রতি খুব মনোযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, জীবন নিজেই অনুপ্রেরণার এক মহান উৎস এবং স্বপ্ন সেই বেগবান প্রবাহের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমার লেখার ক্ষেত্রে সত্যি যেটা, তা হল, স্বপ্নের বিভিন্ন ধারণা এবং তার ব্যাখ্যা নিয়ে আমি যথেষ্ট আগ্রহী।

স্বপ্নকে আমি দেখি সার্বিকভাবে জীবনের একটা অংশ হিসেবে, কিন্তু বাস্তব অনেক সমৃদ্ধ। তবে হতে পারে, আমি তেমন ভালো স্বপ্ন কিছু দেখি না!

আপনি কি মনে করেন সমালোচকরা আপনাকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে?

সমালোচকরা আমার কাছে মেধাবীয়ানার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। প্রথমত, লেখককে কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট একটা থিয়োরি আছে। তাঁরা লেখককে তাঁদের ছাঁচে ফেলতে চান। সেই ছাঁচে লেখক যদি ঠিকমতো না আঁটেন, তাহলে জোর করে তাঁকে তাতে ঢোকানোর চেষ্টা হয়।

আপনি জিজ্ঞেস করলেন বলেই বলছি এসব। সমালোচকরা আমার সম্পর্কে কী ভাবেন, তাতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। বহুবছর আমি কোনও সমালোচনাও পড়ি না। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বলে থাকেন লেখক এবং পাঠকের মধ্যে সেতু।

আমি বরাবর একজন স্পষ্ট ও নিখুঁত লেখক হতে চেয়েছি। সরাসরি পাঠকদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি, সমালোচকদের মাধ্যমে নয়।

অনুবাদকদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য— ।

অনুবাদকদের প্রতি আমার উচ্চ ধারণা। একমাত্র যাঁরা ফুটনোট ব্যবহার করেন, তাঁদের বাদ দিলে। এঁরা করেন কী, লেখক হয়তো যেটা বোঝাননি, সেটাই সবসময় পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যেহেতু এরকমটাই

চলে আসছে, তাই পাঠকরাও এটা মেনে নিয়েছেন। অনুবাদ একটা কঠিন কাজ, কাজটা করে প্রশংসা একেবারেই পাওয়া যায় না এবং পারিশ্রমিকও খুব কম মেলে। ভালো অনুবাদ সবসময় অন্য ভাষায় লেখাটির পুনর্নির্মাণ। সে কারণেই গ্রেগরি রাবাসার প্রতি আমার এত মুগ্ধতা! আমার বই একুশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং রাবাসা একমাত্র অনুবাদক, যিনি কখনও কোনও কিছুর ব্যাখ্যা চেয়ে আমার কাছে আসেননি, যাতে ফুটনোটে সেসব ঢোকানো যায়। আমি মনে করি, আমার কাজ ইংরেজিতে পুনর্নির্মিত হয়েছে। বইয়ের এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যা আক্ষরিক অর্থেই অনুসরণ করা খুব কঠিন। বইটা পড়ে একজনের মনে হবে, অনুবাদক আগে গোটা বইটা পড়েছেন এবং তারপর তাঁর স্মৃতি থেকে পুনর্লিখন করেছেন। এঁরা মেধাবানদের চেয়েও বেশি অনুভূতিপ্রবণ হন। প্রকাশকদের কাছ থেকে একেবারেই সামান্য পারিশ্রমিক পান, নিজেদের কাজকেও সাহিত্যসৃষ্টি বলে মনে করেন না। কিছু বই আছে, যেগুলি আমি স্প্যানিশে অনুবাদ করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সে কাজটা নিজের বই লেখার মতোই বিপুল হত এবং তা করেও খাবারের সংস্থান করার মতো টাকা রোজগার করতে পারতাম না।

আপনি কি মনে করেন লেখকের অল্প বয়সেই খ্যাতি ও সাফল্য চলে আসাটা খারাপ?

যে-কোনও বয়সেই এটা খারাপ। আমার ভালো লাগত, যদি আমার বইগুলির জন্য আমি মৃত্যুর পর স্বীকৃতি পেতাম, অন্তত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে, যেখানে আপনি একধরনের পণ্যে পরিণত হন।

লেখকের পক্ষে খ্যাতি এত ধ্বংসাত্মক বলে মনে করেন কেন?

প্রাথমিক ভাবে কারণ এটাই যে, তা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যে সময়টা আপনি বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে চান এবং যে সময়টায় আপনি কাজ করতে পারতেন, সেই সময় থেকেও সে কেড়ে নেয়। জাগতিক বিষয়ের থেকে আপনাকে একা করে দেয়। একজন বিখ্যাত লেখক, যিনি লেখা চালিয়ে যেতে চান, তাঁকে অবশ্যই প্রতিনিয়ত খ্যাতির বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমি বলতে চাই না, কারণ এটা হয়তো সত্যি বলে মনে হবে না, কিন্তু আমার বইগুলো যদি আমার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হত, সত্যিই খুশি হতাম। কারণ তাহলে আমাকে এই খ্যাতির বিড়ম্বনা আর মহান লেখকের স্বীকৃতি— এসবের মধ্য দিয়ে যেতে হত না। আমার ক্ষেত্রে খ্যাতির একমাত্র সুবিধা এই যে, আমি একে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছি। অন্যথায় এটা সত্যিই অসুবিধাজনক। সমস্যা হল, দিনের চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই আপনি বিখ্যাত এবং আপনার একথা বলার কোনও উপায় নেই যে, 'বেশ, আগামীকাল পর্যন্ত আমি আর বিখ্যাত থাকব না' বা একটা বোতাম টিপে বলা যায় না। 'আমি আর কখনও বিখ্যাত হব না।'

'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড'-এর এই অসাধারণ সাফল্য কি আপনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন?

আমি জানতাম আমার অন্যান্য বইয়ের চেয়ে এই বইটা আমার বন্ধুদের অনেক বেশি খুশি করবে। কিন্তু আমার স্পেনীয় প্রকাশক যেদিন আমায় বললেন, তিনি বইটার আট হাজার কপি ছাপতে চলেছেন, আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, আমার অন্যান্য বই কখনও সাতশো কপির বেশি বিক্রিই হয়নি। আমি তাঁকে বললাম, অল্প করে শুরু করলে হয় না! কিন্তু তিনি বললেন, তাঁর বিশ্বাস বইটি খুব ভালো এবং মে থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আট হাজার কপির সবটাই বিক্রি হয়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এক সপ্তাহের মধ্যে সবগুলি বিকিয়ে গেল বুয়েনস এয়ার্সে।

'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড' এত সফল কেন? আপনার কী মনে হয়?

আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, কারণ আমি আমার কাজের খুবই খারাপ সমালোচক। প্রায়ই যে ব্যাখ্যাগুলো শুনে থাকি, তার একটা হল এই যে, বইটি লাতিন আমেরিকার মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, একেবারে অন্দরমহল থেকে লেখা।

এই ব্যাখ্যাটা আমায় অবাক করে, কারণ, বইটি লেখার প্রাথমিক প্রচেষ্টার সময় বইটির নাম রাখতে যাচ্ছিলাম 'দ্য হাউস'। আমি চেয়েছিলাম, উপন্যাসের সবটা অগ্রগতি বাড়ির অন্দরেই ঘটবে এবং যা কিছু বাইরের ঘটনা, তা বাড়ির ওপর এর প্রভাবের প্রেক্ষিতে ঘটে চলবে। পরে শিরোনামটা বাতিল করি, কিন্তু একবার যেই বইটা মাকোন্দো শহরে ঢোকে, তারপর তার বাইরে কখনও যায় না।

অন্য একটা ব্যাখ্যা আমি শুনেছি, প্রত্যেক পাঠক নাকি উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে।

আমি চাই না এটা নিয়ে কোনও চলচ্চিত্র হোক, কারণ দর্শক পর্দায় যে মুখগুলি দেখবেন, তা তাঁর মনে গড়ে নেওয়া চরিত্রগুলির মুখের আদলের সঙ্গে নাও মিলতে পারে।

সৌজন্য: পিটার এইচ স্টোন,
'দ্য প্যারিস রিভিউ'

সেই জাদু! আবারও!!

'আমাদের দেখা হল আগস্টে'।

১৭ এপ্রিল প্রয়াত হয়েছেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ। তারপরই জানা গেল, তাঁর শেষ উপন্যাসের খসড়াটির কথা। হয়ত উপন্যাসটির নাম পরে বদলাত, যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে করতেন মার্কেজ। কিন্তু খসড়ায় নিজে হাতে স্প্যানিশে যা লিখেছেন তা আক্ষরিক বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায়, 'আমাদের দেখা হল আগস্টে'। ১৯৯৯ সালে, একটি অনুষ্ঠানে উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করেছিলেন লেখক। তবে, মার্কেজের বাসনা ছিল তাঁর জীবদ্দশায় সে উপন্যাস প্রকাশিত হবে না।

মার্কেজের প্রকাশক সংস্থার এক কর্তা জানান, উপন্যাসটিকে বই হিসেবে প্রকাশের ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি মার্কেজের পরিবার।

যদিও, স্পেনের একটি সংবাদপত্রে উপন্যাসের খসড়াটির কিছু অংশ ছাপা হয়েছে সম্প্রতি। তার থেকে মনে হচ্ছে, দুই প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের প্রণয় সম্পর্ক নিয়েই মার্কেজ বুনেছেন এই কাহিনী। 'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা'র সেই জাদু-আখ্যানের পর আর-একবার!

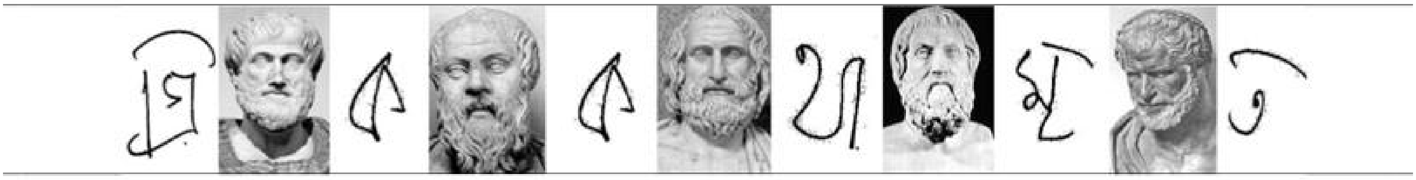

সংকলক ও অনুবাদক
কালীকৃষ্ণ গুহ

পর্ব ৫

আধুনিক সভ্যতার বা ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু বলা যায় গ্রিসে। ভারত, চিন ও এশিয়ার প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির পরিপূর্ণ চেহারা লিপিবদ্ধ নয় বলে সেইসব সভ্যতাকে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলাই হয়তো সংগত। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি, তা গড়ে উঠেছিল বলা যায় ৭০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ে— এক অন্ধের কাব্যপাঠে। মহাকবি অন্ধ হোমার এক-একটা জনপদে পৌঁছে সারাদিন দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্য আবৃত্তি করতেন— গ্রিকদের জয়ের কাহিনি— ইলিয়াড ও ওডেসি। অজস্র দ্বীপে বিভক্ত একটা অঞ্চল বা একটা ছোট ভূ-ভাগ গ্রিসদেশ হিসেবে পরিচিত হয় পরে। জ্ঞানচর্চায় শ্রেষ্ঠ দ্বীপরাজ্য বা নগররাজ্যটি ছিল আথেন্স। যেমন যুদ্ধচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল স্পার্টা। এই আথেন্সে জন্মেছিলেন একের পর এক মহাজ্ঞানী লেখক, ভাবুক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনায়ক। বিভিন্ন সময় তাঁরা যে সকল উক্তি করেছিলেন সেইসব কথা বা কথামৃত আজও মনে হয় অব্যর্থ। বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে এই জ্ঞানীদের উক্তিগুলির সংকলন ও অনুবাদ করেছিলাম একসময়। উক্তিগুলি এতই শক্তিশালী ও মহৎ যে অনুবাদের অনুবাদেও তা মহৎ থেকে গিয়েছে, এই আমাদের বিনীত ধারণা। মনে রাখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের জ্ঞানেরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, প্রায় দেড় হাজার বছর পর।

নে তৃ ত্ব

একটা হরিণের নেতৃত্বে থাকা একদল সিংহের থেকে একটা সিংহের নেতৃত্বে থাকা একদল হরিণকে বেশি ভয় পেতে হবে।
মেসেডোনিয়ার রাজা ***দ্বিতীয় ফিলিপ***

যুক্তিপূর্ণ ও মহৎ দিকগুলি দ্বারাই একজন মানুষকে চালিত হতে হবে।
অ্যারিস্টটল

একজন ভালো সেনানায়ককে শুধু জয়ের পথ দেখতে পেলেই চলবে না, তাকে জানতে হবে কখন জয় সম্ভবই নয়।
পলিবিয়াস

একজন ভালো শাসক সেই হবে যে আগে শাসনাধীনে থেকেছে।
অ্যারিস্টটল

যে নম্রভাবে ক্ষমতার ব্যবহার করে ঈশ্বর দূর থেকে তার প্রতি সুনজর রাখেন।
অ্যাসকাইলাস

লাম্পট্য

যে কোনও লজ্জাজনক কাজ করতে চায়, সে তা প্রথম সুযোগেই করবে।
ক্লিনথিস

কোনও লজ্জাজনক কাজে সুখলাভ হলেও তা হবে অভিশাপ।
মিনানডার

অসুস্থ লোকদের মধ্যে যেমন কোনও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস খুঁজে পাওয়া কঠিন, তেমনি কঠিন অতিলোভী লোকদের মধ্যে কোনও সুস্থ অভ্যাস খুঁজে পাওয়া।
প্লেটো

সসম্মানে আনন্দ ভোগ করাই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ পাওয়া। আর জঘন্যতম জিনিস হল অসম্মানের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করা।
আইসোক্রেটিস

মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে কারও পক্ষে আনন্দ গ্রহণ করা খুব কঠিন, কেন না তা আত্মার মূল্যে অর্জন করতে হয়।
হেরাক্লিটাস

জৈবিক সুখের দাস যে মানুষ সে কি একই সঙ্গে মন আর শরীরের অশুভ পরিণতির পথে এগোচ্ছে না?
জেনোফোন

ব স্তু তা ন্ত্রি ক

বাইরের জিনিসপত্র যা-কিছু কোনো-না-কোনো কাজে লাগে— তাদের কার্যকারিতার একটা সীমা আছে; এইসব জিনিস যদি অতিমাত্রায় কারও থাকে,

তাহলে তা তার কোনও কাজে লাগে না। এমনকী তা সেই সংগ্রাহকের রীতিমতো ক্ষতিসাধন করতে পারে।
অ্যারিস্টটল

কাজে লাগে বলে কোনও বস্তুকে খুব বেশি শ্রদ্ধাভক্তি করার দরকার নেই।
অ্যাসকাইলাস

কত জিনিস যে আছে যা আমার দরকার নেই!
সক্রেটিস (একটি দোকান নিলাম হচ্ছে দেখে)

বাইরের জগৎ থেকে অর্জিত জিনিসপত্রের সাহায্যে কেউ তার গুণাবলি রক্ষা করতে পারে না, বরং এর উল্টোটাই সত্যি।
অ্যারিস্টটল

ভা র সা ম্য

অতিরিক্ত কোনও-কিছুই কাম্য নয়।
থালেস

ভারসাম্যই স্বর্গের মহত্তম দান।
ইউরিপিডিস

সম্ভব হলে মদ্যপানের আসর এড়িয়ে চলবে। কিন্তু একান্তই যোগ দিতে হলে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ার আগেই সেখান থেকে বিদায় নেবে; নেশায় ক্ষতিগ্রস্ত মন চালকহীন রথের মতো...
বুদ্ধিভ্রষ্ট মন বারবার
(চালকহীন রথের মতোই)
গর্তে পড়ে।
আইসোক্রেটস

সুস্বাদু খাদ্য মদ ও যৌনতা প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত উপভোগ করে, কিন্তু সকলেই তা করে না (যেহেতু তারা তা পরিমিতির মধ্যে রাখে না)।
অ্যারিস্টটল

সমস্ত জিনিসের মধ্যেই একটা সঠিক ও মঙ্গলজনক মধ্যবর্তী অবস্থান খুঁজে নিতে হবে।
পিথাগোরাস

এই জিনিসগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে: প্রথমত খিদে এবং সেইসঙ্গে ঘুম, লোভ আর ক্রোধ।
পিথাগোরাস

ঠিক বিষয়ের প্রতি,
ঠিক লোকের প্রতি, ঠিক ভাবে,
ঠিক সময়ে ও ঠিক সময়কালের জন্য
ক্রুদ্ধ হওয়া প্রশংসনীয়;
এইরকম মানুষ আবার
প্রশংসনীয়ভাবেই শান্ত হয়ে যায়।
অ্যারিস্টটল

কীসে ভালো তা যারা ভাবতে পারে না, তাদের মতো অতিরিক্ত অর্থব্যয় কোরো না। তবে বেশি কৃপণও হবে না;
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে
মধ্যপথই মঙ্গলজনক।
পিথাগোরাস

আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে পুরোপুরি মদ্যবর্জনই সঠিক মধ্যপথ।
অ্যারিস্টটল

বি ন য়

নিজেকে সম্মান দিয়ো, তাহলে কারও কাছ থেকে লজ্জা পেতে হবে না।
থিওফ্রাসটোস

নিজেকে সম্মান দিতে শিখলে প্রত্যেকের কাছ থেকেই সম্মান পাবে।
মোউসোনিওস

একজন নীতিভ্রষ্ট লোকই চালাকির আশ্রয় নেয়, বিনয়ই একজন সৎলোকের আশ্রয়।
ফিলো

আলাপচারিতায় নিজের কীর্তি বা বিপদের কথা বেশি বেশি করে বলবে না। কারণ অন্যলোক তোমার কীর্তির কথা বেশি শুনতে পছন্দ করবে না। আর নিজের বিপদের কথা মনে আনতে তোমার নিজেরও ভালো লাগবে না।
এপিকটেটাস

যেখানেই ভয় সেখানেই শ্রদ্ধা থাকবে।
প্লুটার্ক

প্রত্যেকটি কাজই এই মানসিকতা নিয়ে করবে যে সারা পৃথিবীই তুমি কী করছ তা দেখতে পাচ্ছে... অন্যে যে কাজ করলে তুমি দোষারোপ করবে, সেই কাজ তুমি নিজে এড়িয়ে গেলে লোকের শ্রদ্ধা পাবে।
আইসোক্রেটস

আগামী সংখ্যায় আরও

মানবমুখের স্কেচ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কলেজ স্কোয়ারে নববর্ষের বইমেলায় বইয়ে মগ্ন ক্রেতা— নিজস্ব চিত্র

বই পড়া কি কমে যাচ্ছে?

মহাশ্বেতা দেবী

বই কেনা, বই পড়ার ব্যাপারটা কি কমে যাচ্ছে? বই পাড়ায় কি মন্দা? বাংলা বইয়ের দাম কি এত বেড়েছে যে, ব্যক্তি-ক্রেতা তা কিনতে পারছেন না? ভালো বাংলা বই কি অনেক বেরোচ্ছে না, যে জন্য সুধী পাঠক বই কেনায় অনীহা? দূরদর্শন-রেডিও, সিনেমা ইত্যাদির প্রভাবে কি বই পড়া কমছে? এক সময়ে কলকাতায় চৌরঙ্গির ফুটপাথে, লাইটহাউসের উল্টো দিকে, নিউ মার্কেটে একটি দোকানে, প্রচুর ভালো ইংরেজি বই ও পত্রিকা আসত। তখনকার পেঙ্গুইন প্রকাশনার কর্তা বলেছিলেন, পশ্চাদ্‌পট বা উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে কলকাতায় ভালো বইয়ের বাজার সবচেয়ে ভালো। এখন তো ইংরেজি পেপারব্যাক তেমন আসে না।

বই কেনা, তখনকার নবতরঙ্গ বা নিউ ওয়েভের ছবি দেখা, রাজনীতি করা, এক কাপ চা ও একটি বিস্কুট অর্ডার করে বুনুয়েল বা কুরোশাওয়া, অথবা রাজনীতি বা সাহিত্য নিয়ে সময় কাটানো। এগুলো ছিল মধ্যবিত্ত তরুণদের ব্যাপার। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে তাঁরা সংগ্রহ করতেন দুষ্প্রাপ্য বই। এখন বই কেনাকাটার ব্যাপারে একটা নতুন মজা দেখছি। আজকের মধ্যবিত্ত টিভি, ফ্রিজ, ডিভিডি, ওয়াশিং মেশিন রাখেন, ভালো স্কুলে সন্তানদের পড়ান। বাড়ি বা ফ্ল্যাটও করে ফেলেন অনেকেই। অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, সমাজের এই অংশে বই কেনাটা কমে গিয়েছে। পড়ার অভ্যাসটাও কমেছে।

একটি বাড়িতে ঢুকলে রবীন্দ্রনাথ থেকে

পরবর্তী লেখকদের বই ক'টি দেখা যায়? এই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালিদের কাছেই শুনি, অমুকের বই তাঁদের ভীষণ ভালো লাগে। কিন্তু এত দাম, যে কিনতে পারি না। তবে লেখক বা অন্য কেউ ধার দিলে পড়তে পারি। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, বই বাড়ি থেকে বেরলে আর ফিরে আসে না। বড়দের বই নাকি ভীষণ দামি। আর ছোটদের বই? তখন শুনতে হয়, ''বাংলা পড়ে না বলে ওদের সমালোচনা করতে পার না। বাংলাতে ছোটদের জন্য কোনও ইন্টারেস্টিং বই-ই নেই। ইংরেজিতে দেখ তো কী বিশাল 'রেনজ'।'' এই সব ডাক্তার, অফিসার, অধ্যাপক, শিক্ষকদের ছেলেমেয়েরা কেমন স্বচ্ছন্দে তারাশঙ্কর-সতীনাথ-বিভূতিভূষণ-মানিক না পড়েও বড় হয়ে যায়। মনেও করে না, কী হারালাম। ছোটরাও ওই ভাবে কত বই না পড়ে অজ্ঞ থেকে যায়। আসলে দাম বাড়ার ব্যাপারটা নির্ভর করে বক্তার মানসিকতার ওপর। এ মানসিকতায় স্বাধীনতা-উত্তর সমাজব্যবস্থার অবদান অনেকখানি। এরা অনায়াসে দামি শাড়ি, গয়না, বিলাসদ্রব্য, পোশাক কেনেন। সেটা বাজে খরচ মনে করেন না।

কিন্তু একশো টাকার বেশি হলেই একটি বই কেনাকে বাজে খরচ মনে করেন। বই তখন ভীষণ দামি হয়ে যায়। এর মধ্যে বাংলা বইয়ের প্রতি একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে। যা ভোগ্যপণ্য, তার বেলা বাজেট বড় অঙ্কের। বই একটা স্থায়ী সম্পদ। সে মানসিকতা নেই বলেই বইয়ের বেলা বাজেটই নেই। দাম তো সব কিছুরই বাড়ছে। আজ কেমন করে একটি বইয়ের দাম অল্পের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব?

মহাশ্বেতা দেবী

সমাজে টাকা যেখানে, বই-পড়াপড়ি সেখানে নেই। ছোটদের জন্য বাংলায় 'ইন্টারেস্টিং' বই নেই যাঁরা বলেন, তাঁরা বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মুখে ইংরেজি বুকনি শুনে বিগলিত ড্যাডি ও মাম্মির দল।

আরও গভীরে যাই। বই পড়াটা যে প্রত্যহের কাজ, সে মানসিকতাও চলে গিয়েছে। লক্ষ করবেন, যে বাড়িতে মা-বাবা বই পড়েন, বইয়ের যত্ন করেন, সে বাড়িতে ছেলে-মেয়েরাও বই পড়ে। বইয়ের যত্ন শেখে। যে-সব বড়দের কথা বলছি, তাঁরা এমনও বলে থাকেন, বই পড়ার সময় হয় না। সময় হয় না। এটা কী কথা হল? যাঁদের পড়ার তাঁরা শত কর্মব্যস্ততাতেও বই পড়েন। সময় করে নেন। পৃথিবীতে সবার জন্যই তো দিন ২৪ ঘণ্টার। তার মধ্যেই যে যার কাজ করেন। কোনও মহান মানবের ৪৮ ঘণ্টায় দিন হয়েছে? তাঁরা কি বই পড়তেন না?

বাংলা বই কেনা ও পড়ার বিপক্ষে এঁদের লক্ষ যুক্তি। কিন্তু ওড়াউড়ি বা ঘোরাঘুরির সময় কম দামে এঁরা ইংরেজি পেপারব্যাকে অপরাধ-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা-পর্নোগ্রাফি-অলৌকিক, এ সব বই হরদম কেনেন। এ সময় বইয়ের দাম তাদের গায়ে লাগে না। এরও কারণ আছে। আজকের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত বাঙালির এই যে রূপান্তর, হয়তো তার কারণ এঁদের পরিবার বা জীবনের সেই পটভূমি। সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি এ সবের কোনও ব্যাপার নেই। বি এ, এম এ পাশের সঙ্গেও সাহিত্যপাঠের কোনও যোগাযোগ নেই। নামে শিক্ষিত, বাস্তবে অশিক্ষিত মানুষে দেশ ভরে গিয়েছে।

সমাজে টাকা যেখানে, বই-পড়াপড়ি সেখানে নেই। ছোটদের জন্য বাংলায় 'ইন্টারেস্টিং' বই নেই যাঁরা বলেন, তাঁরা বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মুখে ইংরেজি বুকনি শুনে বিগলিত ড্যাডি ও মাম্মির দল। এঁদের মেয়েরা 'সুইটি পাই' ও ছেলেরা 'ডার্লিং'। এঁরা খুব অজ্ঞ। অশিক্ষিত।

বাংলায় ছোটদের জন্য আজ নানা রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান-ক্যুইজ তো বটেই, শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিকদের বইও বাজারে পাওয়া যায়। বড় হয়ে ওঠার সময়ে যে বাঙালি ছেলেমেয়ে 'রাজকাহিনি' বা 'চাঁদের পাহাড়' বা 'রাজর্ষি'—এ সব বই পড়েনি, সে তো একটা মস্ত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। বরং যাঁরা কিনতে চান বাংলা বই, তাঁরা কিনতে পারেন না সব সময়ে। আর যাঁরা কিনতে সক্ষম, তাঁরা আগ্রহী নন। বই তো স্টেটাস সিম্বল নয়। যা দেখে লোকের চোখ ঈর্ষায় ছানাবড়া হবে না, তা রেখে ঘর বোঝাই করে কোন মূর্খ?

এটা তাঁদের ধারণা। আপনারা কী বলেন?

মহানগরের নিত্যদিনের বিকিকিনি: ভোগবাদের বিকিরণ

সৌজন্য: নারীযুগ

লৌকিক প্রবাদে গাণিতিক উপাদান

ড. অমল কে ভৌমিক

প্রবাদকে বলা যেতে পারে, প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অন্তরের গভীর বোধে সম্পৃক্ত, সহজ, সরস ও ব্যঞ্জনাময় বাক্য বা বাক্যসমষ্টি— যার মধ্যে থাকে বাস্তবতা, রসিকতা ও সংক্ষিপ্ততম সময়ে শিক্ষা প্রদান। বৈচিত্রময় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ধ্যানধারণা ও হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি নিংড়ে নিয়ে নির্মিত হয় প্রবাদ। প্রবাদের মধ্যে তাই কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠীর আচারবিচার, চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা, সুখ-দুঃখ, প্রেমপ্রীতি, বিরহ-বিচ্ছেদ, সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদি মানবজীবনের নানান অভিব্যক্তির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সুশীলকুমার দে-র বক্তব্য অনুযায়ী, 'প্রবাদ হল পথঘাটের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।'

প্রবাদের মধ্যে থাকে কোনও বিশেষ জনসমাজের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি, কথাবার্তা, হাবভাব, আদবকায়দা, ধ্যানধারণা, চলাফেরার ভঙ্গি— এককথায় জীবনযাপনের সমস্ত উপাদান। আকার, প্রকার, যুক্তি, মিল এবং ছন্দে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এই সমস্ত প্রবাদ বহুলাংশে গণিতনির্ভর এবং গাণিতিক প্রক্রিয়া ও নিয়মশৃঙ্খলার সঞ্জীবনী রসে মাধুর্যপূর্ণ।

বস্তুত এই প্রবাদগুলি যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, কর্মে ও অবসরে, বাণিজ্যে, কৃষিক্ষেত্রে, সামাজিক, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক নিয়মতন্ত্রকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে, তেমনি আমাদের বাস্তবজীবনকে বাস্তবিক অর্থে রসায়িত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমস্যাসংকুল প্রাত্যহিক মুহূর্ত যাপনে উদ্ভূত হাজারো সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। এই সমস্যা সমাধানের প্রতিটি ধাপে সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে অগণিত লোকমানসে অনিবার্যভাবে উন্মেষ ঘটে সূক্ষ্ম গাণিতিক বোধ ও চেতনার। প্রাত্যহিক জীবনজর্জর ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীমানসে এই বোধ ও চেতনাই হল লোকগণিতের উৎসভূমি।

প্রবাদ ও গাণিতিক পটভূমি

কোনও লৌকিক সমাজ বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বা ইতিহাস নির্ণয়ে যেমন প্রবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তেমনই সেই জনগোষ্ঠীর শিল্পবোধ, আচার-বিচার, পারস্পরিক লেনদেন, পরিচালনা, পরিকল্পনা, উৎপাদন— এই সবকিছুই যথার্থ প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। ইংরেজিতে কথা আছে— 'As the proverbs so the peoples.' প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির বুদ্ধিমত্তা, কর্মকুশলতা ও চিন্তাধারার পরিচয় মেলে তাদের প্রবাদ-সাহিত্যে। 'The genius, acts, spirit of a nation are discovered by their proverbs.'

আবার যেহেতু কোনও লৌকিক সমাজের বুদ্ধিমত্তা, কর্মকুশলতা, চিন্তাধারা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, জীবিকা সংগ্রহ এবং যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য, মাপ-পরিমাপ, সংখ্যা, আকার-আকৃতি অর্থাৎ এককথায় গাণিতিক বোধ ও চেতনা। প্রবাদের মধ্যে তাই অনিবার্যভাবে উপস্থিত রয়েছে গাণিতিক বিচারবুদ্ধি এবং নানাবিধ উপকরণ ও উপাদান। বাংলা লৌকিক প্রবাদের মধ্যে অসংখ্য সংখ্যার ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। প্রবাদ-প্রবচন ও নানারকমের বাগধারার মধ্যে এইসব সংখ্যার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে জনমানসে, প্রাত্যহিক

কাজকর্মে, অভিব্যক্তিতে কিংবা লৌকিক চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত। সাতে পাঁচে থাকে না, সাত সতেরো বোঝে না, তিন ভালো তার তেরো দোষ, তিন নয় ছয় করা, পঁয়ষট্টি দেওয়া, যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন, উনিশ বিশ মাত্র, তিনের তেরো নাই, উনপঞ্চাশ বায়ু ইত্যাদি হাজারো উদাহরণ প্রাসঙ্গিকভাবে হাজির করা যেতে পারে।

স্বাভাবিক সংখ্যাভিত্তিক প্রবাদ

'এক' হল প্রাথমিক সংখ্যা। যে-কোনও সংখ্যার সঙ্গেই এক সংখ্যাটি বর্তমান। একের বর্গ এক, ঘন এক। যে-কোনও ঘাতই এক। আবার এক-এর যে-কোনও মূলও এক। লৌকিক সমাজে বিশ্বাস, 'এক' ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বর। এক-কে ঘিরে বাংলা প্রবাদেও ভাবনাচিন্তার অন্ত নাই।

প্রবাদে 'রাম' শব্দেও 'এক' বোঝায়। যেমন *'রাম পাখি'* অর্থাৎ এক নম্বর পাখি। যে-পাখি পক্ষীকুলে শ্রেষ্ঠ। 'এক' বোধক আরও অনেক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কিংবা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আছে। যেমন 'সবেধন নীলমণি', 'শিবরাত্রির সলতে' ইত্যাদি।

'এক' কখনও ঐক্যের, কখনও অনৈক্যের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, অনৈক্যের উদাহরণ, 'এক ইঁটে মসজিদ আয় না', 'এক চাকায় রথ চলে না' ইত্যাদি। আবার, ঐক্যের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'দশে হও এক মন' ইত্যাদি। ন্যূনতম সংখ্যা হিসেবে 'এক'-এর প্রয়োগ, *'এক ঢোল এক কাঁসি'*। আবার, প্রবাদে আছে, *'একেকে একুশ করা'*। ১-এর বামে ২ বসিয়ে সহজেই ২১ করা যায়। অর্থাৎ সামান্য বিষয়কে অযথা বাড়িয়ে বলা।

প্রবাদে আছে *'এক ছাড়া দুই নাই'* অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তার মানে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। আর-একটি প্রবাদে আছে, 'এক কইয়া দুই'। শিক্ষালাভ করতে হলে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। সংখ্যা বাড়িয়ে একটা বস্তুকে সাতখানাতে পরিণত করা নিয়ে প্রবাদ হল, 'একখানাকে সাতখানা করা'। অসাধারণ কর্মকুশল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয় 'একাই একশো'। আবার যে মন্ত্র একটি মাত্র অক্ষরে, সেই মন্ত্র নিয়ে প্রবাদ হল 'একাক্ষরী মন্ত্র'। কৃপণ-স্বভাব ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা হয়েছে, 'এক পয়সা মা বাপ'। সন্তানের কাছে বাবা-মা যেমন শ্রদ্ধেয়, তেমনি একটি মাত্র সামান্য পয়সাকে মহামূল্য জ্ঞান করাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই প্রবাদে।

প্রবাদে আছে 'দুই আর দুইয়ে চার'। গণিতের প্রাথমিক নিয়মে $2 + 2 = 4$, যার কোনও ব্যতিক্রম হয় না। অকাট্য যুক্তির প্রয়োগে কোনও প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান করতে হলে এই প্রবাদের প্রয়োগ হয়। মানুষের

প্রবাদে 'রাম' শব্দেও 'এক' বোঝায়। যেমন *'রাম পাখি'* অর্থাৎ এক নম্বর পাখি। যে-পাখি পক্ষীকুলে শ্রেষ্ঠ।

চোখ দু'টি, কান দু'টি, পায়ের সংখ্যাও দু'টি। সংখ্যাবোধক এই 'দুই'-কে যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে প্রবাদে। যেমন, 'যে দিকে দু'চোখ যায়'। লক্ষ্যহীন যাত্রাকে বোঝানো হয় এই কথার মাধ্যমে। আবার, দু'টি কান নিয়ে প্রবাদ হল, *'মানুষের বড় মান তার ছেঁদা দু'টি কান'*। *'দু'কান কাটা লোক'* অর্থাৎ বেহায়া লোকের অপমান জ্ঞান থাকে না, কেউ তাকে সম্মান করে না।

'দুই'-কে দ্বিধাগ্রস্ত করে ব্যবহার করা হয়েছে প্রবাদে:

'দুই নৌকোয় পা দিলে
পড়বি শেষে অগাধ জলে'

প্রবাদ আছে, 'দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা করা' অর্থাৎ দুই সতীনের ঝগড়ার জন্য সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হয়। বেহিসাবি ও অপরিমিত ব্যয় করাকে প্রবাদে বলে, 'দু'হাতে খরচ করা'। আবার 'চোখের দু'পাতা এক করা' কে বলে ঘুমানো। গাণিতিক বিচারে 'তিন' সংখ্যাটি বিজোড় এবং মৌলিকও বটে। লৌকিক সংস্কারে, আচারবিচারে এবং দৈনন্দিন বিশ্বাসে 'তিন'-এর সর্বময় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বিশ্বাস এই যে, তিনজন মেয়েমানুষ এক জায়গায় জড়ো হলে অনর্থ বেঁধে যায়। প্রবাদে আছে,

'তিন মাইয়া যেখানে
কাজীর দরবার সেখানে'
আর চার নিয়ে,
'চারদিকে দিয়ে বেড়া
তবে ধর চাষের গোড়া'

'চারদিক' বলতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এই চারটি দিকের কথাই বলা হয়েছে। প্রবাদের বক্তব্য অনুযায়ী, জমি সুরক্ষিত করে চাষবাস করা উচিত। 'চার' শব্দটিকে অনেক সময় 'তুচ্ছ' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'চারটিখানি কথা' অর্থাৎ সহজ কাজ, অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ক্ষুদ্র শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে বলা হয়, 'পিঁপড়ে আপন হাতের চার হাত লম্বা।'

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ জেনেছে যে, তার একহাতে পাঁচটি আঙুল। আঙুলকে ঘিরে আছে নানান প্রবাদ আর সেসবের তাৎপর্যও লৌকিক জনসমাজে নখদর্পণে। মানুষের দৈহিক গঠন সম্পর্কিত সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রবাদে রূপান্তরিত হয়েছে 'হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়'। 'হাতের পাঁচ' কথাটায় আঙুলের দিকে সরাসরি অঙ্গুলি-নির্দেশিত হয়েছে এই প্রবাদমূলক বাক্যাংশেই— 'হাতের পাঁচ'। এর অর্থ নির্ভরযোগ্য শেষ সম্বল বা অবলম্বন।

আবার,

'পাঁচে ধরে বত্রিশে খায়,
আর সকলে রস পায়'

পাঁচ আঙুলের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য মুখে তুলে বত্রিশটি দাঁত দিয়ে তা চিবিয়ে গলাধঃকরণ করা হয়; আর এই কাজের ফলে শরীরে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিলাভ হয়।

আক্ষরিক অর্থেই 'পাঁচ'-কে গাণিতিক সংখ্যা হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে অনেক প্রবাদে। ডাকের বচনে আছে—

'পরিহর পাঁচদিন ভুঞ্জনে সুখ।' এই পাঁচদিন হল শুক্ল একাদশী, কৃষ্ণ একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি। কিংবা খনার বচনে উল্লিখিত পাঁচ শব্দটিও এখানে সংখ্যাবাচক পাঁচ।

'পাঁচ রবি মাসে পায়
ঝরায় কিংবা খরায় যায়'

আবার,

'পাঁচ শনি পায় মীনে
শকুনি মাংস না খায় কিনে'

সাত আর পাঁচের যোগফল বারো; এই গাণিতিক তথ্য অজানা নয় লৌকিক জীবনচর্যায়। তাই চতুর দোকানদারের হিসেবে কারসাজিকে বিদ্রূপ করে প্রবাদে বলা হয়েছে:

'সাতে পাঁচে মিলে চৌদ্দ
দু'-টাকা নয় না দিলে অদ্য'

বাংলা প্রবাদে কিছু একেবারে ভিন্ন শব্দ আছে, যেগুলি 'পাঁচ' সংখ্যা নির্দেশ করে। যেমন, 'পসুরি'। 'পসুরি' হল পাঁচ সের ওজনের জিনিস। প্রবাদে আছে, *'সেরকে পসুরি চুরি'*, কিংবা *'সব চাল বাইশ পসুরি'* অর্থাৎ ভালোমন্দের তারতম্য না করা। পাঁচ সের ওজনের ধান বা চাল মাপার জন্য বেতের ডালা হল 'দোন' বা 'দন' আবার, 'নশশু' মানে আজ থেকে পঞ্চম দিন। 'অস্থিত পঞ্চে পড়া' হল বিষম সমস্যায় পড়া। 'অস্থিত পঞ্চক' বা 'অস্থিত পঞ্চম' হল পাটিগণিতের সমস্যামূলক অঙ্কবিশেষ indeterminate equations— অনির্ণেয় সমীকরণ— পাঁচটি অজ্ঞাত রাশির দুরূহ অঙ্ক। যেমন, $ax^2 + bx + c = y^2$. সপ্তম শতাব্দীতে গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। আবার 'বদর বদর' হল দরিয়ার 'পাঁচ পির'। বাংলার হিন্দু-মুসলমান মাঝিমাল্লারা নদীপথে অথবা সমুদ্রপথে খেয়া পারাপার ও বাণিজ্য যাত্রার সময় এই প্রবাদ উচ্চারণ করে।

লৌকিক বিশ্বাসে সাত সংখ্যাটি শুভ।

রাজবংশী একটি প্রবাদের কথা, *'সাত পাঁচ কুশল বাত'*। 'সাত' সম্পর্কে এই বিশ্বাস ও সংস্কারের কথা ঘোষিত হয়েছে বাংলা প্রবাদের অনেক জায়গায়। আবার *'সাত পাকের বিয়ে চোদ্দো পাকেও খোলে না।'* সাত পাক— সপ্তপদী, হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ; বরবধূকে একসঙ্গে সপ্তপদ গমন করতে হয় অথবা বধূকে বরের চারদিকে সাতবার ঘুরতে হয়।

বাংলা প্রবাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'আট' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে 'সংখ্যা আট' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, *'আটাসে ছেলে'* হল অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ সন্তান। প্রবাদটির তাৎপর্য হল— ক্ষীণকায় ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি- আট + মাস ইয়া = আটমাসিয়া > আটমেসে > আটাসে। '*আটখানার পাটখানাও হয়নি*'। এর অর্থ হল, আটভাগের একভাগও হয়নি। কোনও কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সবদিকে সতর্কতা ও যথারীতি প্রস্তুতি দরকার। প্রবাদে আছে, *'আটে পিঠে দড়ো, তবে ঘোড়ায় চড়ো'*।

আটে পিঠে অষ্ট পৃষ্ঠে— অবয়বে— অষ্টাঙ্গে। *'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম'* বলতে বোঝায় অষ্ট অঙ্গ সহযোগে প্রণাম। 'জানু, পদ, পানি, বক্ষঃ, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য, দৃষ্টি'— প্রণামের এই অষ্ট অঙ্গ। একই রকমের, *'আটে পিঠে নেয়ো, নিতি নিতি খেয়ো'*। অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা পাকা হলে বলা হয়, *'আটকে বাঁধা'*। আটকে— পুরীর জগন্নাথদেবের প্রবাদ— আট রকমের কলাই মিশিয়ে তৈরি করা খিচুড়ি।

গাণিতিক দিক থেকে, ছয় আর নয়— এর মধ্যে একটা সাধারণ উৎপাদক আছে তিন। সতর্কতার অভাবে নষ্ট করা কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা বোঝাতে যে প্রবাদ রচিত হয়েছে, তা এই সংখ্যাদু'টির মাধ্যমেই। প্রবাদ হল—

'নয় ছয় হওয়া'

এরকমই সমার্থক আর-একটি প্রবাদ আছে, 'তিন ছয় নয় হওয়া'

এখানে লক্ষণীয় যে, $3 \times 1 = 3$, $-3 \times 2 = 6$ এবং $3 \times 3 = 9$

এক আর শূন্যের সমবায়ে গঠিত 'দশ' সংখ্যাটি দু'-অঙ্কের সংখ্যাকুলে সর্বকনিষ্ঠ। গণিতশাস্ত্রে দশের প্রাধান্য কিংবা এই সংখ্যা গণিতের গতিপথকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, তা লক্ষ করলে বিস্মিত হতে হয়। দশমিক পদ্ধতিতে গাণিতিক সংখ্যা গণনায় দশের গুরুত্ব অপরিসীম। দশের সাহায্যেই অকল্পিত অনেক বৃহৎ সংখ্যার প্রকাশ সম্ভব। এমন যে সংখ্যা তাকে ঘিরে মানুষের সমাজে, সামাজিক রাজনীতিতে, লৌকিক চেতনাতেও অনেকখানি আবেগ সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক।

বাংলা প্রবাদের রাজ্যে 'দশ' সংখ্যাটির প্রয়োগ বা তার প্রাচুর্যের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে অবশ্যই একবার তাকাতে হবে আমাদের প্রাচীন সংস্কার, লোকবিশ্বাস ও ভারতীয় শাস্ত্র তথা পৌরাণিক ধারণার দিকে। ভারতীয় পুরাণে ও হিন্দুশাস্ত্রে 'দশ' সংখ্যাটি পূর্ণতার প্রতীক। মহাশক্তির দশটি মূর্তি— দশমহাবিদ্যা। তাছাড়া, দশবাইচণ্ডী, দশভুজা, দশপ্রহরণ, দশাবতার ইত্যাদি অনুষঙ্গ দশের ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করেছে। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কারে সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে দশবিধ পাপের কথা। উল্লেখ রয়েছে দশহরা, দশযোগ ভঙ্গ, দশাঙ্গধূপ, দশোপচার ইত্যাদি। বৌদ্ধ দর্শনে আছে দশবল, আয়ুর্বেদে দশমূল। সঙ্গীতে দশকোষী হল একটি তালবিশেষ। আবার লৌকিক সমাজে প্রচলিত দশগ্রামী হল দশ গ্রামের সমাহার— *দশ গ্রামবাসী লো*। তাছাড়া দশরথ, দশানন, বা দশগ্রীব বা দশকণ্ঠ বাদ দশকন্দর কিংবা দশনামী, দশকর্ম, দশদ্বার, দশদশা, দশদিক বা দশদিকপাল ইত্যাদি এই ধরনের যে বিশ্বাস ও সংস্কার প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ নির্মাণ করেছেন। সেই বিশ্বাসে ও বোধে আলোড়িত হয়েছে আবহমান লৌকিক চেতনাও।

প্রবাদে আছে, *'দশ হাত বল'*। অর্থাৎ দশ হাত থাকলে যেমন বল অনুভব করা যায়, তেমন বল। অন্তরে অশেষ শক্তি লাভ। শাস্ত্রানুযায়ী 'দশবল' হল 'তথাগত বুদ্ধ'— দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান, যজ্ঞ, বল, উপায়, প্রনিধি ও জ্ঞান। প্রবাদে বলা হয় *'মানুষের দশ দশা'*। এই দশ দশা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই দশটি দশা। শাস্ত্রের মতে দশবিধ কামজ দশা হল— অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মরণ। বাংলা প্রবাদের *'দশমী দশা'* হল কামজ দশ দশার শেষ দশা অর্থাৎ 'মৃত্যু'। এখানে 'দশম' হল 'দশ' সংখ্যার পূরণ, ব্যাকরণগত বিচারে দশন্ ম(মট্)। *'দশ দশা'*র কথা লক্ষ করা যায় অন্য প্রবাদেও—

'পুরুষের দশ দশা
কখনও হাতি কখনও মশা'

এখানে অবশ্য 'দশ' সংখ্যাটি যে আক্ষরিক অর্থেই দশ, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রবাদটির তাৎপর্য হল, সংসারে পুরুষমানুষকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, অনেক সংগ্রামের

হিন্দুশাস্ত্রে 'দশ' সংখ্যাটি পূর্ণতার প্রতীক। কালীঘাটের পটচিত্র

মধ্য দিয়ে চলতে হয়। আর তাই পথ চলতেও অনেক হিসাবনিকাশ করতে হয়। বিশেষ করে, সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত, নইলে পরে হয় দশ গুণ শ্রম আর অর্থব্যয়। কেন না,

'সময়ের এক ফোঁড়
অসময়ের দশ ফোঁড়'

অর্থাৎ নয়টি ফোঁড় বেশি লাগে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, অনুরূপ ইংরেজি প্রবাদটিতে এই গাণিতিক হিসেব পরিষ্কার বোঝানো হয়েছে— 'A stich in time saves nine.'

প্রবাদ অনুযায়ী, *'এক গুণ দিলে দশ গুণ পাবে'*। এখানে দশ গুণ হল দশের গুণিতক। দশ দিয়ে গুণন। গাণিতিক এই গুণন প্রক্রিয়ার আরও উদাহরণ মেলে পশ্চিম সীমান্তবঙ্গে কিছু প্রবাদে—

'দু'গুণ খাব্যেক দশ গুণ বকব্যেক'। এখানে পূর্বনির্ধারিত কোনও এক বিশেষ পরিমাণের 'দু'গুণ' আর সেই পরিমাণেরই 'দশ গুণ' এমন একটি পরিমাণগত তুলনামূলক সিদ্ধান্ত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খাওয়া এবং বকা (বৃথা বাক্যব্যয়) এর মধ্যে যে অনুপাত বোঝানো হয়েছে, তা হল ২:১০।

'দশ' আর 'এক'-এর আনুপাতিক সম্পর্ক নিয়েও প্রবাদ রয়েছে বাংলায়, যেমন, *'দশবৈদ্য সম অগ্নি'*। দশজন চিকিৎসকের পরামর্শ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং পরিণামে বিনাশ ডেকে আনে। গাণিতিক আকারে, ১০ বৈদ্য = ১ অগ্নি

আবার, *'দশপুত্র সম কন্যা হয়*
যদি জামাই সুপাত্র হয়।'

এই প্রবাদ অনুযায়ী ১০ পুত্র = ১ কন্যা।

'দশ' সংখ্যাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা প্রবাদে। কখনও শুধুই গাণিতিক সংখ্যা, কখনও কোনও উপসর্গ, বিভক্তি বা প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে সম্পূর্ণ নতুন অর্থবহনকারী একেবারে নতুন শব্দ। বাংলা প্রবাদে 'দশ' কখনও 'শক্তির' প্রতীক, কখনও পূর্ণতার, কখনও-বা 'একতার' আশ্চর্য প্রতিস্থাপন।

বস্তুত, বাংলায় অসংখ্য প্রবাদেই 'দশ' সংখ্যাটির অর্থ হয়েছে— 'সবাই মিলে', 'অনেকে', 'অতি', 'বহু' ইত্যাদি। 'সামগ্রিক' অর্থেও দশের ব্যবহার আছে। কখনও আবার 'কিয়ৎসংখ্যক' বা 'কিছু পরিমাণ'। কলহে 'দশ' হল 'বহুকথা'। 'দশ' শব্দে 'দশরকম' বা 'অনেকরকম জিনিস' কখনও-বা 'নানান' বা 'নানারকম' বোঝায়। 'দশ' বলতে কয়েকজন বা সম্মানিত ওপরের দশজন ব্যক্তিও বোঝানো হয়েছে অনেক প্রবাদে। 'তুচ্ছ বা সামান্য' অর্থেও 'দশের' প্রয়োগ আছে। 'দশ' শব্দটি কখনও পাশার দানবিশেষ। 'দশপঁচিশ' ও একটি খেলায় পরিচয়ে সমৃদ্ধ। 'দশবিদশ' মানে অল্পবিস্তর। 'দশেপাঁচে' মানে 'সবাই মিলে',

বাংলা প্রবাদে বেশকিছু অদ্ভুত মজার সংখ্যারও সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে আবার কিছু সংখ্যা আছে, যেগুলি প্রবাদে মোটেই অনায়াসলব্ধ নয়। দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ এই সংখ্যাগুলি কোন গুণের জন্য লৌকিক প্রবাদে স্থান নিয়েছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যেমন, *'চললে চল্লিশ বুদ্ধি, না চললে হতবুদ্ধি'*। এখানে 'চল্লিশ' সংখ্যাটির অর্থ 'অনেক'।

কখনও আবার 'অনেকে মিলে'। 'দশের' সঙ্গে বিভিন্ন শব্দ যেমন 'হাত' 'দিন' কিংবা 'জন' বিভিন্ন একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের তারতম্য ঘটায়। 'দশহাত' কখনও আক্ষরিক অর্থেই দশ হাত। 'হাতের' হিসেবে দুই হাতে হল এক গজ, আবার তিন ফুটেও এক গজ। সেইমতো আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত। প্রবাদে 'দশহাতের' অর্থ কখনও হয়েছে গভীর কখনও দীর্ঘ।

এছাড়া বাংলা প্রবাদে বেশকিছু অদ্ভুত মজার সংখ্যারও সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে আবার কিছু সংখ্যা আছে, যেগুলি প্রবাদে মোটেই অনায়াসলব্ধ নয়। দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ এই সংখ্যাগুলি কোন গুণের জন্য লৌকিক প্রবাদে স্থান নিয়েছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যেমন, *'চললে চল্লিশ বুদ্ধি, না চললে হতবুদ্ধি'*। এখানে 'চললে' শব্দটির প্রভাবে 'চল্লিশ' সংখ্যার আগমন এমন নয়। 'চল্লিশ' সংখ্যাটির অর্থ 'অনেক'।

পরিহাসের ছলে 'আশি' সংখ্যাটির প্রয়োগ আছে প্রবাদে,

'তোদের বাড়িতে শুনি কীসের খসখসি
এক পলা তেল দিয়ে আশিজনে ঘষি'

আবার, *'পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই*
এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই'

এই প্রবাদে 'পঞ্চ' এবং 'ছাপ্পান্ন' সংখ্যাদু'টি আক্ষরিক অর্থেই গাণিতিক অর্থবহ। বাংলা প্রবাদে পাঁচের অভাব নেই কিন্তু 'ছাপ্পান্ন' সংখ্যাটি বিরল। কেবল ৪০, ৮০ কিংবা ৫৬-ই নয়, আরও অনেক সংখ্যার সমারোহ বাংলা প্রবাদের রাজ্যকে প্লাবিত করেছে। এইসব সংখ্যা বিশিষ্টতা বা চারিত্রিক দিক থেকে বড় বিচিত্র, কখনও বিরল, কখনও আবার প্রাচুর্যে ভরপুর।

বস্তুত, ১ থেকে ২০ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যাই বাংলা প্রবাদে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গাণিতিক গুণাবলি নিয়েই হাজির হয়েছে। কখনও আক্ষরিক অর্থে, কখনও একেবারে ভিন্ন অর্থে। উদাহরণস্বরূপ, সংখ্যাবোধক কয়েকটি প্রবাদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'চাষার শুধু এগারো মাস দুঃখ'

'এগারো' শব্দের অর্থ হল বেশির ভাগ সময়।

বারো সংখ্যা নিয়ে একটি প্রবাদে—

'দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ
কাট না কাট বাড়ে বারো মাস'

বারো আর তেরো এই দু'টি সংখ্যার সহাবস্থান আছে বাংলা প্রবাদে—

'বারো কাঁদি নারিকেল তেরো কাঁদি কলা
আজ রানির উপবাসের পালা'

কিংবা, *'বারো নারিকেল তেরো বামনের ঘাড় ভাঙে'*

চোদ্দো নিয়ে প্রবাদ হল: *'সজনে শাক বলে, আমি সকলে শাকের হেলা, আমার খোঁজ পড়ে কেবল চৌদ্দ শাকের বেলা'*

ষোলো নিয়ে— *'টৈয়ার ষোলো আনা লাভকরণ'* কিংবা *'ষোল কলায় পূর্ণ'*

সতেরো নিয়ে, *'সাতসতেরো বোঝা'*। এখানে সাত আর সতেরো দু'টি সংখ্যার উপস্থিতি শব্দের অর্থকে আশ্চর্যজনকভাবে প্রভাবিত করেছে।

উনিশ সংখ্যার প্রবাদ যেমন, *'উনিশ বিশ'*। উনিশ ও বিশ সংখ্যাদু'টির মধ্যে প্রভেদ মাত্র এক। ২০-১৯ = ১, তাই প্রায় সমান ধরা যায়।

কুড়ি নিয়ে প্রবাদ *'কুড়িতে বুড়ি'*

বাইশ নিয়ে *'চিড়ার বাইশ ফের'*

বত্রিশ নিয়ে *'বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া ধন'*

তেত্রিশ নিয়ে *'তেত্রিশ কোটি দেবতা'*

ছত্রিশ নিয়ে *'ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশপাতে'*

উনচল্লিশ নিয়ে *'উনা থাকলেই উনচল্লিশে ধরে'*

চল্লিশ নিয়ে *'বল বুদ্ধি ভরসা, চল্লিশ হলেই ফরসা'*

উনপঞ্চাশ নিয়ে *'উনপঞ্চাশ বাই'*। বায়ু—

বাই— বায়ুরোগ; প্রবল ব্যাধি।

পঞ্চাশ নিয়ে *'যা পাঁচে তা পঞ্চাশে'*

একান্ন নিয়ে *'একান্ন পাপও পাপ, বাহান্ন পাপও পাপ'*

বাহান্ন নিয়ে *'যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন'*

যাট নিয়ে *'ধরে বেঁধে মারে যে, যাট বছরের বড় সে'*

বাহাত্তর নিয়ে *'বাহাত্তুরে ধরা'*

আশি নিয়ে *'গয়লা আশি বছরে সাবালক হয়'*

বিরাশি নিয়ে *'বিরাশি সিক্কার ওজন'*। এই প্রবাদের অর্থ অতিরিক্ত ভারী। 'সিক্কা' = এক তোলা (ভরি) ওজন। বাজারে প্রচলিত ১ সের = ৮০ তোলা। কাজেই ৮২ তোলায় সের ধরলে ওজন বেশি হয়।

নিরানব্বই নিয়ে *'নিরানব্বই-এর ধাক্কা'*

একশো নিয়ে *'একেন পাপ, শতেন পাপ''*

এখানে কয়েকটি মাত্র সংখ্যা উল্লেখ করা হল। এরকম অসংখ্য উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

পূরণবাচক সংখ্যার প্রবাদ

পূরণবাচক সংখ্যা নিয়ে অজস্র প্রবাদ বাংলায়। সেই সমস্ত পূরণবাচক শব্দ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাণিতিক অর্থবহ। গাণিতিক গুণসম্পন্ন এই সমস্ত শব্দ বাংলা প্রবাদে ব্যবহৃত হয়ে ভাব প্রকাশকে যথার্থ করেছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা গেল ছড়ামূলক এই প্রবাদটি—

'প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি।'

এখানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই পূরণবাচক শব্দগুলি পরপর ব্যবহৃত হয়ে গাণিতিক পারম্পর্য রক্ষা করেছে। রাত্রিকে চারভাগে বিভক্ত করে এক-একটি ভাগকে প্রহর বলে। এই চার প্রহরে ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহের চার রকম অবস্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে এই প্রবাদে। ফলে চাররকম জ্যামিতিক চিত্র তৈরি হয়েছে। প্রথমে ঢেঁকির মতো সোজা (straight), পরে একটু একটু শীত করায় ধনুকের মতো বাঁকা (semi-circular), তারপরে কুকুরের মতো বৃত্তাকার (circular), সবশেষে পুঁটুলির মতো একেবারে দলাপাকানো (spherical)।

আবার, প্রবাদে আছে, 'এক নম্বর' অর্থাৎ প্রথম। ইংরেজি number থেকে 'নম্বর' মানে সংখ্যা। আদালতে কোনও নালিশ রুজু হলে তার যে ক্রমিক সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়, সেই ক্রমিক সংখ্যায় বোঝানো হয়, 'এক দফা মোকদ্দমা'।

তিনের পূরণ অর্থাৎ দুই-এর পরবর্তী সংখ্যা

> প্রাচীনকাল থেকেই লৌকিক জীবনে শূন্যের বোধ এবং ধারণার অনিবার্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার এবং চালচলনের মধ্যে। বাংলা প্রবাদেও আছে তার অসংখ্য উদাহরণ।

হল তৃতীয়। প্রবাদে আছে, 'তৃতীয় নয়ন'। মানে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

সপ্তস্বরের একটি স্বর হল পঞ্চম স্বর। নাভি থেকে উত্থিত হয়ে এই স্বর নাভি-বক্ষ-হৃদয়—কণ্ঠ ও মস্তক এই পঞ্চস্থানে বিচরণ করে। প্রবাদ হল 'পঞ্চম'। কোকিলে পঞ্চম গায়।

প্রবাদে আছে, 'অষ্টম গর্ভের সন্তান'। লোকসমাজে বিশ্বাস এই, অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মাত্রেই কিছু অস্বাভাবিকতা কিংবা অসাধারণত্ব থাকে।

ভীতিবিহ্বল অসহায় ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে নির্মিত প্রবাদ হল 'নবমীর পাঁঠা'। 'নবমী' মানে দুর্গোৎসবের 'নবমী তিথি'।

দশের পূরণবাচক শব্দ হল 'দশম'। 'দশম'-এর অনুষঙ্গ বাংলা প্রবাদে খুব সুখকর নয়। সংস্কৃত শ্লোক থেকে বাংলার লোকসমাজে গৃহীত প্রবাদ হল *'জামাতা দশমো গ্রহ'*।

প্রবাদে শূন্য চেতনা

গণিতের সামগ্রিক ইতিহাসে সর্বকালের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল শূন্যের ধারণা ও তার আবিষ্কার। অধ্যাপক Halsted তাঁর 'On the Foundation and Technique of Arithmetic' পুস্তকে শূন্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'অনস্তিত্বকে এইভাবে শুধু বাসস্থান, নাম, আকার ও রূপদানই নয়, তার মধ্যে ব্যবহারোপযোগী শক্তি প্রতিষ্ঠা করা'—। সেই প্রাচীনকাল থেকেই লৌকিক জীবনে শূন্যের বোধ এবং ধারণার অনিবার্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার এবং চালচলনের মধ্যে। বাংলা প্রবাদেও আছে তার অসংখ্য উদাহরণ। শূন্য মানে ফাঁকা, void। সে-কথার প্রমাণ আছে প্রবাদে— *'শূন্যের চেয়ে সামান্য ভালো'*। এই প্রবাদে 'শূন্য' সম্পর্কে 'অজানিত ভয়' কিংবা শূন্য সম্পর্কে এখানে অজ্ঞতা, তাচ্ছিল্য ও নগণ্যভাব প্রকট হয়েছে।

গাণিতিক এই সত্য $a - a = 0$-এর প্রকাশ রয়েছে এই প্রবাদটিতে—

'রাজা গেল পাটনে, শূন্য হল দেশ

লৌকিক জীবনচিত্র। বাংলার মন্দিরগাত্র থেকে

মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ।'

অর্থাৎ রাজা-রাজা=শূন্য। রাজা পাত্রমিত্র-সহ রাজধানী ছেড়ে রাজ্য পরিদর্শনে গেলে, সেই সুযোগে বহিরাগত নগণ্য ব্যক্তিও ক্ষমতা দখল করে থাকে।

বৃহৎ সংখ্যা ও অসীমের ধারণা নিয়ে প্রবাদ

একশো-র আবির্ভাব তো বাংলা প্রবাদে শ'য়ে শ'য়ে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল হাজার, লক্ষ, নিযুত, এমনকী কোটি কিংবা তার চেয়ে বড়, অনেক বড় সংখ্যার উপস্থিতিও লক্ষ করা যায় বিভিন্ন প্রবাদে, প্রবচনে ও নানারকম বাগধারায়। এই সমস্ত সংখ্যা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়— লৌকিক জনসমাজে বড় সংখ্যার ঠিকানা যেমন রহস্যাবৃত, তেমনই এইসব লৌকিক চেতনায় সৃষ্টি করেছে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহল।

বাংলা প্রবাদে 'একশো' এই সংখ্যাটি অসংখ্য, অনেক বা বহুতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

'সৎ কার্যে শতেক বাধা'

কর্মে প্রেরণা সঞ্চার করতে এবং নতুন কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে এখানে এই 'শতেক' শব্দটির প্রয়োগ যেন অব্যর্থ।

কেবল একশোই নয়, শ-এর অগুনতি বোঝাতে 'শত শত' শব্দটিও আছে বাংলা প্রবাদে:

'প্রবেশ পথ শত শত
শেষের পথ একশত'

হাজারের উদাহরণ অবশ্য বাংলা প্রবাদে আরও চমৎকাররূপে উদ্ধৃত করা যায়।

'হাজার বাল্লা এক আল্লাহ্'

অর্থাৎ হাজার বিপদেও আল্লাহকে নির্ভর করলে ভয় দূরে যায়।

খনার বচনে আছে,

'শতেক ধেনু হাজার কলা
কী করবে আকাল শালা'

অর্থাৎ গৃহস্থের যদি একশো গরু এবং এক হাজার কলাঝাড় থাকে, তবে দুর্ভিক্ষের সময়েও কোনও অভাব হয় না।

সহস্র কথার মানেও হাজার অর্থাৎ দশ শত। প্রবাদ হল,

'শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ,
সহস্রমারী চিকিৎসকঃ'

হাজারের পর বাংলা প্রবাদে আর যে বড় সংখ্যার উল্লেখ করা যায়, তা হল লাখ বা লক্ষ। একশো হাজারে এক লক্ষ। একের পিঠে পাঁচটা শূন্য। সাধারণভাবে বিশাল সংখ্যা বোঝাতে বাংলা প্রবাদে 'লক্ষ' বা 'লাখ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। যেমন,

'ভোরের হাওয়া,
লাখ টাকার দাওয়া'

একবারের চেষ্টায় কোনও মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না, প্রয়োজন একাগ্রতা আর অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়কেই বোঝানো হয়েছে 'লক্ষ' সংখ্যার মাধ্যমে,

'লক্ষ বাটুল লক্ষ তীর,
তবে হয় হাত স্থির'

প্রবাদে আছে, *'এক কড়ার সিন্নি, আশি হাজার পির'*।

এখানে 'এক কড়ার' সঙ্গে 'আশি হাজার' সংখ্যাটি গণিত ও পরিমাণের দিক থেকে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে।

পঁচাশি লাখের কথা আছে এই প্রবাদে—

'ভাত জোটে না বামুন মাসি
কথায় মারেন লাখ পঁচাশি'

একশো লক্ষে এক কোটি। উন = কোনও পূর্ণসংখ্যা থেকে এক কম। তাহলে উনকোটি মানে এক কম এক কোটি অর্থাৎ ৯৯৯৯৯৯৯, এই সংখ্যাকে পুরোপুরি এক কোটি বলেই উল্লেখ করা যায়। কিন্তু উনকোটি বললে নির্ভুল ও অতি সূক্ষ্ম হিসেব বোঝায়। প্রবাদে আছে *'উনকোটি চৌষট্টি'*।

আবার হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি, তাই প্রবাদমূলক বাক্যাংশ হল—

'তেত্রিশ কোটি দেবতা'

আরও অনেক বড় সংখ্যা, এমনকী 'অনন্তের' সন্ধানও আছে বাংলা প্রবাদে— *'কুড়ের কুড়ি বুদ্ধি, নুলোর অন্ত নাই'*।

গুণিতক ও ভগ্নাংশ সংখ্যার প্রবাদ

গুণনের অজস্র সংকেত রয়েছে বাংলা প্রবাদে। এই গুণ কখনও তুলনামূলক, কখনও-বা নিছকই পরিমাণবোধক। প্রবাদে যেসব গুণের কথা বলা আছে তা যেমন গণিতনির্ভর, তেমনি মানসিক ভাব প্রকাশের অব্যর্থ সহায়ক। 'একগুণ', 'দ্বিগুণ', 'তিনগুণ', 'চারগুণ', 'সাতগুণ' বা 'দশগুণ' ইত্যাদি গণক (multiplier) সরাসরি গাণিতিক চেতনায় সমৃদ্ধ। এছাড়া আছে আরও একটি আশ্চর্যজনক গুণের কথা 'নির্গুণ'— অর্থাৎ শূন্য দিয়ে গুণ। আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী, 'নির্গুণ হল 'গুণহীন, বিদ্যাশৌর্যরূপাদিশূন্য'। প্রবাদের বক্তব্য হল— *'নির্গুণ আদার তিনগুণ ঝাল'*।

এক গুণ অর্থাৎ ১ দিয়ে গুণ হল পরিমাপ ক্রিয়ার একক (unit)। এখানে উল্লেখযোগ্য হল, প্রবাদে একগুনের সঙ্গে অন্য কোনও সংখ্যক গুণের উপস্থিতি আপেক্ষিক বোধকে চূড়ান্ত করেছে। যেমন,

'ধান একগুণ, তো তুষ তিনগুণ'

অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় নিকৃষ্ট বস্তুই অধিক। আবার যে, একগুণের সঙ্গে দশগুণও একত্রিত হয়েছে প্রবাদে

'একগুণ দিলে দশগুণ পাবে'

দাতার দান কখনও ব্যর্থ হয় না, তার প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যায় এবং তা পাওয়া যায় দশগুণ অর্থাৎ বৃহৎ আকারে। গণিতের ভাষায়,

ফেরত পাওয়া = ১০ x দেওয়া।

অখণ্ডিত '১' এই সংখ্যার খণ্ডিতাংশ বা একের কম অংশকে (fraction) বলে ভগ্নাংশ। এই ভগ্নাংশ বাংলা প্রবাদের বিরাট অংশকে পূর্ণতা দিয়েছে। বস্তুত, ভাগ বা ভাগাভাগির কথা প্রবাদের অনেক ক্ষেত্রেই ঘোষিত হয়েছে। *'কালনেমির লঙ্কাভাগ'* কিংবা *'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'* ইত্যাদি প্রবাদ এই ঘোষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রবাদে আছে *'চটকস্য মাংসং ভাগশতম'* চটক অর্থাৎ চড়াই, ক্ষুদ্র এই পাখির মাংস শতভাগে বিভক্ত হলে এক-একটি অংশের পরিমাণ হয় অতি সামান্য। 'ভাগশতম'-এর গাণিতিক রূপ ১/১০০— একশো ভাগের এক ভাগ। 'সামান্য অংশ' বোঝাতে আরও প্রবাদ আছে, যা গাণিতিক চেতনাসমৃদ্ধ। যেমন, *'তিনের তেরো'*। তেরো ভাগের তিন ভাগ। গণিতের ভাষায় তিনের তেরো হল ভগ্নাংশ ৩/১৩।

কোনও বিষয়ের অতি সামান্য অংশ বোঝাতে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ হল, 'বিন্দুবিসর্গ', গণিতের দিক থেকে যা অজ্ঞাত ভগ্নাংশবোধক সংখ্যা।

বাংলা প্রবাদে ভগ্নাংশের বোধ রূপায়িত হয়েছে পৃথক শব্দের মাধ্যমেও। যেমন, *'পুনকে শত্রু বড় আপদ'*। 'পুনকে' = ক্ষুদ্র, এক পণের ষোলো ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১/১৬ ভাগ।

আবার, *'কানিত্যে কুনি ভালো'* —এই প্রবাদে 'কানি' হল পঁয়ত্রিশ শতাংশ জমি আর এক কানির এক-চতুর্থাংশ হল 'কুনি'। অর্থাৎ, কানি = ০.৩৫ জমি এবং কুনি = ১/৪ কানি। প্রবাদটির মর্মার্থ হল, উর্বর জমির পরিমাণ অল্প হলেও তাতে অধিক ফসল জন্মে।

আবার প্রবাদে যখন বলা হয়,

'হরিদাসের ছয় ভাই
তিন আনিও ভাগ নাই'

তখন উল্লিখিত 'তিন আনির' গাণিতিক রূপান্তর হল ৩/১৬।

আবার খনার বচনে আছে:

'এক হাত মুটুম কলা পোঁত
তবে দেখবে কলার গোট'

'মুটুম' হল কনুই থেকে বদ্ধমুষ্টি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। মোট পৌনে দুই হাত। অর্থাৎ ১ = মুটুম ১৩/৪ হাত।

এছাড়া বাংলা প্রবাদে যেসব ভগ্নাংশের আধিক্য দৃষ্ট হয়, সেগুলো হল:

১/২, ১/৪, ৩/৪, ১১/২, ২১/২, ৩১/২ ইত্যাদি।

একের দুই অর্থাৎ ১/২ এই ভগ্নাংশ বাংলা

প্রবাদে হয়েছে অর্ধ, আধা, আধ কিংবা অর্ধেক বা আধেক রূপে। সমাজজীবনে অসৎ লোকের চাতুরীর সাক্ষীকে ফিফটি-ফিফটি অংশীদার করার ঘটনাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই প্রবাদে, *'তো অর্ধং মো অর্ধং'*।

প্রবাদে আছে, *'অর্ধ রোগ হরে নিদ্রা, সর্ব রোগ হরে ক্ষুধা'*। তার মানে, রোগের অর্ধেকটা চলে যায় ভালো ঘুম হলে আর বাকি অর্ধেকটা যায় আহারে রুচি হলে কিংবা ক্ষুধার সৃষ্টি হলে। আবার, *'আধ কড়িতে বেচা'*— এই প্রবাদের 'আধা' মানেও উচিত মূল্যের অর্ধেক, যদিও 'অর্ধেক' কথাটা আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। বস্তুত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ভগ্নাংশটির প্রয়োগ হয়েছে আংশিক বোঝাতে।

'আধা' শব্দে মাঝামাঝি বোঝানো হয়েছে নিম্নলিখিত প্রবাদে—

'আধা মাঘে কম্বল কাঁধে'

দু'টি অর্ধেক মিলে সম্পূর্ণ হয়। এই গাণিতিক সত্যের অবতারণা হয়েছে এই প্রবাদের মাধ্যমে—

'অসৎ কর্মের বিপরীত ফল,
অর্ধেক কিল অর্ধেক চড়'

তার মানে, ১/২ + ১/২ = ১ অর্থাৎ পুরো শাস্তি। আর-একটি প্রবাদ হল, *'আইধ্যার আধা তাও ধুরা'*। কোনও বিষয়ে ঘাটতি-সন্দেহে একথা বলা হয়। আধিয়ারের কাছ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট অংশটি কৃষক পায়। 'ধুরা' হল চিটা অর্থাৎ চালহীন ধানের খোসা।

আবার 'ব্যাঙের আধুলি' এই প্রবচনমূলক বাক্যাংশে 'আধুলি' মানে ১ টাকার অর্ধেক। সামান্য ধনে অহংকার করতে দেখলে একথা বলা হয়।

আবার *'সিকি পয়সা মা বাপ'* এই প্রবাদে 'সিকি' মানে এক-চতুর্থাংশ (=১/৪)। এক পয়সার চার ভাগের এক ভাগ। অত্যন্ত কৃপণ।

ডাকের বচনে আছে,

'চোখে অঞ্জন, দাঁতে লবণ,
পেট ভরিব তিন-কোণ'

'তিন-কোণ' মানে তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ (=৩/৪) অর্থাৎ পাকস্থলীর এক-চতুর্থাংশ খালি রেখে ভোজন করা উচিত।

উত্তরবঙ্গের লৌকিক প্রবাদে আছে,

অঘনে পৌটি, পুষে চেউটি
মাঘে নাড়া, ফাগুনে কাড়া

এখানে পৌটি = পূর্ণ,
চেউটি = তিন-চতুর্থাংশ (= ৩/৪)
নাড়া = এক-চতুর্থাংশ (= ১/৪)
কাড়া = শূন্য (= ০)

'সওয়া' অর্থাৎ এই ১১/৪ ভগ্নাংশ নিয়েও প্রবাদ অনেক। 'মরা হাতি সওয়া লাখ'। প্রবাদটির রূপান্তর হল, 'মরা হাতি লাখ টাকা'।

আবার কাজে কুড়েমি করলেও নিষ্কর্মা লোকেরা খাওয়ায় আর কথায় পটু। প্রবাদ হল,

'কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে,
বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে'

এখানে দেড়ে মানে ১১/২ গুণ।

'দেড়' সংখ্যা নিয়ে আরও প্রবাদ আছে—

'দেড় বুড়ির মানুষ নয়, তার তিন বুড়ির কথা'

'দেড় বুড়ির গয়না, বিবির গায়ে সয় না'

'দেড় কুড়ি ভারানি চাঁট গায়ে বরাত' ইত্যাদি।

'আড়াই'—এই ভগ্নাংশ সংখ্যাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা প্রবাদে।

যেমন অলস নিষ্কর্মা ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়,

'কাজের মধ্যে আড়াই
খাই শুই আর বেড়াই'

এখানে ১ + ১ + ১/২ = ২ ১/২, খাওয়া এবং শোওয়াকে এক-একটি পুরো কাজ ধরে বেড়ানোকে ধরা হয়েছে 'অর্ধেক'। আবার, *'কুকুরের মার আড়াই প্রহর'* এই প্রবাদে আড়াই প্রহর অল্প সময়। আট প্রহরে দিন ধরলে 'আড়াই প্রহর' দিনের একটি ভগ্নাংশ। গণিতের হিসেবে আড়াই প্রহর = ৫/১৬ দিন।

আরও কয়েকটি বিচিত্র ভগ্নাংশের কথা বলা আছে প্রবাদে। যেমন, *'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'*, *'সাড়ে চুয়াত্তর'* ইত্যাদি। *'সাড়ে চুয়াত্তরে'র* তাৎপর্য হল, অত্যন্ত গোপন চিঠি। 'তিনের তেরো' অর্থাৎ তেরো ভাগের মধ্যে তিন ভাগ তার মানে ৩/১৩ ভগ্নাংশ। গণিতের ভাষায় তিনের তেরো— অতি সামান্য অংশ।

আবার, *'হরিদাসের ছয় ভাই,*
তিন আনিও ভাগ নাই'

প্রবাদের মর্মার্থ হল, অংশীদারের পরিমাণ অধিক হলে অংশের পরিমাণও কমে যায়। ১৬ আনাকে ৬ ভাগ করলে একক ভাগে হয় ১৬/৬ = ২২/৩ আনা < ৩ আনা।

প্রবাদে মাপ পরিমাপ

সাংসারিক জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে প্রতি মুহূর্তেই সবকিছু পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক হয়। আর সেই কারণে বাংলা প্রবাদেও বিভিন্ন বস্তু ও নানারকম সামগ্রীর মাপের বিভিন্ন একক (unit) আর তার পরিমাপও খুব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত। প্রবাদে যে মাপামাপি বা তার প্রয়োজন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে, তার নমুনাও রয়েছে বাংলা প্রবাদেই—

'যে কাঁটার মাপ
সেই কাঁটায় শোধ'

যে যেমন ব্যবহার করে, তাকে সেইরকম প্রতিদান দিতে হয়। বিশেষ করে, মন্দ ব্যবহারকারীর প্রতি মন্দ ব্যবহারই উপযুক্ত। এখানে ওজন-পরিমাপক যন্ত্র কাঁটা অর্থাৎ 'দাঁড়িপাল্লার' কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, আধুনিক সিজিএস পদ্ধতি কিংবা দশমিক পদ্ধতির এককের মাপ পরিমাপ বাংলা প্রবাদে অনুপস্থিত। তার কারণ, প্রবহমান লৌকিক জীবনের অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক পরিমণ্ডলে মাপ পরিমাপের একক এবং পদ্ধতি ছিল তাদের একান্ত নিজস্ব ও বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গতানুগতিক কিংবা প্রথাসিদ্ধ মাপজোখ বা এককের বাইরে একেবারে নিজেদের মতো করে উদ্ভাবিত বিভিন্ন একক আপন আপন সমাজগোষ্ঠীতে স্বীকৃত।

বাংলার লৌকিক প্রবাদে ওজনের যে-সমস্ত একক অহরহ দৃষ্ট হয়, সেগুলো হল মন, সের, ছটাক, পালি, পোয়া, দন, কাটা, আড়ি, রেক, বিশ, কাহন ইত্যাদি।

বাংলা প্রবাদে ব্যবহৃত ওজনের এককগুলির মধ্যে 'মন'ই বোধ করি বৃহত্তম। ষোলো পালি বা আট দনে এক মন। 'পালি' হল ধান্যাদির পরিমাণ নির্ধারণের নির্দিষ্ট একক। আসলে পালি হল বেতনির্মিত পাত্র, যাতে আড়াই সের ওজনের শস্য ধরে। আবার, সেরের হিসেবে, এক মন হল চল্লিশ সের। এক মনকে ছটাকে প্রকাশ করতে হলে চৌষট্টির পর একটা শূন্য দিতে হবে। অর্থাৎ,

১ মন = ১৬ পালি = ৮ দন = ৪০ সের = ৬৪০ ছটাক।

প্রবাদে আছে, *'ধান একমন চালকে তেরজন'*। কেবল এক মন নয়, নয় মনের কথাও আছে বাংলা প্রবাদে, *'ন মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না'*। মহাজনী কারবারে বড় হিসেবের ক্ষেত্রে 'মনের' প্রয়োগ হয়, কিন্তু সাধারণ স্তরে ওজনের সর্বাধিক জনপ্রিয় একক 'সের'।

'আমার দই-এর এমনি গুণ/ এক সের দইয়ে তিন সের নুন'। প্রশংসার স্থলে নিন্দনীয় বিষয় ঢাকতে চাইলে পরিহাসছলে এই প্রবাদের প্রয়োগ হয়। দই এত টক যে প্রচুর লবণ না মেশালে মুখে দেওয়া যায় না। যে-অনুপাতে লবণ মেশাতে হবে, তার গাণিতিক রূপ = ১: ৩।

পাঁচ সের ওজন একসঙ্গে হলে পসুরি অর্থাৎ ১ পসুরি = ৫ সের। এক সেরের মধ্যে পাঁচ সের চুরি অর্থাৎ অপরিমিত চুরি বোঝাতে বলা হয়— *'সেরকে পসুরি চুরি'*। সেরের পরেই সর্বাধিক ব্যবহৃত একক 'ছটাক'। 'ছটাক' অতি ক্ষুদ্র একক। এক সেরের ষোলোভাগের এক ভাগ। আর পাঁচ ছটাকে হল এক 'কুনিকা', অর্থাৎ কুঞ্চিকা। মনুপ্রদত্ত সূত্র 'অষ্টমুষ্টিভর্বেৎ কুঞ্চিঃ'— এই অনুসারে আটমুষ্টি পরিমাণ হল এক কুনিকা। তাই ছটাকের পরিমাণ অতি সামান্য, তাই ছটাক যেন নগণ্য, অতি তুচ্ছ!

লেখকের 'লোকগণিত: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' বই থেকে সংক্ষেপিত

সৌজন্য: বিশ্বেন্দু নন্দ সম্পাদিত 'পরম'
কৃতজ্ঞতা: ড. অমল কে. ভৌমিক

ভ্রমণে ভূমিকম্প

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শিলংয়ে প্রথম রাত

তখন বায়ুদূত নামে ছোট একটা বিমান সকাল ছ'টায় কলকাতা বন্দর থেকে উড়াল দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নামত গিয়ে শিলং এয়ারপোর্টে। সেইমতো ভোর পাঁচটা থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে বসে থেকে থেকে শেষ অব্দি বেলা একটায় ক্লান্ত-বিরক্ত যাত্রীদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল।

পাইনউড হোটেল তখনও ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে চলত, নামও ছিল অশোক পাইনউড।

মেঘালয়ে এসেছি দুদিনের জন্য, তার একটা দিনের প্রায় অর্ধেক কাটল কলকাতা বিমানবন্দরে, তখনও জানতাম না দিনটার বাকি অংশ কাটবে ভূমিকম্পের আন্দোলনে। 'ভ্রমণ' তখন বহু দূরে, মনে মনে শুধু দুয়েকটা কল্পনার খসড়া বানাই আর ভাঙি।

শেষবেলায় হোটেলে পৌঁছে, হাতের ব্যাগ নামিয়েই বেরিয়ে পড়েছি পড়া ও শোনা, কল্পনায় গড়া শিলং পাহাড়ের সবুজ স্বচক্ষে দেখতে। ততক্ষণে মেঘালয়ের সঙ্গে মনে-মনে আমার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। নেহাত সন্ধে নামলে শিলংয়ের রাস্তায় ঘোরাঘুরির ব্যাপারে হোটেল থেকে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে বার-এ একপাত্র শিলংয়ের বিখ্যাত চেরি ব্র্যান্ডি নিয়ে স্থানীয় তরুণ সম্প্রদায়ের হাবভাবে মনোযোগ দিই। অল্প কিছুক্ষণেই তরুণদের স্বরে চাপা উত্তেজনা কানে এল। মেঘালয়ের মেঘ-কুয়াশার মতোই ঝাপসা ভাবে মনে হল শিলংয়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তরুণদের মনে প্রবল রাগ ও ক্ষোভ জমা হচ্ছে।

এ অবস্থায় স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা সম্ভব নয় জ্ঞানে সকালসকাল রাতের খাওয়া সেরে ঘরে চলে যাই।

পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে একদল ভালুক ঢুকে পড়ে সাংঘাতিক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড জুড়ে দিয়েছে। টেবিলের জিনিসপত্র কাঠের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, বন্ধ দরজা-জানলার কপাট, এমনকী পুরো ঘরটাই ভালুকবাহিনীর লম্ফঝম্পে মাঝে মাঝেই ঠকঠক করে কেঁপে উঠছে। সঙ্গে ভালুকদের ধুপধাপ, ঝটাপটি। ভয়ে বিছানায় উঠে বসেও ঝাঁকুনি খাচ্ছি, অন্ধকারে ঘরের ভেতরে ভালুকদের অবস্থান ও মনোভাব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

দম বন্ধ করা আতঙ্কে একেকটা মুহূর্ত কাটছে, ভালুকের দল যে-কোনও সময় মর্জি হলেই আমার মশারি ছিঁড়েখুঁড়ে আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলবে ভেবে কাঠ হয়ে আছি, এমন সময় বেডসাইড টেবিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চমকে দিয়ে ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। মশারির কাপড়সুদ্ধ ফোন আঁকড়ে ধরতেই কানে এল 'এক্ষুনি বাইরে আসুন! রিসেপশনের সামনের লনে এসে জড়ো হোন। খেপে-খেপে ভূমিকম্প হচ্ছে। এই নিয়ে চারবার আপনাকে ফোন করা হল।'

মৃদুস্বরে শুধু বলতে পারলাম, 'ক-টা বাজে?'

'দুপুর দুটো। শিগগির বাইরে আসুন!'

তবে কি অনেক রাতে ঘুমিয়েছি? কলকাতায় আগের দুদিন কাজের চাপে খুব একটা ঘুমের সুযোগ পাইনি, এ হয়তো তারই জের। এখানে এসে পাওনা ঘুম উশুল হল! এত গভীর ঘুম যে ভূমিকম্পে দেখলাম ভালুকনৃত্য।

চিনের পুষ্পোদ্যানে বাসুকির ফণাবদল

কলকাতা থেকে রাত বোধহয় ১টায় মাটি ছেড়ে আকাশে উঠেছি, ঘণ্টা আড়াই আকাশপাড়ি দিয়ে নামলাম এসে চিনদেশের কুনমিংয়ে। কুনমিং প্রদেশে তখন রাতের আঁধার। আমাদের জন্য গাড়ি আসার কথা, এসেছে কিনা কোথায় খোঁজ করব, গাড়ি দাঁড়াবার জায়গাই বা কোনদিকে জনে জনে জিজ্ঞেস করে কিছুই জানা গেল না। ইংরিজি শুনেই যে যার পথে নিস্পৃহ চলে যায়। একজন পুলিশকে মন্থর পায়ে বিচরণরত দেখে এগিয়ে যাই, উচিতমতো সময় নিয়ে আমাদের সমস্যাটা বুঝিয়ে বলতে পেরে যখন কিছুটা আশান্বিত হয়ে পুলিশের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি অধীর অপেক্ষায়, তখন তার একাক্ষর উত্তর— ইংলিশ? বলে মাথা নেড়ে ফের চরতে গেলেন। ইতিমধ্যে আমাদের সমস্ত সহযাত্রীরা সবাই যে যার পথে নিস্ক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা সবাই চিনাভাষী। কারা আমাদের নিতে আসবেন, কারা তাদের পাঠাবেন, কোথায় কোন হোটেলে নিয়ে যাবার কথা, এসব কিছুই না জেনে সেদিন অফিস করে প্রায় শেষ মুহূর্তে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বিমানবন্দরে রওনা হয়েছি। তথ্য বলতে শুধু এই জানি— চলেছি চিনে, প্রথমে নামব কুনমিং। সেখানে কেউ আমাদের নিতে আসবেন।

পর পর কয়েকটা বন্ধ গবাক্ষতুল্য কাউন্টারের একটা খোলা পেয়ে, কাচের ওপারে এক রমণীমূর্তি দেখে আকুল হয়ে আমাদের মরণ-বাঁচন প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করি। তিনিও নিরুত্তর, তবে নির্দয় নন। ট্রাভেল এজেন্সির নাম শুনে তাঁর ফোন নম্বরে নিজের ফোন সংযোগ করে ফোনটি আমার হাতে দিয়ে বললেন— 'ইংলিশ।' অর্থাৎ ফোনের অন্যপ্রান্তে, ইংরিজি অচল নয়।

হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন কুনমিংয়ের আকাশ আঁধার ধুয়ে সূর্যালোকে জ্বলছে। সকালের ভ্রমণসূচির বেশির ভাগই বাদ, বাকিটুকুও বাদ না যায়, অগত্যা বিলম্বিত প্রাতরাশেরও আশা ত্যাগ করে চলে গেলাম কুনমিংয়ের বিখ্যাত পুষ্পোদ্যানে। ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক হর্টিকালচারের প্রদর্শনী হয়েছিল এখানে। বিশাল-আয়তন এই উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত তখনকার সব পুষ্পলতাবৃক্ষসজ্জা স্থায়ী সম্পদ হিসেবে রাখা আছে। সেবছর 'ভ্রমণ'-পাঠকদের চিনদেশের ওপর ভ্রমণ-ভিসিডি উপহার দেবার কথা। কুনমিংয়ের পুষ্পোদ্যানে মন তখন পাগল হইয়া কোণে-কোণে ঘোরবার জন্য ব্যাকুল, সে মায়ার পাশ কাটিয়ে দৃশ্য বেছে ক্যামেরা

চালাচ্ছি। আগাগোড়া ফুলের তৈরি আকাশছোঁয়া জাহাজের পাল পুরোটা ধরবার জন্য ক্যামেরা কিছুটা ধীরে টিলট আপ করতে করতে পালের মাথায় পৌঁছে হঠাৎ পালের চারপাশের দৃশ্য আঁকড়াবার লোভে দ্রুত প্যান করতে গিয়ে বিশ্রীরকম মাথা ঘুরে গেল। পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু তার পরের কয়েক মুহূর্ত জোর করে যতই কেন ছবি তুলি, মাথা ঘোরা ততই যেন বাড়তে লাগল। ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ব্লাড প্রেশারের বড়িও বাদ যাওয়ার দাম এভাবে এতটা দিতে হবে, কে জানত! কিমাশ্চর্যমতঃপরম! মাথা ঘোরা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎই উধাও। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা আশ মিটিয়ে ফুলপরীদের দেশের বহুবিধ দৃশ্যশিকার শেষ করে হোটেলে ফিরেই স্তম্ভিত। দক্ষিণ চিনের কোথায় যেন দুপুর আড়াইটা নাগাদ বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া আহত-নিহতের সংখ্যা জানতে কয়েকদিন লেগে যাবে। কারণ না জেনে মাথা ঘোরা আমাকে কিছুটা কষ্ট দিলেও, এখন সেই সামান্য মাথা ঘোরার কারণ আমাকে বিধ্বস্ত করে দিল।

টিভিতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মৃতের সংখ্যা, ধূলিসাৎ হওয়া গৃহের সংখ্যা বেড়েই চলল। দিনের শেষে জানা গেল পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ হয় মৃত, নয় নিখোঁজ।

পরদিন কুনমিং থেকে বিমানে ঠিক কোথায় যাবার ছিল ভুলে গেছি, যা মনে আছে তা হল— বিমানবন্দরে বিমানের অপেক্ষায় বসে আছি, হঠাৎ সবরকম কথা শব্দ থেমে গেল, সব মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে নীরবতা পালন করছে। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ঘড়িতে তখন ঠিক দুপুর ২টো ৩৫। এক মিনিট পর ঘোষণা শোনা গেল, প্রথমে চিনা ও পরে ইংরিজি ভাষায়— দেশের অধিকাংশ বিমান খাদ্য বস্ত্র ওষুধ ত্রিপল ইত্যাদি ভূমিকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকায় আমাদের বিমান আসতে বিলম্ব হবে।

সে-যাত্রায় কুনমিং থেকে বেজিং-শিয়ান-গুইলিন-ইয়াংসু-হাংঝাউ-সুঝো-সাংহাই বেড়িয়ে কুনমিং হয়ে যখন দেশে ফিরছি তখনও চিন তার এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠবার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে একটা ব্যাপার আমি ভালো বুঝিনি। এত বড় বিপদে অনেক বিদেশি রাষ্ট্রের ত্রাণসাহায্যের প্রস্তাবে সকৃতজ্ঞ সম্মতি না জানিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিনের রহস্যময় নীরবতা পালনের অর্থ হয়তো রাজনীতি বিশেষজ্ঞ না হলে বোঝবার কথাও নয়। হয়তো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বা দেশে দেশে তার লাভক্ষতির হিসেব-নিকেশ এইসব আচার-আচরণের নীতি নির্ধারক। আমি দেশে ফিরে এলাম ভূমিকম্পে মানুষের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি আর পরিত্রাণহীন দুঃখকষ্ট শোকাঘাতের স্মৃতি নিয়ে।

এত বড় বিপদে অনেক বিদেশি রাষ্ট্রের ত্রাণসাহায্যের প্রস্তাবে সকৃতজ্ঞ সম্মতি না জানিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিনের রহস্যময় নীরবতা পালনের অর্থ হয়তো রাজনীতি বিশেষজ্ঞ না হলে বোঝবার কথাও নয়। হয়তো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বা দেশে দেশে তার লাভক্ষতির হিসেব-নিকেশ এইসব আচার-আচরণের নীতি নির্ধারক।

সোফিয়ায় বাইশতলায়

ভ্রমণে ভূমিকম্প আমার পিছু ছাড়ে না। এই তো সেদিন, এবছর মে মাসের শেষ দিকে, বুলগেরিয়ার পর্যটন মন্ত্রক আর বুলগেরিয়া-ভারত পর্যটন উন্নয়ন ফোরামের নাছোড় নিমন্ত্রণে সপ্তাহ খানেকের জন্য সেদেশে যেতে হয়েছিল। দেশটার প্রায় একমাথা থেকে আরেক মাথা যখন ঝোড়োসফরে ঘুরে দেশে ফেরার আর দুদিন বাকি, রাজধানী সোফিয়ায় সে-দেশের সরকারি-বেসরকারি পর্যটন কর্তাদের সঙ্গে আলোচনাচক্র ও পারস্পরিক ভাবনাবিনিময়ের ঠিক আগের দিন রাত দুটোয় ভূমিকম্পের অভূতপূর্ব ঝটকা খেলাম। আমি ছিলাম হোটেলের বাইশ তলার ঘরে, ঘুমে মগ্ন, হঠাৎ বিকট ধানী পটকার শব্দের সঙ্গে কাঠের দেওয়ালে শত শত বাঁশ পেটানোর আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল বিশালকায় একদল দৈত্য প্রচণ্ড রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে পুরো বাড়িটা ধরে প্রবল ঝাঁকাচ্ছে। তখনকার অবস্থা কল্পনা করে এখন এই বর্ণনা লিখছি না, তখন ঠিক এই কালান্তক দৈত্যের ক্রুদ্ধ ঝাঁকানির অনুভূতিটাই আমার মনকে আতঙ্কে অবশ করে দিয়েছিল।

প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পেরে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখি করিডোর দিয়ে ভিড় করে ফ্লোরের আবাসিকরা হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়োচ্ছে। আমাকে দরজায় দাঁড়ানো দেখে অনেকেই তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। কেউ কেউ হাতের ইশারায় আসতে বলেই দ্রুত সিঁড়িমুখী হলেন। অঙ্কে আমি আবাল্য কাঁচা, কিন্তু এখন নিমেষে কষে ফেললাম সবাই মিলে একসঙ্গে সিঁড়িতে পা রাখার জায়গা পাবে না, ফলে আতঙ্কিত হয়ে সবাই আগে নামতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কিতেই হত বা আহত হতে পারে। তাছাড়া নীচে নামলেই যে নিশ্চিন্ত, নীচই নিরাপদ তারও কী নিশ্চয়তা? আমি তাই ঘরে বসে শান্ত হয়ে বাড়ি ও অফিসের দুয়েকজনকে জরুরি এস এম এস করতে লাগলাম। ভূমিকম্প থেমে গিয়ে একটু পরেই আবার শুরু হল, এবারও মিনিট পনেরোর জন্য থেমে আবার ঝটকা দেয়। পর পর এভাবে চার বার। মোবাইলের টাইপে আঙুল রাখা দায়। যাঁরা নেমে গিয়েছিলেন, শেষ রাতে সবচেয়ে নীচের ফ্লোরে নতুন ঘর নিলেন। শুনলাম পরদিনও তাঁরা ওপরের ফ্লোরে আর উঠলেন না।

সকালে শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল হিলটন-এ চায়ের নেমন্তন্ন। আসল উদ্দেশ্য হোটেলটার অনেক নতুন চালু হওয়া বৈশিষ্ট্য দেখানো।

ধনবানের আরও আরও আরও সুব্যবস্থা ও বিলাসিতার চাহিদা কত দূর যেতে পারে তার আন্দাজ ও আয়োজন করাই বড় হোটেল ব্যবসায়ীর সদা লক্ষ্য। মধ্য-তিরিশের জেনারেল ম্যানেজার সুবন্দোবস্তের নতুন নতুন সংযোজন ঘুরে দেখাতে দেখাতে বললেন, কালকের আর্থকোয়েক রিখটার স্কেলে মাত্রা ৯ দেখে গেস্টদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলে আমি শুতে চলে গেলাম। আমার লোকেদের বলে গেলাম সব উঁচুতলা সম্পূর্ণ নিরাপদ জেনেও যেসব গেস্ট নীচের তলায় যেতে চাইবেন তাঁদের যেন নীচের তলায় শিফট করানো হয়। কেন এত নিশ্চিত ছিলাম জানেন? আমাদের হোটেল ৯ রিখটার স্কেল পর্যন্ত কোয়েক অ্যাবজর্ব করতে পারে। এই বিল্ডিং সেই ভাবেই তৈরি।

এত বড় ভূমিকম্পে সোফিয়া শহরে ক্ষয়ক্ষতির কোনও চিহ্ন চোখে পড়েনি। শুনলাম বুলগেরিয়ার কোনও সীমান্ত অঞ্চলে

ও গ্রিস না ইতালির গির্জায় বা বাজার এলাকায় ভূকম্পের ভাঙন দেখা গেছে।

সিকিমে ভূকম্পবার্ষিকী

দার্জিলিং জেলার তাকদায় এক নির্জন পাহাড়ি গ্রামে একটা নেপালি পরিবারে ২০১১-র সেপ্টেম্বরে আমার ক্ষণবাসে এসে দেখি পাঁচদিন আগে উত্তর সিকিম ও দার্জিলিং জুড়ে যে ভয়াবহ ভূকম্প হয়ে গেছে তারই থাবার দাগ খাবার ঘরের দেওয়ালে তখনও দগদগ করছে। এক বছর পর এই ২০১২-য় এখানে আবার এসেই শুনলাম সেদিনই ২৪ সেপ্টেম্বর মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। গৃহকর্তা মৃদু হেসে বললেন, গত বছরের সেই ভয়ংকর ভূমিকম্পের এ যেন প্রথম বার্ষিকী উদযাপন!

প্রাক-সুনামি সমুদ্রযাত্রা

তবে ভূমিকম্পের প্রলয়ংকর রূপ দেখেছি আন্টার্কটিকা যাবার সমুদ্রপথে, বিনাভূকম্পে, কুখ্যাত ড্রেক প্যাসেজ অতিক্রমের সময়। আড়াই কোটি থেকে দু'কোটি বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টার্কটিকার মধ্যে ওশ্যান যে গ্যাপ বা সমুদ্র-ব্যবধান তৈরি হয়েছিল, সেই বিস্তৃত অঞ্চলে কোনও স্থলভাগ না থাকায় তীব্র আন্টার্কটিক স্রোত আন্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে প্রবাহিত হতে কোথাও কোনও বাধা পায় না। এই সমুদ্র-বেষ্টনীর নামই ড্রেক প্যাসেজ। এই প্যাসেজটি পার হওয়ার সময় আমরা আন্টার্কটিক কনভার্জেন্স অতিক্রম করে আন্টার্কটিকায় প্রবেশ করেছিলাম। ক্যাপ্টেন ড্রেক-এর আবিষ্কৃত এই সমুদ্রপথকে নাকি নাবিকমাত্রই ভয় পায়।

২০০৪ সালের ক্রিসমাস-ইভে আন্দামান-ইন্দোনেশিয়া-থাইল্যান্ড-শ্রীলঙ্কায় যে ভয়াবহ সুনামি হয়ে গেল তার মাসখানেক আগে ড্রেক প্যাসেজে আমাদের জাহাজ বন্ধোন্মাদ ঢেউয়ের প্রলয়নৃত্যের তালে তালে একবার বাঁয়ে হেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ছোঁয়, আর একবার ডাইনে আমাদের চোখ প্রায় অন্ধ করে আকাশে মেঘের মিতালি চায়। পরক্ষণেই উল্টো তালে বাঁদিক আকাশ ছোঁয়, ডানদিক নামে সমুদ্রে। কখনও কখনও সমুদ্রশয্যা ছেড়ে না উঠে ওই অবস্থায়ই স্থির হয়ে থাকে, আমরা আক্ষরিক অর্থে দম বন্ধ করে সেকেন্ড গুনি, জাহাজ আবার সোজা হবে তো! নাকি যেদিকে হেলে আছে সেদিকেই আরও দুয়েক সেন্টিমিটার হেলে গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টে যাবে! যাত্রী বা অভিযাত্রীরা কেউ মাথা তুলতে পারে না। তার ওপর এই মৃত্যুর মহাস্তব্ধতা!

সকাল-দুপুর-রাতের খাবারে কারও রুচি

ড্রেক প্যাসেজে আমাদের জাহাজ বন্ধোন্মাদ ঢেউয়ের প্রলয়নৃত্যের তালে তালে একবার বাঁয়ে হেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ছোঁয়, আর একবার ডাইনে আমাদের চোখ প্রায় অন্ধ করে আকাশে মেঘের মিতালি চায়। কখনও কখনও সমুদ্রশয্যা ছেড়ে না উঠে ওই অবস্থায়ই স্থির হয়ে থাকে, আমরা আক্ষরিক অর্থে দম বন্ধ করে সেকেন্ড গুনি, জাহাজ আবার সোজা হবে তো!

নেই, কেবিনের দরজায় দরজায় পলিথিনের 'সিক ব্যাগ' অর্থাৎ বমি করার পাত্র। আমাদের কেবিনের সব ড্রয়ার মেঝেতে আছড়ে পড়ে একবার এদিক একবার ওদিক গড়াগড়ি খাচ্ছে। ক্যামেরার ক্যাসেট ব্যাটারি চার্জারের হরির লুট চলছে। উঠে দাঁড়াতে গেলেই দেহ টলটলায়মান, মাথা ঘূর্ণায়মান।

এই অবস্থায় দেওয়াল ধরে ধরে এক-পা এক-পা করে জাহাজের পিছনে গিয়ে উদ্দাম সমুদ্রের ছবি তোলার অভিজ্ঞতা বোধহয় কোনওদিন ভুলব না।

বুখারেস্টে ভূমিকম্প

এরকম ভূমিকম্প ছাড়াই বিধ্বস্তকারী একটা অভিজ্ঞতার কথা না বললেই নয়।

একবার বিশিষ্ট সংবাদপত্রনির্মাতা ও ভ্রমণলেখক, আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু প্রতাপকুমার রায়ের সঙ্গে স্পেনের মাদ্রিদ থেকে ট্যুরিস্ট বাসে পর্তুগালের লিসবন ঘুরে শেষমেশ প্যারিস থেকে বিমানে বুখারেস্ট আসছিলাম। বুখারেস্টে আমাদের কোনও কাজ নেই, তবু বুখারেস্ট কেন? না, তখন রোমানিয়ান এয়ারলাইন্স তারোম-এ কলকাতা-বুখারেস্ট যাওয়া-আসার খুব সস্তার একটা টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল। যাবার সময় সেই টিকিটেই বুখারেস্ট হয়ে ইউরোপের যে-কোনও একটা দেশে যাওয়া যায়, আবার ফেরার সময় ইউরোপের যে-কোনও একটা দেশ থেকে বুখারেস্ট হয়ে কলকাতা আসা যায়।

যাবার সময় আমরা মাদ্রিদে চলে গেলাম। আসার সময় প্যারিস থেকে ফিরলাম।

প্যারিস থেকে বুখারেস্টের বিমানে আমাদের সহযাত্রী হলেন এক রোমানীয় তরুণী, প্রথমেই হিন্দিতে কথা বলে আমার সঙ্গীকে মুগ্ধ করে দিলেন। প্রতাপবাবু বসলেন জানলার ধারে। তাঁর পাশে আমার সিট, আমার বাঁদিকের সিটে সেই তরুণী।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর, প্রতাপবাবু আসরে ভঙ্গ দিয়ে যথারীতি মৃদু নাসিকা গর্জন সহকারে নিদ্রান্বিত হলেন। মেয়েটি আমাকে তার ভবিষ্যৎ ভারতযাত্রার কথা, আমাদের বাস পূর্ব ভারতের পশ্চিমবাংলায় শুনে পশ্চিমবাংলাতেই হিন্দিভাষার শিক্ষকতা না গবেষণা করার ইচ্ছার কথা মৃদু ভাষায় বলেই চলল।

একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অগ্রজের মেঘগর্জন তুল্য নাকডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি আমার সহযাত্রিণী আমার কাঁধে মাথাটি রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

আঙুলের সন্তর্পণ টোকায় সংবাদপত্রসেবীর ঘুম ভাঙিয়ে মেয়েটির নিশ্চিন্ত নিদ্রাদৃশ্য ইঙ্গিতে দেখাতেই প্রতাপবাবু বিস্ফারিত চোখে দৃশ্যটি দেখতে লাগলেন, তাঁর দেখার ভঙ্গি দেখে আমি আর বাঁধভাঙা হাসি সামলাতে পারলাম না। সেই হাসির দমকে মেয়েটি আচমকা ঘুম ভেঙে মেঘলা মাঠে মাতৃহারা গোবৎসের মতো ব্যথাতুর চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বুখারেস্টে প্লেন থেকে নামবার সময় সিঁড়ির মুখেই মেয়েটি আমার হাত জড়িয়ে ধরে আমার সঙ্গে প্রায় পা মিলিয়ে পা ফেলতে ফেলতে সিঁড়ির ধাপ দেখবে কী, মুহুর্মুহু আমার মুখে কী দেখে আমি জানি না।

আমাদের ঠিক পিছনে প্রতাপবাবু। প্লেন থেকে তড়বড় করে নামা আমার বহুদিনের অভ্যাস। সেইমতো এবং সংকোচবশে একবার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার পরক্ষণেই সেই হাত মেয়েটির হাতে বাধ্যতামূলক বাঁধা দিয়ে নীচে নেমে প্রবীণ বন্ধু কতটা নামলেন দেখতে গেছি। তিনি মুগ্ধ বা বিস্মিত নয়ন আমাদের ওপর নিবদ্ধ রেখে অসতর্ক পা বাড়াচ্ছেন, সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে নেমে পরের ধাপটির সীমার মধ্যে পা রাখতে না পেরে টাল সামলাতে পারলেন না, উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন সিমেন্টের মেঝের ওপর।

আমরা এখান থেকেই বিমান বদলাব। মেয়েটি যাবে বুখারেস্টে তার বাড়িতে। নীচে নেমেই বিদায় মুহূর্তে আমাকে কিছু বোঝবার

সুযোগ না দিয়ে সে আমাকে আকস্মিক আলিঙ্গনে বেঁধে চুমো খাবেই, ওই অবস্থায় আমি প্রায় ৭৫ বছর বয়সি আমার বন্ধুকে মাটিতে আছড়ে পড়তে দেখলাম। গাল ফেটে রক্তের ধারা গড়াচ্ছে।

আমার দৃষ্টির অনুসরণে মেয়েটি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখেই আমাকে ছেড়ে নিমেষে আমার বন্ধুর কাছে দৌড়ে গিয়ে হাতের মোবাইলে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আনল। সবাই মিলে আহতকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিলাম। মেয়েটি জোর করে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে প্রতাপবাবুর দুই পা কোলে নিয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। পুলিশ এসে প্রতাপবাবুর পাসপোর্ট নিয়ে আমাকে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল।

ভ্রমণে এমন ভূমিকম্পেও আমাকে পড়তে হয়েছে। এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ জনশূন্য। লোকজন বলতে তিন-চারটি কনস্টেবল। টয়লেটে ঢুকে লম্বা লম্বা জুলপিওলা একদল যুবকের দেখা পেলাম। ছ-সাতজন হবে। সকলেই স্বাস্থ্যবান, কেউ কেউ তো ষণ্ডাগণ্ডা চেহারার। সারি সারি বেসিনে ঝুঁকে খুব ঘষে ঘষে হাতমুখ ধুচ্ছে।

দুজন বোধহয় আগেই হাতমুখ ধুয়ে চুলটুল আঁচড়ে ফিটফাট। একজন বড় হাতব্যাগের জিপার খুলে ভেতর থেকে দু'লিটার ব্ল্যাক লেভেল হুইস্কির বিরাট বোতল বের করে দুজনে মিলে খানিকটা করে গলায় ঢেলে বাকি হুইস্কিতে কোকাকোলা ঢালল। সকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বাইরে এসে কোকাকোলা মেশানো সেই হুইস্কি পালা করে পান করতে লাগল।

দুজন কনস্টেবল শ্লথ পায়ে ঘুরতে ঘুরতে তাদের কাছে এসে দাঁড়াতেই একটা লোক বড় ব্যাগটা খুলে একমুঠোয় যতটা উঠল ততগুলো ডলার তুলে দিল। ওরা চলে যেতেই আর দুজন কনস্টেবল এসে একইভাবে ডলার পেল। তারা এক প্যাকেট ডানহিলও নিয়ে ছাড়ল।

আমি যতটা সম্ভব না দেখার ভান করে এইসব দেখছি। এক তো প্রতাপবাবুকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, তার ওপর এদের কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ও করছে। লোকগুলো নিশ্চয়ই ডাকাত, হয়তো ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে এসেছে!

পুলিশের লোক দেখলেই দৌড়ে গিয়ে বন্ধুর কথা সাতকাহন ব্যাখ্যা করে তাঁর কী অবস্থা জানতে চাই। উত্তর সব সময় এক— ইংলিশ? প্রত্যেককেই মুখ দেখে মনে হয় এ-ই তো সে, যে পাসপোর্ট নিয়ে গেছে! তাকে জেরা করি, কড়া কথাও বলি, এদেশের পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলে শাসাই, আমাদের এম্ব্যাসির ভয় দেখাই,

পুলিশের লোক দেখলেই দৌড়ে গিয়ে বন্ধুর কথা সাতকাহন ব্যাখ্যা করে তাঁর কী অবস্থা জানতে চাই। উত্তর সব সময় এক— ইংলিশ? প্রত্যেককেই মুখ দেখে মনে হয় এ-ই তো সে, যে পাসপোর্ট নিয়ে গেছে! তাকে জেরা করি, কড়া কথাও বলি, এদেশের পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলে শাসাই, আমাদের এম্ব্যাসির ভয় দেখাই, সব শুনে সেই এক উত্তর— ইংলিশ?

সব শুনে সেই এক উত্তর— ইংলিশ?

অর্থাৎ ইংরিজি জানা কাউকে চাও তো? দাঁড়াও দেখি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত দশটা বেজে গেল। মাঝে তারোম এয়ারলাইন্সের দুজন মহিলা অফিসার এসে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন আমি যেন বিমানে উঠে যাই, মিঃ রায়কে তাঁরা একটু পরই তুলে দেবেন।

'আমি নিজের চোখে সেটা না দেখে বিমানে উঠবই না' বলাতে আরও একজন এসে আমাকে এবার আরও জোর দিয়ে অনুরোধ-উপরোধ করতে লাগলেন।

ভয়ে আমার মনে তখন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। তবে কি বৃদ্ধের বাঁচার সম্ভাবনা নেই, অথবা তারও পরের অবস্থা?

রাত এগারোটায় দুজন অফিসার আমাকে বিমানের সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত এনে দেখালেন পিছনের সিঁড়ি দিয়ে প্রতাপবাবুকে বিমানে তোলা হচ্ছে, হ্যাঁ, নিজের পায়ে হেঁটেই উঠছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরতে গিয়ে থমকে গেলাম। হাত ব্যান্ডেজে ঢাকা।

একেবারে পিছনের পাশাপাশি সিটে বসে বন্ধু বললেন, এক পাত্র ব্র্যান্ডি পেলে খেয়ে একটা ঘুম লাগালে হয়। আর একটা স্যুপ খেলেই যথেষ্ট।

এয়ারহোস্টেস ছোট গ্লাসে এক পেগ কনিয়াক দিয়ে একটু পরে স্যুপ এনে আমার কাছে কনিয়াকের দাম বাবদ ২ ডলার চাইলেন। ব্র্যান্ডির দাম নিচ্ছে দেখে প্রতাপবাবু অবাক। ব্র্যান্ডি শেষ করে স্যুপ শেষ না করে সেই যে তিনি নাকডাকা শুরু করলেন, কলকাতায় পৌঁছবার আগে তা আর থামল না। বিমানবন্দরে নাকে গালে হাতে কপালে মুহুর্মুহু ব্যান্ডেজ দেখে মিসেস রায় মৃদু হেসে বললেন, তীরে এসে তরী ডোবালে?

মহেঞ্জোদাড়োয় মহাকম্প

আন্টার্কটিকা থেকে ফিরে পরের বছর পাকিস্তানে যাবার তোড়জোড় করছি। একদিকে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো, আরেকদিকে হিংলাজ মন্দিরে যাবার বন্দোবস্ত পাকা করে দিনের নানা কাজের মাঝে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি, এমন সময় এক ভূমিকম্পেই সব ধূলিসাৎ। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর সহ পাকিস্তানের নানা জায়গায় সেবারের প্রবল ভূমিকম্পের পরই পাকিস্তান সরকারের পর্যটন কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন, দেশের এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাধ্য হয়ে সবরকম পর্যটন ব্যবস্থাই বাতিল করা হল।

সিরিয়ায় দুঃস্বপ্ন

ভূমিকম্প কি শুধু ভুঁয়েই হয়? ভূগর্ভেই তার বাসা? ভূমিকম্প হয় সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়।

সিরিয়ার দামাস্কাস অঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দীর এক অট্টালিকায় সেই সময়ের পাতলা ইটে গাঁথা দেওয়াল আর প্রাচীন পাথরে মোড়া মেঝেয় মুগ্ধ রোমাঞ্চিত আমি মরুপথে পালমিরা ঘুরে ফেরার সময় ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরমেও মরুভূমিতে বেদুইনদের তাঁবু দেখে তাদের সঙ্গে মিশে যাই। তারা আমাকে তাদের নাচ দেখায়, গান শোনায়। তাদের হৃদস্পর্শে আমার মনে ঘোর লেগে যায়। তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছি যে দেশে ফেরার পর বছর না ঘুরতেই সিরিয়ায় আগুন জ্বলে উঠবে? এও তো এক ধরণের ভূমিকম্প— মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি স্নেহ-ভালোবাসা বিধ্বংসী, আয়ুনাশী, অস্তিত্ববিনাশী গোলাবারুদ নিক্ষেপের অবাধ অধিকারে যার জন্ম!

সুমাত্রার দুঃসংবাদ

এরই কয়েক বছর আগে ভূকম্পপ্রবণ ইন্দোনেশিয়ার বালি, লম্বক, জাভা, সুমাত্রায় ঘোরার লেখা ও ছবি নিয়ে কলকাতায় ফিরেই পেলাম সুমাত্রায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের

হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদ। এ হল ভ্রমণে ভূমিকম্পের রকমফের।

ইন্টারলাকেনের পুলিশ ফাঁড়িতে

নরওয়ের সর্বোত্তরে, পৃথিবীর উত্তরতম শহর হ্যামারফেস্টেরও উত্তরে, ৭১°১২′ ২৫″ অক্ষাংশে নর্থ কেপ থেকে কলকাতায় ফিরে দেখি ইউরেল পাস তখনও কিছুটা অব্যবহৃত, তার ওপর ভারত থেকে ইউরোপের যে-কোনও দেশে লুফৎহানসা বা লুপ্তহংসে যাওয়া-আসার ফ্রি টিকিট পাওনা হয়ে আছে। অতএব ব্যাগ-বাক্স না-খুলেই আবার বেরিয়ে পড়লাম। সেযাত্রায় সম্পূর্ণ একাহাতে, প্রতি মুহূর্তের অতৃপ্তি নিয়ে সুইজারল্যান্ড ক্যাসেটবন্দি করা হল, রেলপাসের সুযোগে একবেলার ল্যুভরসহ একপলকের প্যারিস ও একসঙ্গে মিউনিখে ডিনার-রেস্তোরাঁয় অভুক্ত ডিনারের মূল্যে বাভারিয়ান লোকনৃত্য ক্যামেরায় ছোঁ মেরে নিয়ে কলকাতায় ফিরে কপাল চাপড়াবার দশা। ট্রাইপড নেই, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের মতোও কেউ সঙ্গে নেই, আঁকাবাঁকা কাঁপা-কাঁপা এ কী সুইজারল্যান্ড? কথায় বলে, সস্তার তিন অবস্থা, তাহলে বিনামূল্যের কয় অবস্থা? এই ক্ষোভই অদূর ভবিষ্যতে এক ভূমিকম্পের দ্বারদেশে পৌঁছে দেবে কে জানত!

এর পাঁচ বছর পর সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড় নিয়ে ছবি তৈরির চেষ্টায় পাহাড়শোভিত দেশটার পাঁচপ্রান্ত পরিক্রমা শুরু করি পার্বত্যগ্রাম জারমটের গরনেগ্রাট দিয়ে। জারমট ছোট্ট জায়গা, পায়ে হেঁটে দেখাই শ্রেষ্ঠ দর্শন। তাছাড়া ইউরো বাঁচানোও দরকার, কেন না সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য জায়গা এভাবে পায়ে হেঁটে পারাপার করা যাবে না, ফলে ব্যয়বহুল গাড়ি ছাড়া গতি নেই। বিদেশে এখনও হোটেল ছাড়া আর কোথাও আমি ক্রেডিট কার্ড দিতে সাহস পাই না, গাড়ির ড্রাইভারকে তো নয়ই।

এদিকে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে জারমটে যখন-তখন বৃষ্টি, রাস্তায় ঘুরে ছবি তোলা কঠিন, বৃষ্টিতে ভিজে শীতের কামড়ও ভালোমতোই টের পাচ্ছি। অগত্যা নগদ ইউরো খসিয়ে একটা ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট কিনতে হল। নিজের মাথা ছাড়াও ক্যামেরার লেন্স বাঁচানোও দরকার।

টাকা-আনা-পাইয়ের এইসব তুচ্ছ তথ্য দিনকয়েক পরের ঘটনায় বড় হয়ে দেখা দেবে, শুধু সেই কারণেই উল্লেখ করতে হল।

জারমটপর্ব মিটিয়ে পিজ নায়ার-এর ছবি তুলে চলে এসেছি ইন্টারলাকেন। ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় ইয়ুংফ্রাও-এ খুব দ্রুত অর্ধবৃত্তাকার প্যান করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে

> ধর্মের বিরুদ্ধে অধর্ম, শুভের বিরুদ্ধে অশুভ, সুন্দরের বিরুদ্ধে অসুন্দর, সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের এই এত আস্ফালন— এও তো সেই বিশ্বসংসারের ভারসাম্যের বিরুদ্ধে ভূমিকম্পেরই তর্জনগর্জন।

পড়লাম কঠিন বরফের বুকে। ডানহাতের ক্যামেরা বাঁচাতে বাঁ হাঁটুর ওপর পতনভার রাখতে গিয়ে হাঁটু ভাঙবার জোগাড়, রাতে ফুলে ঢোল।

পরদিন লুসার্ন লেক যাব বলে সাতসকালে ইন্টারলাকেন ইস্ট স্টেশনে বসে আছি। একটু পরেই ট্রেন এল, প্রায় শূন্য প্ল্যাটফর্মে ফার্স্ট ক্লাস কামরার দরজার সামনে এক ভদ্রলোক, আমাদের এগোতে দেখে ট্রেনে উঠে সাহায্যের হাত বাড়ালেন। আমিও হাতের ভারী ব্যাগটা ওঁকে ধরতে দিলাম। রোজ অফিসে ভিডিও কনফারেন্সের জন্য ইয়ারফোন সহ ল্যাপটপ আমার অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই হাতব্যাগেই বয়ে বেড়াচ্ছি। পাসপোর্ট, ইউরো, হোমিওপ্যাথিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ, নতুন কেনা জ্যাকেট— স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি, ক্যাসেট, লেখার কাগজপত্র, ট্রেনে ক্ষুন্নিবৃত্তির আপেল বিস্কুট ইত্যাদি সবই হাতের কাছে থাকলে কাজের সুবিধে, তাই সবই হাতব্যাগে।

কামরায় অন্য কোনও যাত্রী নেই, কিন্তু আমার ব্যাগসহ সে-লোক কোথায়? ব্যাগসহ ভ্যানিশ! এদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে কালক্ষেপ না করে ওদিকের দরজা দিয়ে নেমে গেছে।

ট্রেন থেকে নেমে গার্ডের নিস্পৃহ পরামর্শে সহযাত্রিণী তথা সহকারিণীকে বড় সুটকেসের দায় নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে রেখে রেললাইন পার হয়ে, রাস্তা পার হয়ে একটা আপাদমস্তক বন্ধ ও নিঃশব্দ ত্রিতল গৃহের ততোধিক বন্ধ দরজায় বোতাম টিপে ও-প্রান্তের আওয়াজ শুনে অবিলম্বে পুলিশ পাঠাতে বলে উত্তর পেলাম, 'আমরা এখান থেকে তিন স্টেশন দূরে মধ্যাহ্নভোজ সারছি, আপনি অনুগ্রহ করে ওখানেই অপেক্ষা করুন।'

'এক্ষুনি পুলিশ এলে চোরকে ধরা যাবে। চোর পালালে তখন পুলিশ এসে আর কী করবে!'

'বেশ, আপনি দরজার সামনেই অপেক্ষা করুন। আপনার নিয়ারেস্ট পেট্রলিং পুলিশের গাড়িকে বলে দিচ্ছি, আশা করি এখনই পৌঁছে যাবে।'

তখন সব গাড়িকেই দূর থেকে মনে হয় পুলিশের গাড়ি। শেষপর্যন্ত পুলিশ এসে দরজা খুলে আমাকে তেতলায় নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে আমার কাছে সংক্ষেপে সব কথা শুনে প্রথম প্রশ্ন ভাসিয়ে দিল— একটা অচেনা লোককে আপনার ব্যাগটা দিয়ে দিলেন?

'একজন সুইস অন্যের জিনিস নিয়ে পালাবে আমার এখনও বিশ্বাস হয় না।'

'এ লোক সুইস হতেই পারে না। হয় পূর্ব ইউরোপীয় দেশের, না হয় রাশিয়ার।'

তারপর শুরু হল তার হাজারো প্রশ্ন। লোকটার মুখের গড়ন লম্বা, না গোল, না ডিম্বাকৃতি, চুল কটা, না কালো, লনছাঁট, না কানঢাকা, কথা বলার ভঙ্গি ঝোঁক-প্রবণ, না শান্ত-সরল, কথার সঙ্গে হাতের নাড়াচাড়া অস্থির, উঁচুনিচু, না সরলরৈখিক, গলার আওয়াজ মৃদু, না ভারী, নাক খড়্গাকৃতি, না ন্যাসপাতি-গড়ন, চোখ চঞ্চল, না তীক্ষ্ণ— সব প্রশ্নের উত্তর যতদূর মনে পড়ল বললাম। দ্রুত কম্পিউটারে আঙুল চালাতে চালাতে পুলিশ ভদ্রলোক তাঁর মতে প্রাসঙ্গিক এমন আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে, ব্যাগের রং, আকার, উপকরণ, মধ্যস্থ জিনিসপত্রের পই পই তালিকা রচনান্তে টাইপের খটখটি শেষ করে বললেন, 'এ তো রাশিয়ান! এই এক নতুন উৎপাত হয়েছে।'

কানে-কপালে ভিজে হাত ছোঁয়াতে টয়লেটে গিয়ে রেডক্রস-নির্ধারিত হাত ধোওয়ার সচিত্র নির্দেশিকা মন দিয়ে পড়ে হাত ধোওয়ারও অনেক নতুন নিয়ম শিখলাম। তাহলে কি অন্য অনেক কিছুর মতোই আদর্শ হাত ধোওয়াও জীবনে এই প্রথম ঘটল? একটা কথা জানা হল না, রেডক্রসের নির্দেশনামা মেনে এইরকম হাত ধোওয়া কি যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের স্থানান্তকরণ বা সেবাযত্নের পরই শুধুই প্রয়োজনীয়, নাকি এ রোজকার স্বাস্থ্যনীতি?

'ব্যাগের কী হবে?'

শেষপর্যন্ত লুসার্ন লেকের হোটেলের আগামী ক'দিনের ঠিকানা পুলিশের কাছে রেখে উদ্বেগ গোপন করে বলি, 'সুইস পুলিশের সুখ্যাতি শুনেছি। এবার হাতে হাতে তার প্রমাণ পাব নিশ্চয়ই?'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর। উই উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু ক্যাচ হিম অ্যান্ড সেন্ড ব্যাক ইওর

ব্যাগ টু ইওর লুসার্ন হোটেল।'

কলকাতা থেকে দুজনের পাসপোর্টের স্ক্যান্ড কপি পুলিশের ই-মেলে আনিয়ে দিয়ে মনে আশা বুকে বল নিয়ে নেমে আসছি, সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে পুলিশ অফিসার এবার যা বললেন তাতে বুকে হুবহু ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি টের পেলাম। বললেন, 'প্লিজ ডোন্ট এক্সপেক্ট ট্যু মাচ ফ্রম আস। বামাল চোর ধরা পড়বে আশা না করাই ভালো।'

দুটো সেকেন্ড ক্লাস টিকিট কেটে দিনের শেষ ট্রেনে লেক-লুসার্ন পৌঁছলাম। তারপর সুপারমার্কেট থেকে সস্তায় কোনওদিন স্যালাড, কোনওদিন স্যান্ডউইচ, কোনওদিন বার্গার কিনে হোটেলের বিরাট রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে ঘরে এসে ডিনার সেরে কীভাবে এই একই পদ্ধতির অনুসরণে বাকি সব জায়গার ছবি তুলে সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড় পরিক্রমা শেষ করেছি, সেই মামুলি ঘটনাবলির বর্ণনা বাহুল্যবোধে বর্জন করলাম।

ভ্রমণে এমন ছোট বড় মাঝারি ভূমিকম্পের ঘটনা আমাদের নিত্যসঙ্গী। 'ভ্রমণ'-এর জন্মই তো এক ভূমিকম্পের বিবরণ নিয়ে। ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম সংখ্যা প্রকাশেরও আগে ১৯৯২-এর আগস্টে নমুনা সংখ্যার 'ভ্রমণ'-এ উত্তরকাশীর বিধ্বংসী ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিলেন যশস্বী অভিনয়শিল্পী দেবশ্রী রায়। বিরাট সেই ভূমিকম্পের নিতান্ত ঘরোয়া ও নিখুঁত বাস্তব ছবি তাঁরই মুখের ভাষায় ছাপা হয়েছিল:

রাত তখন তিনটে হবে। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অনুভব করছিলাম, আমি যেন খাটের ওপর দুলছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মা-দিদি-দাদা সবাই জেগে উঠল। আর চারিদিক থেকে কেমন যেন গুরু গুরু শব্দ। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাথরের বড় বড় চাঁই। আর তারই সঙ্গে তারস্বরে আমার দিদি (পূর্ণিমা) বলে চলেছে, আর্থকোয়েক। ভাইপো চেঁচাচ্ছে ভূত-ভূত বলে। আমরাও ইষ্ট-নাম জপতে শুরু করেছি ততক্ষণে। ঠাকুরের নাম করতে-করতে সবাই তখন দ্রুত খোলা-আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। পরে শুনেছি, কয়েক সেকেন্ডের সেই ভূমিকম্প নাকি উত্তরকাশীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে দিয়েছিল। গিয়েছিল কত প্রাণ। এই অবস্থাতেই চলে গেল আলো। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যে দেরাদুনের পাহাড়ের গায়ের ছোট-ছোট আলোগুলিকে দেখে আমি একসময়ে গান গেয়ে উঠেছিলাম, প্রলয়ের পর সেই দেরাদুনকে দেখে আমার রীতিমতো কান্না পেয়ে গিয়েছিল।

এরই মাত্র মাসকয়েক পর, ভারতের আরও বড় এক ভূমিকম্পে, পূর্বঘোষণা সত্ত্বেও সেবছরের ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'ভ্রমণ' প্রকাশের ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যাবে সেটা আগে কেউ জানত না। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের সেই অযোধ্যাকাণ্ডের জেরে লঙ্কাকাণ্ডের আগুনের আঁচ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ায় 'ভ্রমণ'-এর নিয়মিত যাত্রা পরের বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। ধর্মের জন্য এত বড় অধর্ম ইতিহাসে একেবারে বেনজির নয় জেনেও ঠিক সময়ে 'ভ্রমণ' শুরু না হওয়ায় আমরা সেদিন মনে মনে উদ্বেগ ও যন্ত্রণা বোধ করেছি।

'ভ্রমণ'-এর যাত্রাপথে বহু দেশ-কাল পেরিয়ে এসে এখন মনে হয় ধর্মের বিরুদ্ধে অধর্ম, শুভের বিরুদ্ধে অশুভ, সুন্দরের বিরুদ্ধে অসুন্দর, সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের এই এত আস্ফালন— এও তো সেই বিশ্বসংসারের ভারসাম্যের বিরুদ্ধে ভূমিকম্পেরই তর্জনগর্জন।

জন্মমুহূর্তেই 'ভ্রমণ'-এর ভাগ্যলিপিতে ভূমিকম্প লেখা হয়ে গেছে, দু-দশক পার হয়েও কোনও না কোনও রূপে তার ঝাপটা এসে লাগছে। এরপর না-মেনে আর উপায় কী যে ভূমিকম্প 'ভ্রমণ'-এর নিত্যসঙ্গী! তাই ভূমিকম্পকে পাথেয় করেই 'ভ্রমণ'-এর পথচলা। পথচলা সেই দিনের অভিমুখে যখন 'ভ্রমণ'-ই চারপাশের মিথ্যাচার, দুরাচার, অত্যাচার ছাপিয়ে— ন্যায়-নীতি-সত্য-মনুষ্যত্ব-মাড়িয়ে-চলা স্বার্থান্ধ, দম্ভান্ধ, লোভান্ধ মানুষের আকাশচুম্বী উচ্চাশা ফাটিয়ে বিরাট একটা শুভ ও সুন্দরের বিস্ফোরণ ঘটাবে। দেশ যখন দুর্নীতির দ্বারা দীর্ণ, প্রকৃতি যখন দুঃশীলের হাতে পীড়িত, মানুষ যখন অমানুষের অস্ত্রমুখে আক্রান্ত তখন মানুষের শুভ চেতনার বিস্ফোরণই অশুভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অমোঘ অস্ত্র! 'ভ্রমণ' তো সেই সুন্দরের সন্ধান, শুভের সাধনা, পৃথিবীর সব সুরূপের আরাধনা।

প্রথম প্রকাশ: ভ্রমণ, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১২

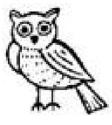

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

মূল স্প্যানিশ থেকে
বাংলায়

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পর্ব ১

হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি

জাহাজঘাটা

অনুবাদ : তরুণ ঘটক

সান্তা মারিয়া-১

লারসেনকে (শব পারিষদ) গভর্নর পাঁচ বছর আগে স্বদেশ থেকে বিতাড়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কেউ একজন ঠাট্টাচ্ছলে কিংবা আন্দাজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, সে ফিরে আসবে। সেই সময় একশো দিনের রাজত্ব নিয়ে খুব উত্তেজক আলোচনা চলছিল।

যদিও আমাদের নগরজীবনের বৃত্তান্ত থেকে সেই ঘটনা প্রায় মুছে গিয়েছে। অল্প ক'জনের মনে ছিল সেসব দিনের কথা এবং লারসেন নিজেও ভুলে গিয়েছিল। পরাজয় আর পুলিশ-প্রহরায় অবসন্ন, ক্লান্ত এক মানুষ, আমাদের মধ্যে ফিরে আসার সামান্য আশাও তার ছিল না।

যাই হোক, পাঁচ বছর পর এক সকালে লারসেন বাসস্ট্যান্ডে নামল। বাস এসেছিল কোলন থেকে। মেঝেতে লাগেজ রেখে শরীরটাকে টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল। সিল্কের জামার কবজি পর্যন্ত সেই টান পৌঁছল। বৃষ্টি হচ্ছিল, বৃষ্টিপাত থামলে লারসেন সান্তা মারিয়ার দিকে পা বাড়াল। ধীরস্থির, টাল সামলে হাঁটতে শুরু করল। বোধহয় সে আরও মোটা এবং বেঁটে হয়েছে। আপাতভাবে মনে হচ্ছে সে এখন অনেকটাই শান্ত।

বের্না হোটেলে এসে ক্ষুধাবর্ধক পান করল। মালিকের সঙ্গে চোখাচুখি হল। দু'জন দু'জনকে চিনে ফেলেছে মনে হল, কিন্তু কথা হল না। দুপুরের খাওয়াটা সেই হোটেলেই সেরে নিল একা। চারপাশে অবশ্য ট্রাক ড্রাইভারদের ময়লা জামা ঝুলছে (এখন রেলে রোসারিও এবং উত্তরের বন্দর পর্যন্ত মাল পাঠানো নিয়ে তর্ক করছে গাঁট্টাগোট্টা, কুড়ি-বাইশের যুবক, মনে হচ্ছে ওইরকমই জন্মেছে ওরা। অতীত বলে ওদের কিছু নেই। কিছুদিন আগে উদ্বোধন করা মাকদামের রাস্তার সামনে ওরা)। দরজার কাছে একটা টেবিলে বসে লারসেন শেষ পাতের গরম কফিতে চুমুক দেবে তারিয়ে তারিয়ে।

শরতের শেষে এক দুপুরে নাকি অনেকেই ওকে দেখেছে। কেউ কেউ জোর গলায় বলেছে, ওর মুখেচোখে পুনর্জীবিত হওয়ার ভঙ্গি, ক্যারিকেচার মনে হতে পারে। আসলে তার চেহারায় ফুটে উঠেছে পাঁচ বছর আগের অবসাদ, পরিহাস আর ঘৃণা। মানুষ বেশ মনে করতে পারছে যে তাকে চিনে ফেলায় সে বেশ খুশি। তার আঙুলের ভাঁজে ভাঁজে উদ্বেগ, কোনও অভ্যর্থনার আভাস পেলেই নেচে উঠবে মন। ছায়ার পাখায় উঠে পড়বে। কোনও চোখের চাহনিতে স্বীকৃতি পেলেই ওর মন হাওয়ায় হাওয়ায় ছুটবে, মাদকতা ফিরে আসবে শিরায় শিরায়। উল্টোভাবে দেখলে অন্য চিত্র। তার চোখেমুখে উদাস উদ্ধত ভাব, টেবিলে বসে আছে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, আর্তিগাস অ্যাভেনিয়ুর ধোঁয়ার সমান্তরাল এক স্থান, যারা আসছে তাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে, অচেনা মানুষের স্মিত হাসিমাখা মুখগুলো গুনছে, ওর অনুভব অকৃত্রিম, সংবেদনে সহানুভূতি। ওই লোকগুলোর মুখের ভাঁজে নিরুত্তাপ, নিরাবেগ রেখা।

খাওয়ার বিল মিটিয়ে দিল। চিরকালের অভ্যাসমতো বাড়তি বকশিস, বের্না হোটেলের দোতলায় একটি ঘর পুনর্দখল করল। দিবানিদ্রার পর লাগেজমুক্ত হয়ে তার বেশ ফুরফুরে লাগছে। ঘুরতে বেরোল সেই সান্তা মারিয়া, নিঃশব্দে যত দেখে, তত মন ভারী হতে থাকে। সে এখন কৌতূহলবিহীন এক বিদেশিমাত্র। দরজা, জানলা থেকে মানুষের মুখ সবই সে দেখছে চেনা চোখে। বাণিজ্যকেন্দ্রের যা দেখার সবই দেখছে। অঙ্কের মতো এ থেকে বি, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ কিছুই তার নজর এড়াল না। আগেকার পায়ের ছাপে পা না দিয়ে সে ঘুরল। নতুন রং করা পুরনো চার্চের রেলিংয়ের সামনেটা চক্কর মেরে এল। সেই ওষুধের দোকান, বার্থে নামের লোকই মালিক এখনও। খুব ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। এমনভাবে আগে হাঁটেনি কখনও। তা বলে চলনটার বদল হয়নি। তবে আগের চেয়ে অধিকতর সতর্ক হাঁটা। সাবান আর টুথপেস্ট কিনতে হবে। হঠাৎ-দেখা বন্ধুর ফটোর মতো চোখ পড়ল একটা পোস্টারে— 'ঔষধবিক্রেতা ১৭ তারিখ পর্যন্ত আসিবেন না।'

এবার আরও দূরে যাবে। নামতে শুরু

করল। শরীরটার টাল সামলে নিল। তিন-চারটে মোড় পার হয়ে কলোনির রাস্তায় এসে গেল। অবহেলায় পড়ে-থাকা সমুদ্রতটের পথে, নির্জনতা পেরিয়ে আকাশনীল ব্যালকনিসমৃদ্ধ বাড়িটা, এখন ভাড়া থাকে দাঁতের ডাক্তার মোরেনতোস। রেদোন্দো মিলের কাছে তাকে দেখা যায় অনেক পরে। কাদায় জুতো ডুবে যায়। একটা গাছে হেলান দিয়ে ধূমপান করে। মানতেরো নামে দুধের দোকানের দরজায় ধাক্কা দেয়। রুটি আর দুধ কেনে, ও কারও কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। তার অবস্থান নিয়ে নানা মানুষ নানা কথা বলেছে ('ওকে আরও বৃদ্ধ, আরও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। লড়াই শুরু করার মতলব ছিল ওর। দাম দেওয়ার ক্ষমতা আছে বোঝাবার জন্য টাকা দেখাচ্ছিল। আমরা বুঝি ভয় পেয়েছিলাম ওর দাম দেওয়ার ক্ষমতা নেই'), কলোনিতে ঢুকে সম্ভবত রাস্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আবার তাকে দেখা যায় সন্ধে সাড়ে সাতটার সময়। প্লাজার নতুন বারটার কাউন্টারে। সান্তা মারিয়ায় থাকার সময় এটা তার দেখা হয়নি। রাত পর্যন্ত ওখানেই ঘোরাঘুরি করল। বের্না হোটেলে দুপুরবেলা মনের মধ্যে কতই না দোলাচল ছিল, ফার্স নাটকের দৃশ্যাবলির মতো।

বারম্যানের সঙ্গে ভালো ভালো কত কথা। ওর পাঁচ বছরের অনুপস্থিতি, ককটেল বানাবার নানা ফর্মুলা, বরফকুচির সাইজ, ঠিকমতো নাড়াবার চামচের মাপ ইত্যাদি। বোধহয় মার্কোস এবং অন্যান্য বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ডাক্তার দিয়াস গ্রেইকে দেখেও অভিবাদন করার ইচ্ছে হয়নি তার। পরের বিলটার টাকা দিয়ে দিল। বকশিসটা রেখে দিল কাউন্টারে। স্থির পদক্ষেপে নীচে হাঁটা। আগের চেনা রাস্তায় দেহের টাল সামলে যেন সুতো ধরে হেঁটে যায়। দিকনির্ণয়ে ভুল নেই। তার চোখে একটা সত্য উদভাসিত হল যে তার জুতোর শব্দ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্যদের কাছে হয়তো এটা বেয়াদবি বা সারল্য।

হোটেল থেকে বেরিয়ে প্লাজা পার হয়ে বের্নার দিকে এগোলো। নিভৃত ঘরে ঘুমোবে আয়েশ করে। তার ফিরে আসার পনেরো দিনের মধ্যে শহরের কোনও লোক ওকে ঠিক দেখেছে কিনা মনে করতে পারেনি। তারপর এক রবিবার সকালে ওকে আমরা দেখলাম চার্চের প্রবেশপথে। এগারোটার সমবেত প্রার্থনা শেষ হয়েছে। বেশ চালাকচতুর ভঙ্গি— বৃদ্ধ, মুখে পাউডার, বুকের কাছে ধরে আছে বিবর্ণ ফুলের তোড়া। আমরা দেখতে পেলাম হেরেমিয়াস পেত্রুসের মেয়েকে। অবিবাহিতা, বাবার একমাত্র সন্তান, নির্বোধ, লারসেনের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কুঁজওয়ালা, রাগী, অথর্ব বাবাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ফুল দেখে স্মিত হাসি। ভয়ে, বিস্ময়ে নিস্পন্দ চোখের পাতা, মেঝের দিকে ঝুঁকে-পড়া হাবভাব, আরও একটা পদক্ষেপ, ঝোলা মুখ, অস্থির চোখ, দৃষ্টি অস্বচ্ছ।

টীকা:

১। লেখকের বিখ্যাত উপন্যাসের শিরোনাম 'শব-পারিষদ' (Juntacada veres) যার নায়ক লারসেন।

২। ওই উপন্যাসে বেশ্যালয়ের একশো দিনের গল্প।

'জাহাজঘাটা' ও হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি

উরুগোয়াইয়ের এক মহান লেখক হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির জন্মসাল ১৯০৯, কিন্তু চল্লিশের দশকে সাহিত্যে এক ঝড় নিয়ে এলেন তিনি। ইউরোপ ও আমেরিকার মহান সাহিত্যকর্মের পাশে মর্যাদার আসন করে নিল লাতিন আমেরিকার সাহিত্য। ওনেত্তি সৃষ্টি করলেন আধুনিক রূপকথার এক জগৎ, এক কাল্পনিক স্থান, 'সান্তা মারিয়া' যেমন হুয়ান রুলফোর 'কোমালা' গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর 'মাকোন্দো'। 'সান্তা মারিয়া'-র পটভূমিতে রচিত হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির কাহিনিগুলির নায়ক লারসেন।

'জাহাজঘাটা' উপন্যাসে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর লারসেন ফিরে আসে। শুরু হয় নতুনভাবে বাঁচার লড়াই। কাল্পনিক জগতের আধুনিক আখ্যান এক মহাকাব্যের আদল পায়। লারসেনের নৈতিকতা, প্রেমের প্রত্যাশা, অস্তিত্বের লড়াই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব আজকের যুগেও সমান প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর 'নিঃসঙ্গতার শতবর্ষ' যেমন মাকন্দোর সৃষ্টি ও ধ্বংসের রূপকথা সৃষ্টি করে তেমনি 'জাহাজঘাটায়' সান্তামারিয়াকেন্দ্রিক লারসেন রূপকের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়।

ভাগ্যহীন নায়ক ঠাট্টার পাত্র হয়ে ওঠে, পৃথিবীর কাছে জোটে শুধু বঞ্চনা, জীবন তার সঙ্গে প্রতারণা করে, দেহেমনে সে অশক্ত হয়ে পড়ে, বয়স তো থেমে থাকে না, শুভ আকাঙ্ক্ষা খুব দ্রুত শেষ হয়। জীবন চলে নিজের নিয়মে, লারসেন শেষ হয়ে যায়। মৃত্যু তাকে কাছে টানে। সমাধিগহ্বরে সে স্থান পায়। মাটি তাকে আবৃত করে। বিস্মৃতি তাকে গ্রাস করে। গতকালের জীবন্ত মানুষটা আজ ধুলোয় পরিণত হয়েছে, আগামীকাল সে মুছে যাবে স্মৃতি থেকে।

আমাদের জীবনের অনেক আশা শুধু মরীচিকা, বঞ্চনা। এর সত্য কারণ, সমাজ যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়, সত্যের গলা টিপে ধরে। এই উপলব্ধি থেকে লারসেনের জীবনসংগ্রাম হাস্যকর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত স্বীকার করতেই হবে যে, এই মাটির পৃথিবীতে কোনও কিছুই নিজস্ব জায়গায় থাকে না। পৃথিবী নিজেও বদলে যেতে থাকে। ওনেত্তির সৃষ্ট পরিমণ্ডলে লারসেনদের জীবনপরিক্রমা এক গোলকধাঁধায় শেষ হয়ে যায়।

হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির নায়কের পরিণত-মনস্কতায় সারল্য নেই। মৃত্যুই তার ভবিতব্য। সর্বত্র সে তাড়া করে ফেরে। লারসেনের ভিতর ওনেত্তি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন তা নরকতুল্য। ঈশ্বর সেখানে স্বর্গচ্যুত।

'জাহাজঘাটা' উপন্যাসের অধ্যায়গুলির শিরোনাম, 'সান্তা মারিয়া-১' থেকে শুরু করে 'কুটির-৭' পর্যন্ত লারসেনের জীবনের ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী হয়ে থাকে শুধু। প্রথমে যে সান্তা মারিয়াকে অভিশপ্ত শহর মনে হয়, যেখান থেকে পাঁচ বছর আগে লারসেন বিতাড়িত হয়েছিল, সেই শহরেই ফিরে আসে সে, সামাজিক ও পেশাগত অবস্থানে স্থিত হওয়ার চেষ্টা করে সে। কিন্তু সেই শহর তার সমস্ত কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধিস্থল হয়ে ওঠে।

'জাহাজঘাটা' এবং 'গ্রীষ্মাবাস' যথাক্রমে দু'টি প্রহসনের কেন্দ্রবিন্দু— কর্মপ্রচেষ্টা এবং প্রেমের আশ্রয়। বিধ্বস্ত জাহাজঘাটা পুনরুদ্ধারে লারসেন সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিটি খুঁটিগিটি লক্ষ্য করে, সবকিছু পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়। এ যেন তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বন।

'গ্রীষ্মাবাস' দ্বিতীয় প্রহসনের পটভূমি। নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর প্রেমিকার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের স্থান। মালিকের কন্যা আনহেলিকা ইনেসের প্রতি লারসেনের প্রেম প্রবঞ্চক। বাড়ির পরিচারিকা হোসেফিনার ইঙ্গিতে সে বুঝিয়ে দেয় যে লারসেন যা ভাবছে তা অধরাই থেকে যাবে। 'জাহাজঘাটা'-র বিপরীতে 'কুটির' যেমন প্রেমিকার জায়গায় পরিচারিকা।

'কুটির'-এ লারসেনের আশ্রয় তার পতনের পূর্বাভাস। গালভেসের স্ত্রীর নিঃসঙ্গ সন্তান-প্রসব তার চূড়ান্ত ব্যর্থতাবোধ ত্বরান্বিত করে, সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায়। জীবনের ভয় তাকে গ্রাস করে। পলায়নি মনোভাবের শিকার লারসেন সব চেষ্টা পরিত্যাগ করে। কোনও আশা আর তার অবশিষ্ট থাকে না। সে পতনের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে।

উরুগোয়াইয়ের আর-এক বিশ্বখ্যাত কথাসাহিত্যিক মারিও বেনেদেত্তির মতে ওনেত্তির চরিত্রসমূহ অমোঘ ভবিতব্যের শিকার— নিজের প্রবৃত্তিগত তাড়নায় অপ্রতিরোধ্য ট্র্যাজেডির রচয়িতা।

কাকতাল যেন, লারসেন কিছুই জানতে পারেনি।

সান্তা মারিয়ার কেবল একজন মানুষ। ওই একজনই নিজেকে লারসেনের পাঁচ বছরের নির্বাসনের সাংবাদিক ভাবে। আসলে সে সংবাদপত্র বিক্রেতা, সে কিছু লিখতে পারে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার নাম ভাসকেস। আর এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। জাহাজঘাটা নাকি ধ্বংস হতে চলেছে। মহত্ত্ব আর অবক্ষয়ের পথে হেরেমিয়াস পেত্রুস। ধস্ত প্রাসাদের মধ্যে মার্বেল-মূর্তি আর নির্বোধ মেয়েটির কথা ফ্রয়লান ভাসকেসের সম্ভাব্য পত্রাবলির একমাত্র বিষয়। অথবা এ কাকতালীয় ঘটনা নয়, এক ভবিতব্য। স্মৃতিমেদুরতার সৌরভ আর অন্তরের গভীর বোধ লারসেনকে ভবিতব্যের হাতে সমর্পণ করেছে। সে ফিরে এসেছে সান্তা মারিয়ায়। ঋণ শোধ করবে বলে যেন চেনা পথে হাঁটছে। দেখছে এক ঘৃণ্য শহরের বাণিজ্যকেন্দ্র। মার্বেল প্রাসাদের হাতছানি সে উপেক্ষা করতে পারেনি। ভেজা ভেজা ঘাসের সরণি পার হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রিক তারের ফাঁসে বন্দি জাহাজঘাটায়।

জানা গেল যে ফেরার দু'দিন পর লারসেন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে সকাল সকাল। ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। পায়ের শব্দ জানান দিচ্ছে চেনা লোক দেখতে পেলে ওর ভালো লাগবে। তার চলায় ছন্দ আছে। জুতোর শব্দে তাল আছে, মোটাসোটা লোকের চলায় যেমন থাকে, পরিচিত মুখ দেখার আকুতি আর অব্যক্ত থাকে না। হাবভাবে বোঝা যায় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা তার, আর অনীহা ধন্যবাদের প্রতি, ফাঁকা অ্যাভিনিউ ধরে সে হাঁটছে। চলে আসে মাছ ধরার ঘাট পর্যন্ত। হাতের খবরের কাগজ পেতে মেঝেতে বসল। মাথার ওপর চেয়ে দেখল মেঘাবৃত আকাশ। লরিবোঝাই মাল আসছে। এনদুয়োর গোডাউনে ঢুকবে। মাছ ধরার ডিঙি ভাসছে আর কিছু বড় নৌকা দূরে দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে, দ্রুত যাচ্ছে, বোধহয় তাড়া আছে। রোয়িং ক্লাবের নৌকা বোধহয়। ভেজা জায়গাটায় বসেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। মাছভাজা, রুটি আর মদ। খাবার আর পানীয় বিক্রি করছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। ওদের পায়ে জুতো নেই, গায়ে ছেঁড়াফাটা জামা, খদ্দেরদের কাছে মাল বিক্রির জন্য ঘ্যানঘ্যান করে চলেছে। যাত্রীবোঝাই নৌকা যাত্রী নামাচ্ছে। লারসেন এক পলকে দেখে নিল। নির্বিকার চাহনি। দেখার জন্য দেখা। ঢেকুর তুলল। টাই থেকে মুক্তবাঁধানো পিন খুলল। দাঁত খুঁটবে। কিছু মৃত মানুষের কথা মনে পড়ে তার। স্মৃতিতে জমে আছে কত মুখ। কত কিছু। দুটো পর্যন্ত এখানে বসে বসে এসব কথা ভাবছে। তারপর উঠে পড়ল। দু'আঙুল দিয়ে প্যান্টের ভাঁজ ঠিক করে নেয়। আগের রাতে বোয়েনোস আইরেস থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজটা তুলে নিল। এতক্ষণে পথচলতি মানুষের ভিড়ে মিশে গেল। এদের অনেকেই নদী পারাপারের লঞ্চে উঠবে। কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে হাঁটছে। খবরগুলো অবশ্য সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই পড়ে নিয়েছিল। উদাসীনভাবে বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছে। হাঁটুর ওপর এক পা তোলা। এখন চোখের একদিক টুপিতে ঢাকা। অবাধ্য মুখভঙ্গি। কোনও দিকে মন নেই। পড়ার চোখ লুকিয়ে রাখে। কিন্তু মন চায় যে লোক ওকে দেখে চিনুক। জাহাজঘাটায় লোক নামল। এরই নাম বন্দর। সামনে এক পৃথুলা বৃদ্ধা, সঙ্গে একটা ঝুড়ি আর ঘুমন্ত মেয়ে, টাল সামলে নামল।

> মরচে-ধরা ক্রেন। সবুজ খেতের পাশে বিকট লাগে ধূসর বাড়ি। ক্ষয়ে যাওয়া বড় বড় অক্ষর। নীরব দানব ফিসফিস করে কী কথা বলছে কে জানে।

ঘাট ছেড়ে ওপরে উঠল। ভেজা মাটি আর সমান্তরালে প্রশস্ত সবুজ ঘাসের জমি, মাঝখানে জুড়ে দিয়েছে 'ই উ ই উ' নামের বুনো গাছগাছড়া। বড় বড় ক্রেনের দিকে তাকাল একবার। মরচে-ধরা ক্রেন। সবুজ খেতের পাশে বিকট লাগে ধূসর বাড়ি। ক্ষয়ে যাওয়া বড় বড় অক্ষর। নীরব দানব ফিসফিস করে কী কথা বলছে কে জানে। হ্যাঁ, পড়া যাচ্ছে লেখাটা, 'হেরেমিয়াস পেত্রুস এবং সিয়া'। সন্ধে না হতেই দুটো জানলায় আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। দরিদ্র এলাকার পাশ দিয়ে রাস্তার জঞ্জাল আর লোহালক্কড় পেরিয়ে, মহিলাদের কথাবার্তা আর কুকুরের চিৎকারের মধ্য দিয়ে ও এগিয়ে যায়। তবে নিজেকে লুকিয়ে রেখে দেখবে জায়গাটা।

ভেজা মাটি আর কাদায় ঢাকা রাস্তা, গাড়িচলার চিহ্ন নেই, আলো-আঁধারি পথে বেড়ার তার। পিছনে সিমেন্টের বাড়িগুলো অস্পষ্ট। নৌকা বাঁধার ঘাট ফাঁকা। মজুরদের ভিড় নেই। লোহার ক্রেনগুলো নড়বড়ে। চলতে চলতে ভেঙে পড়া বোধহয়। নির্মেঘ আকাশ, স্নিগ্ধ হাওয়া, মন ভালো করা প্রকৃতি।

নোংরা জায়গা— থুতু ফেলে লারসেন। তারপর এক চিলতে হাসি। প্রশস্ত কোণমতো জায়গাটা ফাঁকা। সে একা। মোটা, ছোটখাটো মানুষটার যাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই। পথহারা আগন্তুক, সান্তা মারিয়ায় আগে যখন ছিল, তার চেয়ে দেহ এখন ন্যুব্জ।

সান্তা মারিয়ায় যে ক'বছর ছিল, তার ওপর রাগ হয় লারসেনের। রাগ হয় ফিরে আসায়, রাগ হয় জমাট মেঘের বিরুদ্ধে, মেঘেদের ভেসে চলার বিরুদ্ধে, রাগ হয় তার দুর্ভাগ্যের জন্য।

বাঁদিকে ঘুরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে প্রবেশ করে বেলগ্রানোতে। বার, রেস্তোরাঁ, হোটেল, আরও অনেক কিছু। অর্থাৎ একটা এমন বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করল, যেখানে আছে চটি-জুতো, বোতল, কাঁটাচামচ, আলোয় টাঙানো পোস্টার, অর্ধেক মাটি আর অর্ধেক রঙিন টাইল। এক নির্মীয়মাণ দোকান, কিছুদিন পর খদ্দের টানবে। ব্র্যান্ড হয়ে যাবে 'বেলগ্রানো'। একটা টেবিলে বসল লারসেন। যাই হোক একটা কিছুর অর্ডার দেবে। আশ্রয় তো একটা। সিগারেট ওর ছিল না। সোডা সহ আনিস। ওর জন্য বৃষ্টি এল। অপেক্ষা করবে বৃষ্টি, ও তার শব্দ শুনবে, দেখবে নির্নিমেষে, কাচের দেওয়ালের ওপারে কথাবার্তা চলছে। মানুষের জটলা, মশা ও মাছিমারা আর চুলকুনির ওষুধ নিয়ে গভীর আলোচনা, প্রশংসা চলছে চুলকুনির ওষুধের। ওদের পায়ের তলায় কাদা, মাথার ওপর জিঙ্কের ছাদ। একসময় সব বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটে যাবে। সবার হৃদয়ে জন্ম নেবে বিশ্বাসহীনতা। বার্ধক্য গ্রাস করবে সকলকে।

আর একটা আনিস আর সোডা চাইল। ভালোভাবে তৈরি করে নিল পানীয়টা। মৃত মানুষদের কথা মনে পড়ছে, ভাবছে খাঁটি আনিসের কথা। দরজা খুলে গেল। এক নারীর প্রবেশ। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল কাউন্টারের সামনে। সেই মুহূর্তে আগেকার ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দের সঙ্গে সে জুড়ে দিল বুটপরা এক মানুষের উদাত্ত আবৃত্তি, লম্বা মানুষটি আবৃত্তি করছে মালিকের সামনে, পরে আর এক নারী এল। গোলগাল, মঙ্গোলীয় মুখচোখ, বেশ বিনয়ী, দরজাটা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে, হাওয়ার চাপের বিরুদ্ধে জোর লাগল। প্রথম নারীর পিছনে বসল। দু'জনেই শান্ত। খরিদ্দারের কাজে ওদের লাগে।

লারসেন তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে কিছু

অঘটনের আশঙ্কা আছে। বুটপরা মহিলার প্রতি সন্দেহ। দ্বিতীয় মহিলাকে দিয়ে যা-হোক কিছু হবে, ওর বুদ্ধি আর সহনশীলতার সদ্ব্যবহার করা হবে। দ্বিতীয়টি পরিচারিকা, পিছন দিকে অপেক্ষা করছে। ছোট স্থূল পা-দুটি ছড়িয়ে বসে আছে। হাতদুটো পেটের ওপর, মাথায় ঝালো রুমালের আবরণ। শীতল হাসি ছাড়া আর কোনও অভিব্যক্তি নেই। মতলবটা কী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লারসেনের একঘেয়েমিতে কোনও বাড়তি সমস্যা তৈরি করছে না। ওর স্মৃতিতে ধরা আছে এমন মুখ, এদের জাত বেশ চেনা চেনা লাগে। বারবারই দেখা যায়। মেসিনে তৈরি একটা জন্তু যেন। খুব সাদামাঠা কিংবা জটিল। কুকুর কি বিড়াল, দেখে নিতে হবে। অন্যজনকে খুঁটিয়ে দেখে সে। হাসিমুখে কাউন্টারের টিন বাজাচ্ছে। ছিপছিপে, ফর্সা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ওর বয়স তিরিশ, অন্যজন চল্লিশ হবে। সেই মেয়ে শৈশব দেখে, পরিষ্কার দেখতে পায়। আলো বড় বেপরোয়া। আর অনুশোচনা হয়। কোমল বুকের মাঝখানে কেমন যেন হয়। বেদনায় বিঁধে যায় হৃদয়। বেদনা পুরুষের জামায়। ঘাড়ের কাছে ভেলভেটের টুকরোয়। লম্বা পায়ের মজবুত নকলনবিশি, ছেলেটার পশ্চাদ্দেশে অহঙ্কার প্যান্টের ভিতরেও তাই। ওর ওপরপাটির দাঁতগুলো বড় বড়। হাসির দমক বেশ চমকদার। চোখে বিস্ময়, আগ্রহ, হাসি মিলিয়ে যায়। মেয়েটির কথা আর ভাবে না। দূরে চলে যাওয়া মানে মৃত্যু। সেকেন্ডের অনুভব, নির্বাসন, ছাপ বা প্রতিধ্বনি নেই কোথাও। কাউন্টারে না, মালিকের ঘাড়ে না। সাজানো বোতলের গায়ে মাকড়সার জালেও না। ওর সোনালি চুলের খোঁপা সুন্দর বাঁধা। কালো ভেলভেটের টুকরো দিয়ে ঘাড়ে আটকানো।

একঘেয়ে, সব একঘেয়ে— লারসেন বলে। চিন্তামগ্ন কিন্তু নিরুত্তেজ নয়। আঙুলের ইশারায় আরও একটা আনিস চায়। স্মিত হাসি ঝুলিয়ে সে দেখে যায় বৃষ্টির ধীর ঝিরঝির শব্দ। ছাদে টপটপ। রাস্তায় জমা জল। সঙ্গীকে মধুর মধুর বাক্য বলা বন্ধ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার।

লম্বা চুল, কোঁকড়া, জায়গায় জায়গায় বেশ সাজানো। আরও কালো একগুচ্ছ চুল মেয়েটির জামার ওপর ঝুলছে। এ চুলের বয়স নেই। লিলি ফুলের মতো। ঝোলা তালার মতো। ধাতব কেশ, পাণ্ডুর মুখ। মুখের ওপর টাটকা ব্রণ। খয়াটে ত্বকে রঙের প্রলেপ। তার একটা অতীত ছিল। অকারণ হাসি, প্রাণহীন, শব্দ আছে, থাকতেই হবে। হাঁফ ধরে যায়। কাশি আসে, হাঁচির শব্দের মতো।

দোকানের টেবিলে আর খদ্দের নেই। মেয়েরা ওর দিকে তাকাবেই ও নিশ্চিত আসবে কাছে। ওই মুহূর্তে দৃষ্টি কাড়বার জন্য অন্য এক

লম্বা চুল, কোঁকড়া, জায়গায় জায়গায় বেশ সাজানো। আরও কালো একগুচ্ছ চুল মেয়েটির জামার ওপর ঝুলছে। এ চুলের বয়স নেই। লিলি ফুলের মতো। ঝোলা তালার মতো।

কায়দা করল। টাইটা ঠিক করল, সিল্কের রুমাল বের করে আবার পকেটে রেখে দিল, ধীর পায়ে কাউন্টারে এল। বাঁ কাঁধে আড়াল হল মেয়েরা। মালিকের দিকে চেয়ে খেজুরে হাসি হাসল...

— আনিস নিয়ে অভিযোগ নেই আমার — অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠ। জানি এরকম সময়... কিন্তু আর একটু ভালো ব্র্যান্ড নেই আপনার?

— না স্যার, মালিক বলল।

তারপর সে ঝুঁকি নিয়ে একটা নাম বলে ফেলল। লারসেন একটু দমে গিয়ে মাথা নাড়ল, পাশের মহিলার নীরবতা শুনল। 'বেশ রাত হয়েছে, বৃষ্টি থামছে না, যেতে হবে।' পরিচারিকা দূর থেকে কথাগুলো ছুড়ে দিল। লারসেন কয়েকটা বিদেশি ব্র্যান্ডের নাম বলল, 'সবই এক, ওর আর কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তবুও মনে হয় একটা পাঠ শেখাল।

— ঠিক আছে স্যার। ব্র্যান্ডগুলো দেখব। কাউন্টারের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল লারসেন। মুখে হাসি, চোখে ক্ষমা, বোতলের অক্ষরগুলো পড়ল। মেয়েটি আবার হাসল। ও তাকাল না। ইচ্ছে হল না তাকাবার। কিন্তু তার কথায় সায় দিল। বলছে বৃষ্টির নির্লজ্জ প্রতিশোধের কথা। চেনাজানা লোকের গুণকীর্তন করে যাচ্ছে। আর বলছে যে মৃত বছরগুলোর অর্থ বলে দেবে শেষের কোনও ঘটনা।

সেন্যোরিতা, সত্বর ঢেলে সাজাতে হবে, বুঝলেন। হবেই।

মালিক বলে, 'অল্পবিস্তর দেরি হবে।' মেয়েটি শরীরটা দুলিয়ে হেসে উঠল। হাসি থামল। নিজেকে সামলে নিল। একেবারে চুপ। একঘেয়ে ক্লান্তিকর বৃষ্টি। বড় গম্ভীর। বড্ড জেদি।

পরিচারিকা বলল, 'একটু দাঁড়িয়ে যান। খামোকা ভিজে যাবেন।' কাকে বলল, কেউ জানে না। কার দিকে চাইল, কে জানে। চোখদুটো ঘুরছে এপাশ থেকে ওপাশ। মালিকের মাথার দুই সেন্টিমিটার ওপরে গিয়ে দৃষ্টি স্থির— উনি বলছেন যে, সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে। সে বিল মিটিয়ে কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলে। সরকার তো চলছে, সবাই বলছে ঠিকই চলছে। ওরা ঠিক বলছে; চলছে, কিন্তু গুছিয়ে নিতে পারছে না। ও আবার হাসল। মুখভরা হাসি ঘরময় ছড়িয়ে যায়। তার উঁচু দাঁত দেখা যায়। ক্ষমা চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল। মেয়েটির চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। এখন মনে হচ্ছে হবে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব হয়ে যাবে। হোক, না হোক, আমার কিছু যায় আসে না। রোজ সকালে ওই ভাবনা নিয়ে কিন্তু চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করি যেন সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। সে খুব বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগেই যেন হয়।

মালিক বলে, 'হতেই হবে, খুব তাড়াতাড়ি চাই। কাউন্টারে বসে আছে লারসেন। খুব আশ্চর্য হয়ে চেয়ে আছে পরিচারিকার দিকে। দৃষ্টিতে তার বড় মায়া। হাসল, বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে হাসিটা মেলে দিল। তারপর গুটিয়ে নিল। আবার গোমড়া মুখ। শুকনো ঠোঁট। ওর দিকে এক পলক চেয়ে এগিয়ে গেল অন্য মহিলার দিকে। ওর জামাটা স্পর্শ করল, আর বৃষ্টি থামছে না, রাতও হয়ে গেল।

এবার তো না গিয়ে উপায় নেই। এরপর লারসেন উঠে দাঁড়াল। যাওয়ার আগে সৌজন্যের হাসি হাসল। লম্বা চুলের মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসি, বুটপরা মেয়েটির সঙ্গে আর কথা বলল না। চাইল না ওর দিকে। মেয়েরা এবার চলে যাক, ও চাইছিল। হলুদ রঙের প্রকৃতির বুকে ওদের ঘোড়ার পিঠে চেপে যেতে দেখল। আবার আনিস নিয়ে বসল। মালিকের সঙ্গে একঘেয়ে কথা শুরু করল। ওকে পান করতে বলল। আর কোনও প্রশ্ন করল না। যারা ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করল, তার উত্তরে শুধু মিথ্যে বলে চলল।

সান্তা মারিয়ার শেষ লঞ্চটা ধরবে বলে উঠে পড়ল। অন্ধকার, টিপটিপ বৃষ্টি, ছিঁচকাঁদুনে, আস্তে আস্তে হাঁটা দিল। গাছের জল মাথায় পড়ছে। মাথা, গা ভিজে যাচ্ছে। জাহাজঘাটা অন্ধকার। নিঃশব্দ। ভাবনা নেই ওর। পরিকল্পনাও নেই কিছুর। অন্যমনস্ক অশ্বারোহী নারীদের পোশাকের কথা ভাবছে, কল্পনায় উদ্দাম। বাস্তবে সবকিছু একঘেয়ে।

(ক্রমশ)

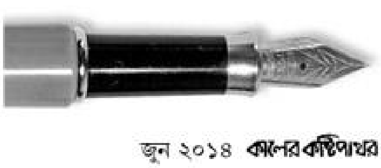

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাজ্যপাট

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

আলিপুর সদর মহকুমার এস ডি ও বিমল। সামনে নির্বাচন থাকায় মহকুমায় আইনশৃঙ্খলাজনিত নানা সমস্যা নিয়ে সে জেরবার। দুপুরে বিশ্রামের মধ্যেই জেলাশাসকের জরুরি ফোন পেয়ে তাকে ছুটতে হয় বিষ্ণুপুর-১ ব্লকে। সেখানে অকাল কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এদিকে কিছুটা আলস্য আর কিছুটা সময়াভাবে আয়কর রিটার্ন জমা না করায় তাঁর নামে ভিজিল্যান্স দপ্তরের চিঠি এসেছে। এমনিতে যদিও তাঁর সম্পত্তি বলতে সীমার সঙ্গে জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যাতে হাজার তিনেক টাকা পড়ে আছে। এমন সময় একটি ফোন তাকে বিচলিত করে তুলল। ফোনের অন্য পারে এক মহিলার কণ্ঠস্বর। বিমলের মহকুমার একজন পুলিশ অফিসার তাকে ক্রমাগত বিরক্ত করছে বলে তার অভিযোগ। কিন্তু মহিলার কণ্ঠস্বর শেষের দিকে গায়ে পড়া মনে হয় বিমলের। ফোন ছেড়ে সে ও সি-র কাছে সংশ্লিষ্ট অফিসারের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। তারপর রেকর্ড প্লেয়ারে কুমার গন্ধর্বের কণ্ঠে রাগ দুর্গা চালিয়ে সবে রোজকার সান্ধ্যপানীয় গ্লাসে ঢেলে বসতে যাবে, এমন সময় এ ডি এম প্রবীর মিত্রের ফোন। যাদবপুরে শাসকদলের বিপক্ষ পার্টির প্রার্থী নাকি ডি এম-এর কাছে অভিযোগ করেছেন, বিমল যাদবপুর এ সি-র কয়েক হাজার জেনুইন ভোটারের নাম তালিকা থেকে ডিলিট করে দিয়েছেন। এদিকে অনেকদিন পর পুরনো পাড়া হালিশহরের বন্ধু সুবল ফোন করে তাদের পুরনো বাড়িটির জীর্ণ দশার কথা তুলল।

৬

রাত আটটার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানো চন্দন সেনের টেলিফোন পেয়ে অবধি মনটা খিঁচড়ে রয়েছে। হলেই বা প্রাক্তন আই এ এস অফিসার। কথার ভাব এখনও এমন, যেন মাথা কিনে নিয়ে বসে আছেন। উনি ফোন করে এস ডি ও'র বাংলোয় আসতে চেয়েছিলেন। বিমল সাফ বলে দিয়েছে, অফিসে এসে দেখা করতে। তাতে করে উনি যে কুপিত হয়েছেন, তা বোঝা গিয়েছে।

সেই মেজাজ খারাপ অবস্থাতে বেশ রাত করে বাড়ি ফিরল বিমল। এন ভি এফ ভবতারণবাবু দরজা খুলে ধরে একপাশে সরে দাঁড়ান, যথারীতি সহবত রক্ষা করে। বিমলের হঠাৎ মনে পড়ে ঘরে দ্রব্য নেই। তাড়াতাড়ি ড্রাইভার যোগেশকে মোবাইলে ধরে। যোগেশ এখনও গাড়ি গ্যারাজ না করায় লম্বা লম্বা পায়ে এসে দাঁড়ায়। বিমল তার দিকে একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে শুধু বলে, একটা হাফ।

যোগেশ আমতা আমতা মুখে বলে, তাহলে সার— সাড়ে দশটা তো বাজে। আমি বরং খিদিরপুরের দিকে দেখি।

দেখ। তবে যেন পাওয়া যায়।

যোগেশ ছুটে বেরিয়ে যায়।

বাইরের ঘরে মা টি ভি দেখছে। যথারীতি হিন্দি সিরিয়াল। সীমা চৌকির একপাশে তাস বিছিয়ে পেশেন্স খেলতে বসেছে। মুনি হয়তো তার নিজের ঘরেই আছে।

বিমল বেতের চেয়ারে বসে জুতো খোলে। সীমা উঠে একটা জলের বোতল এনে দেয়। মা বলে, বাবা— এত রাত হল!

বিমল জুতো রেখে বলে, কী করব মা। ভোটের কাজ তো এমন-ই। কোনও দিন-রাত ঠিক থাকে না।

মা বলে, 'জানি না বাবা, কী চাকরি— সংসার-টংসার সব কী করে করে মানুষ এমন চাকরি করে?'

বিমল হাসে, বলো কী মা। সদর মহকুমার এস ডি ও সাহেব বলে কথা। তার কি এইটুকু সংসার। কত মস্ত বড় সংসার। সবার দেখভালের দায়িত্ব— সে কি কম!

বিমল হাত বাড়িয়ে সীমার হাত থেকে বোতল নিয়ে জল খায়।

মা বলে, কেন যে মিছিমিছি ইসকুলের মাস্টারিটা ছাড়লি। এখন তো মাইনেকড়িও ভালো। তার ওপর বছরে কতগুলো ছুটি।

বিমল হাসে, ভবিতব্য মা। সবই ভবিতব্য।

মা গম্ভীর মুখে বলে, 'কী জানি বাবা।'

বিমল বাথরুমে হাতমুখ ধোয়, শাওয়ার খুলে সাবান মেখে বেশ করে স্নান করে নেয়।

পাজামা পরে পাশের ঘরে মুনির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মেয়ে খুব নিচু আওয়াজে টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে গান শুনছে। শচীনকর্তার গাওয়া— কুহু কুহু কোয়েলিয়া— গানটা হচ্ছে।

মুনি চোখ তুলে বাবাকে দেখে। এমনিতেই বাড়তি চাপা স্বভাব আর গম্ভীর মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসে।

বিমল বলে, বেশ গানটা। নজরুল ইসলামের লেখা।

মুনি বলে, 'ক্যাসেটে তো এ সব লেখা নেই।'

তাই হয়। রেকর্ড হলে লেখা থাকত। আমার কাছে একটা ই পি রেকর্ডে এই গানটা আছে।

— তাই?

— হ্যাঁ, আর রেকর্ডিংটা তোর এই ক্যাসেটের চেয়ে অনেক ভালো।

— আসলে গানটা আমার স্যার দিয়েছেন আগের ক্লাসে।

— কার লেখা, বলেটলে দেননি?

— না তো।

— বাঃ।

বিমল ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে পাতা সাবেক চেয়ারটিতে বসে। এই চেয়ারটায় পিতামহ বসে লেখাপড়া করতেন। হোমিও ওষুধ দিতেন বিনি পয়সায়। কি আশ্চর্য চিকিৎসা করতেন! ওঁর এক সমবয়স্ক বন্ধু ভুপেনদাদুর পায়ে কী করে জানি একটা বড় মাছের কাঁটা ঢুকে যায়, বাজারে গিয়ে। উনি সার্জেনের কাছে না গিয়ে দাদুর কাছে চলে এলেন। ওষুধ পড়ল মাত্র এক ডোজ। সম্ভবত একটু হায়ার ডায়লিউমানের। তিনদিন পর সেই কাঁটা বেরিয়ে গেল। তবে পায়ের তলা দিয়ে নয়। পায়ের ওপর দিয়ে। পায়ের ওপর দিয়ে প্রথমে একটা ঢিপি, তারপর মুখ, মস্ত কাঁটাটা ফেটে বেরিয়ে গেল।

ভবতারণবাবু দু'বোতল জল এনে টেবিলের একধারে রাখেন। কাচের গ্লাসও একটি। পাশে রাখা প্লেটে প্যাকেট খুলে বাদাম। এক পাশে আজকের আনন্দবাজার আর টেলিগ্রাফ পেতে দেন। তারপর মিহি স্বরে বলে ওঠেন, 'সার— মাথাটা একটু হাডিয়ে দেব?

বিমল মাথা হেলায়।

ভবতারণবাবু যেন বিগ্রহে হাত দিচ্ছেন ভঙ্গিমায় বিমলের মাথা বোঝাই কোঁকড়া চুলে হাত রাখেন। তারপর আস্তে আস্তে

আঙুলগুলো চুলের জঙ্গলে চালাতে চালাতে অতি ধীরে টেনে টেনে দিতে থাকেন। বিমলের চক্ষু বুজে আসে আয়েশে।

ভবতারণবাবু বলেন, সার— একটা কথা বলব?

— হুঁ।

— মাথায় বিস্তর চুল হয়ে গিয়েছে। সময় করে একদিন কেটে নেন না সার।

— হুঁ।

— তাছাড়া সার— বলছিলাম মাথায় কলপ কল্লি ভালো হয়। অনেক পাকা চুল তো দেখা যায়।

বিমল এ বার কথা না বলে পারে না। সে একটু ঝাঁঝিয়েই বলে ওঠে, বয়েস হলে চুল পাকবে।

ভবতারণবাবু আনমনে একবার নিজের মাথায় কলপ করা চুলে হাত বোলান। চকচকে কালো চুল। তার নীচে শীর্ণ তোবড়ানো গাল।

ভবতারণ অপ্রস্তুতে কন, তা ঠিক কথা সার, তা ঠিক কথা—

আবার কিছু সময় চুপ ভবতারণ। কিন্তু কথা না বলে তিনি থাকতে পারেন না বলেই আবার বলে ওঠেন, সার, মাথায় এট্টু তেল থাবড়ে দেব?

বিমল শুধু বলে, না।

জানলার বাইরে খাঁ খাঁ মাঠে সামান্য সামান্য চাঁদের আলো। একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবলে মাঠখানিকে দিব্যি জলাশয় হিসেবে ভেবে নেওয়া যেতে পারে। তারই মধ্যে জোনাকি ফুটছে। বাঁ হাতে কালীঘাটের খালের উঁচু বাঁধ পারে বেশ কিছু পুরুষ-মহিলা কলকলাচ্ছে। এই খাল বয়ে গিয়েছে মন্দিরের দিকে— একেবারে সরু শীর্ণ হয়ে বয়ে গিয়েছে। ওখানেই লোকজন স্নান করে।

হাওয়া ছেড়েছে কেওড়াতলা শ্মশানের দিক থেকে। ফলে কাঠে পোড়ানো হাতে-গোনা শবদেহের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে হাওয়ার মুখে। ছেলেবেলায় হালিশহর শ্মশানঘাটের স্মৃতি মনে পড়ে। একে বলা হত মুড়িপোড়া গন্ধ।

কলিং বেল বাজে। ভবতারণ সত্বর গিয়ে তার কাছ থেকে খবরের কাগজে মোড়া রামের পাঁটখানা এনে টেবিলের পাশে সন্ত্রমে নামিয়ে রাখেন এবং ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেন। তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এসে বিমলের পিঠ দাবাতে থাকেন।

বিমল উঠে গিয়ে শচীনদেব বর্মনের এল পি চালিয়ে দেয় নিচু ভলিউমে। একটু পরেই শচীনকর্তার কিঞ্চিৎ ন্যাজাল আর আশ্চর্য সুরেলা গলায় প্রথম গানটি আরম্ভ হয়।

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে

হাওয়া ছেড়েছে কেওড়াতলা শ্মশানের দিক থেকে। ফলে কাঠে পোড়ানো হাতে-গোনা শবদেহের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে হাওয়ার মুখে। ছেলেবেলায় হালিশহর শ্মশানঘাটের স্মৃতি মনে পড়ে। একে বলা হত মুড়িপোড়া গন্ধ।

মাঠের পাশে যাই— ওরে মাঠের পাশে যাই

আকাশ তখন উষার তৃষায় সিঁদুর মাখায় ভাই

ওরে মাঠের পাশে যাই।...

গান হয়। বিমল রামে চুমুক দেয়। আর এই গানের সরল সিধে ছবিখানি চোখের ভিতরে দেখতে পায়। এখন রাত হলেও বিকেলবেলাকার এই অভিনব বর্ণনা মনকে যেন ঠিক সেখানেই নিয়ে চলে যায়।

ভবতারণ গানের তালে তালে মাথা দোলাতে থাকেন।

টেবিলে রাখা সেলফোনটা বেজে ওঠে। বিমলের ইশারায় ভবতারণ গানের স্যুইচ অফ করে দেন।

ওদিক থেকে সেই পরিচিত গলার আওয়াজ। প্রাক্তন আই এ এস অফিসার চন্দন সেন, যিনি এবার যাদবপুর বিধানসভা এলাকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোককে অনেকদিন আগে বিমল দেখেছিল তার ভূমিদপ্তরে চাকরির সময়। তখন মাত্র একুশ বছর বয়সে সে জে এল আর ও হিসেবে চাকরি করতে ঢুকেছে নদিয়া জেলার এক প্রত্যন্ত ব্লকে। একদিন বি ডি ও অফিস থেকে কী একটা কাজ সেরে হাইওয়ে বরাবর হেঁটে আসছে নিজের অফিসের দিকে একা। হঠাৎ তার পাশ দিয়ে লালবাতি লাগানো একটি সাদা অ্যাম্বাসাডার বেরিয়ে গেল। বিমল দেখল পিছনের জানলা দিয়ে ডি এম সাহেব হাসি হাসি মুখে তাকে দেখছেন। এখনও মনে আছে তাঁর অতিকায় দেহ আর বিস্ফারিত চক্ষু জোড়া।

তারপর— আরও একবার দূর থেকে স্যুটেডবুটেড তাঁকে দেখা হয়েছিল। তখন তিনি কলকাতায়।

বিমল শুধু বলে, বলুন।

সে জানে উনি এখন আর চাকরিতে নেই। ইলেকশন ক্যানডিডেট। ফলে প্রথামতো 'স্যার' বলার কোনও কারণ নেই।

তার এই 'বলুন' শব্দটি তিনি ধরে ফেলেন যথাযথ ধুরন্ধরতায়। হ্যাঁ, এস ডি ও সাহেব, একটু অসময়েই বিরক্ত করলাম। তবে কিনা ইলেকশনের সময় ডি এম, এস ডি ও'দের তো দিনরাত একাকার— তাই না।

বিমল আবারও বলে, হ্যাঁ বলুন।

ওদিক থেকে কিঞ্চিৎ প্যাঁচ কষা শুষ্ক হাসি ও কথা — আজ্ঞে হ্যাঁ। বলব বলেই তো ফোন করলাম। সারা দিন ইলেকশনের কাজ সেরে এখন খানিকটা সময় পাওয়া গেল। আপনার বাংলোয় যেতে চাইছিলাম, যা আপনি তো পছন্দ করলেন না এস ডি ও সাহেব।

আসলে বাড়িতেও অফিসের ফাইল করতে হয়। তারপর নিজের জন্যও তো খানিকটা স্পেস দিতে হয়।

— হুঁ, বুঝলাম। আপনি খুবই বুদ্ধিমান। তবে আপনার সম্বন্ধে যতদূর খবর নিয়েছি, তা মন্দ নয়। প্রথম কথা, আপনি অনেস্ট অফিসার। দ্বিতীয়ত, খাটা খাটনি করে থাকেন।

— থ্যাঙ্ক ইউ।

— না, না আমিও অনেককাল আগে— বোধহয় তখন আপনি কলেজের ছাত্র, এস ডি ও ছিলাম।

— তা হবে।

— আমার যা বলার বলি। আমার বিপক্ষে যিনি মূল ব্যক্তি দাঁড়িয়েছেন— মানে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, এমনিতে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক। কিন্তু ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা— মানে যাদবপুরের যে সব নেতা-হাফনেতাদের কাঁধে ভর দিয়ে উনি নির্বাচন লড়ছেন, তারা সব এক-একটি ডাকাত। ফলে উনি একটি পচে যাওয়া দলের পচা নেতা। বুঝতেই পারছেন।

— হুঁ।

— আমি এখন যা আপনাকে মুখে বলছি, এ সবই উইথ ডকুমেন্ট আপনাকে লিখিত জানাব।

— হুঁ।

— আপনাকে সে সবই তদন্ত করতে হবে এবং পারসোন্যালি।

— সেটা তো আমার— মানে রিটার্নিং অফিসারের ব্যাপার।

বিমল সামান্যক্ষণ থামে। তারপর বলে, কিছু মনে করবেন না। এটা তো ইলেকশন রুলস-এর ব্যাপার। সেটা তো আমার বিষয়।

— বেশ। কিন্তু আমি যে প্রমাণ-সহ

আপনাকে লিখব, তার কী হবে এস ডি ও সাহেব?

— বললাম তো, তদন্ত হবে।

এটা একটা ইভেসিভ কথা। কিন্তু ফল কী হবে আমি জানতে পারব তো?

— সে তো অনেক পরের কথা। আগে আপনি অ্যাপ্লিকেশন দিন।

— আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, আপনিও রিটায়ারমেন্টের পর আমার মতো রাজনীতিতে জয়েন করবেন।

এতক্ষণে বিমলের মেজাজটা চড়ে যায়। রামের গ্লাসে সে একটা লম্বা চুমুক দেয়। তারপর মুখ থেকে ফোন সরিয়ে ভবতারণবাবুকে বলে, আপনি ব্যারাকে চলে যান। রাত হয়েছে।

ভবতারণ নমস্কারান্তে দরজা খুলে চলে যান। দরজাটা ভেজিয়েও দিয়ে যান।

ফোন কানে ধরে বিমল বলে, আমার মনে হয়, এবার আপনার থামা উচিত।

— তার মানে!

— মনে হচ্ছে এবার আপনি ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকে যাচ্ছেন।

— মনে হওয়াটা তো আপনার নিজের। আমি আপনার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছিলাম। আপনি মশাই ঠাট্টাও বোঝেন না!

— আপনার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক! আপনি একজন ক্যান্ডিডেট। ব্যবহারটা সে রকমই হওয়া উচিত নয় কি!

— হুঁ। বোঝা গেল। তবে এটা মনে রাখবেন— যেহেতু আমি একজন প্রার্থী, তাই আমার সঙ্গে আপনার কথা বলতেই হবে। আপনার ইচ্ছে না করলেও।

— অবশ্যই কথা বলব। যেমন অন্য সকলের সঙ্গে বলতে হয়।

— না, না আমি আপনার কাছে স্পেশাল কোনও ফেভার চাইছি না। এটা ভাবলে আপনি ভুল করবেন।

— নিশ্চয়ই। তবে প্রয়োজনে সময় অসময়ে আপনাকে ফোন করব।

— অবশ্যই।

— গুড নাইট স্যার।

— গুড নাইট।

অত্যন্ত বিরক্তিতে বিমল ফোন বন্ধ করে। উঠে গিয়ে শচীনদেব বর্মনের রেকর্ডটা তুলে নিয়ে সেখানে ওস্তাদ আমির খাঁ চড়িয়ে চালিয়ে দেয়। রাগ মালকোষ।

দরজা ঠেলে সীমা এসে ঘরে ঢোকে।

বিমল তাকায়।

সীমা বলে, কার সঙ্গে এত ঝগড়া করছিলে?

— ওই একজন ক্যান্ডিডেট।

— কে, মুখ্যমন্ত্রী নাকি?

— উনি তো কখনও ফোন করেন না। তাঁর চিফ ইলেকশন এজেন্ট যিনি আছেন, তিনিই যোগাযোগ করেন। সি.এমদের এত সময় থাকে না।

— খেতে দেব কি?

— মা, মুনি— ওরা খেয়েছে।

— মা তো ঘড়ি ধরে দশটায় খায়। আর মুনিও। দু'জনেই শুয়ে পড়েছে।

— তাহলে দাও।

আমির খাঁ'র মালকোষও ঘরে বাজছে। এখনও বিলম্বিতে। ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি সীমা-বিমল।

বিমল রুটির সঙ্গে আলুর দম মাখাতে মাখাতে বলে, কেন যে স্কুল মাস্টারিটা ছেড়ে এই সব ঝামেলায় জড়ালাম।

— তোমায় মাস্টারি মানায় না। জীবনে একদিনও নিজের মেয়েকে পড়াতে বসেছ?

বিমল হাসে, আলুর দমে সস দিয়েছ?

— খেয়ে বুঝতে পারছ না! অবশ্য তুমি তো এখন বোঝার অবস্থায় নেই।

ক্রমশ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

শাদা ঘোড়া

ছোটদের স্বপ্ন আর যুদ্ধের রূপকথা।
পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত

পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

ঋষিকুমার

বাড়ির ছাদে নিজের হাতে বানানো চিড়িয়াখানা, চম্বলের ডাকাত, লাল-চোখ বেদে, বাঁশিওলা— এইসব নিয়ে ঋষিকুমারের রোমাঞ্চকর নানা অভিযানের কাহিনী। পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি।

₹২০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

“রবিশংকরের বাজনা তো ঘনঘন হয় না। সুর বুঝুক বা না-বুঝুক প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর বাজনা দেখার কৌতূহল তো ছিলই। ঠিকঠাক সময়ে রবিশংকর এলেন, নিজে নিজেই। আমায় বলেছিলেন, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। আমি লালাজির বাড়ি থেকে সরাসরি চলে আসব, তবলার জন্য অনিন্দ্য চলে আসবে, ও কোনও পারিশ্রমিক নেবে না। সেদিনের অনুষ্ঠান খুব ভালো হল। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, পৃষ্ঠপোষক, জ্ঞানীগুণী মানুষেরা অনুষ্ঠান অলংকৃত করেছিলেন। আমার কিছুটা উত্তেজনার ক্লান্তি অথচ যেন ভার-লাঘবের অবস্থা। সাপুড়ের বাঁশিতে যেন মুগ্ধ, তখন হয়তো অন্য ইন্দ্রিয় স্তব্ধ। অনুষ্ঠান সেরে রবিশংকর চলে গেলেন। কৃতজ্ঞতা, বিদায় জানিয়ে আগামী দিনের চিন্তায় ডুব দিলাম। কিন্তু গুঞ্জন বাড়তে লাগল।”

একটি নিবেদন

‘কালের কষ্টিপাথর’ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘আমার ছবিজীবন’-এর ১৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদ লেখকের অসতর্কতাবশত অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। ফলে স্মৃতিকথার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেজন্য ওই কিস্তির শেষ অনুচ্ছেদটির পুনর্মুদ্রণের সঙ্গেই না মুদ্রিত অংশটিও এখানে ছাপা হল।

১৫ পরিচ্ছেদের পুনর্মুদ্রিত শেষ অনুচ্ছেদ

পার্ক সার্কাস ময়দানের উল্টোদিকে রাস্তার ওপরে এক অলংকারহীন ধোঁয়া-হলুদ বাড়ি। সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে গিয়ে সোজা উঠে যাই বাড়ির চারতলায়। বেল দিই। দরজা খুলে সহাস্যে বলেন, কী খবর, কেমন আছ? উনিও আমায় চিনতেন। বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছি। তাই যখন জানালাম, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। উনি ভিতরে ডেকে নিলেন, জুতো খুলে বসলাম নিরাভরণ ঘরে পাতা মাদুরের ওপর। উনি বললেন, চা খাবেন? আমি খাই না বলাতে উনি বললেন, ঠিক আছে একটু বসুন, আমি চা খেতে খেতে কথা শুনি। চা নিয়ে আমার সামনে বসলেন। আমি আমাদের পরিকল্পনা সবটাই উজাড় করে বলি, উনি শোনেন। বলেন, ভালো তো, ভালো তো। আপনারা এরকম কিছু একটা করছেন। আমরা তো পারলাম না। আমরা

মিলিতভাবে মঞ্চ গড়ার চেষ্টা করেছি, শেষপর্যন্ত আর হয়নি। হয়তো সে খাতে অল্প কিছু টাকা পড়ে আছে। আমি রুদ্রপ্রসাদকে জানাব, সেই টাকাটা আপনাদের কাছে দিতে পারলে হয়তো কিছু সাহায্য হবে। আমার প্রস্তাব শুনে উনি বললেন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না আপনি কেন আমায় নির্বাচন করলেন। আমি তো আর কবিতা পাঠ করি না। আর আমার কবিতা শুনতে, আমার কথা শুনতে কে আর টিকিট কাটবে বলুন? আমি ভেবে দেখব, আপনি পরে আসবেন। সে সময় উনি খুব মজে ছিলেন। সবে কালীদাস সম্মান পেয়েছেন। অশোক বাজপেয়ী তখন ভারত ভবনের সর্বেসর্বা। শম্ভুবাবুর বনজঙ্গল দেখার শখ। অশোক বাজপেয়ী তাঁকে অত্যন্ত যত্ন করে ভূপাল আর তার আশপাশের অরণ্যপথে নিয়ে গিয়েছেন। উনি সেই ভ্রমণে মথিত। আমাকে কী সুন্দর করে তাঁর অনন্য শব্দ উচ্চারণে স্বভঙ্গিমায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বর্ণনা শোনালেন। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে শুনতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। এসেছি সাড়ে ৮টায়। আমার আসল কাজের পাকাপোক্ত উত্তর পাইনি। উনি পরে আসতে বলেছেন। এটাই মাথায় নিয়ে চলে আসি। এরপর দু-চারদিন অন্তর যেতে থাকি। আমার প্রস্তাব গুছিয়ে বলি। এর উত্তর আসে খুব মাপা। আমার কথার মধ্যে কোনও ফাঁক থাকলে বা ওঁর কাছে ঠিকঠাক না মনে হলে সেদিনের আলাপচারিতার বিষয় তা নিয়ে শুরু হত। এভাবেই শিবনারায়ণ রায় সম্পর্কে তাঁর ধারণা, সমাজ বা নীতি নিয়ে, একাল-সেকাল নিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে তাঁর ধারণা জেনেছি। ওঁর সঙ্গে কোনওদিন কোনও যুক্তিতে পারিনি! ওঁর কাছে তখন আমি নেহাতই বাচাল। কী সাহসেই বা আমি জেতার ভাবনা করি! সব কিছুতেই যেন ওঁর শব্দ উচ্চারণে বাজে হতাশার সুর। প্রায় পঞ্চম বা ষষ্ঠ বারে যখন আমি বেপরোয়া হয়ে গিয়েছি, ওঁর অনুমতি নেওয়ার জন্য নাছোড়বান্দা সেদিন। শম্ভুবাবুকে জানাই, আপনি আজ মনস্থির করে আমাকে সম্মতি দিন। আমার হাতে বেশি সময় নেই। এছাড়া যাঁরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের আমাকে ছাপার বিষয় খুব তাড়াতাড়ি দিতে হবে। আমি পোস্টার ডিজাইন করেছি। যাতে একটু প্রচারের সুবিধা হবে। কারণ টিকিট ঠিকঠাক বিক্রি হলে খরচখরচা বাদ দিয়ে যেটুকু থাকবে তা আর্টস একরের কাজে লাগবে। তাঁকে জানাই

> এ কী আপনারা খেটেখুটে আয়োজন করছেন সেখানে সিগারেট কোম্পানিকে জড়িয়েছেন কেন? আমি একেবারে পছন্দ করি না। আপনাদের মতো একটি বিশুদ্ধ কাজে এ ধরনের পাপাচার কেন? এ কথা আমি আগে জানলে আপনার সঙ্গে এত আলোচনা করতামই না।

একটি নামী প্রতিষ্ঠান রাজি হয়েছে আমাদের প্রচার ও ছাপার দায়ভার গ্রহণ করার। রাণা দাশগুপ্ত আমাদের খুব উৎসাহিত করেছেন। আপনার সম্মতি পেলে ওগুলো ঠিকঠাক করতে পারি। আমি যে পর্যন্ত রাজি করিয়েছিলাম তাতে ঠিক ছিল— উনি কীভাবে বসবেন মঞ্চে তার পরিকল্পনা করা। কারা মঞ্চে সে সময় থাকবেন, সেইসব ব্যবস্থা করা। উনি বলেছিলেন, আমি একাই বসব। আমি অল্পক্ষণ থাকব। তারপরে আপনি আপনাদের অনুষ্ঠান করবেন। এরকম একটা জায়গায় মোটামুটি রাজি করিয়েছিলাম। হঠাৎই উনি বেঁকে বসলেন স্পনসরের কথা শুনে। এ কী আপনারা খেটেখুটে আয়োজন করছেন সেখানে সিগারেট কোম্পানিকে জড়িয়েছেন কেন? আমি একেবারে পছন্দ করি না। আপনাদের মতো একটি বিশুদ্ধ কাজে এ ধরনের পাপাচার কেন? এ কথা আমি আগে জানলে আপনার সঙ্গে এত আলোচনা করতামই না। ওঁদের বাদ দিয়ে যদি কিছু ভাবনা করতে পারেন আমায় জানাবেন। নচেৎ আমাকে যুক্ত করবেন না। আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। আর কথা না বাড়িয়ে আমি চারতলা থেকে নেমে বাস ধরার জন্য এগিয়ে গেলাম। এ দুঃখের কথা সে মুহূর্তে আর জানাইনি। এন টি সি-র রাণা দাশগুপ্ত কত উৎসাহ দিয়েছেন। রাজি হয়েছেন কার্ড ছেপে দেওয়ার, ফোল্ডার, পোস্টার ছেপে এমনকী হোর্ডিংয়ে অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করবেন তাঁদের কোম্পানির হয়ে। এসবে আমাদের সত্যিই সাহায্য হবে। সোজা চলে যাই তাঁর কাছে। মার্টিন বার্ন-এর উল্টোদিকে বিরাট বারান্দাওলা কোণের বাড়ি। উঠে যাই তিনতলায় তাঁর অফিসে। রাণাদার ঘরে ঢুকে পড়ি। ওঁকে আমার বিষণ্ণতার সব কথা বলি। এতদিনের যাওয়া, শম্ভু মিত্রের সঙ্গে কথোপকথন আর শেষকালে ফিরে আসা। রাণাদা শোনেন সব কথা। শুনে উঠে দাঁড়ান, আমাকে অনুসরণ করতে বলেন। আমি টেবিল পেরিয়ে ওঁর চেয়ারের কাছে চলে যাই। বাঁ পাশে বিশাল জানলার কাচ দিয়ে আমাকে দেখান, উল্টোপারের কোনে টাঙানো বিশাল বড় হোর্ডিং। যেটা তাঁর কোম্পানির অর্থানুকূল্যে বিজ্ঞাপিত। তাতে মুদ্রিত শাঁওলি মিত্রের একটি বিশেষ ভঙ্গি। ওপরে লেখা শম্ভু মিত্র প্রযোজিত শাঁওলি মিত্র অভিনীত 'নাথবতী অনাথবৎ' ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বহুলপ্রচারিত ফোর স্কোয়্যার সিগারেট বক্সের ছবি। লেখা আছে এন টি সি-র সৌজন্যে। সেটি দেখে অবাক আমি। আর বললেন, শম্ভুবাবুর ব্যক্তিগত অনুরোধে এই প্রযোজনার সব কাজই করে দিয়েছি। এটি বড় মাপের অর্থানুকূল্যে আমাদের কাজ। এর পরে আমার অনুভূতি ওই দীর্ঘ সময়ের কথোপকথন তা এতই একান্ত প্রক্রিয়া যা ঠিক অভিজ্ঞতার বিবরণে হবে না। শম্ভু মিত্রকে নিয়ে আর আমাদের অনুষ্ঠান করা গেল না। এর পরের অভিজ্ঞতা সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে। চিদানন্দ দাশগুপ্তের চিঠি এসেছিল খুব তাড়াতাড়ি। তিনি রাজি হয়েছেন এই শর্তে যে, তাঁর দিল্লি যাতায়াতের বিমান ভাড়া পাঠিয়ে দিতে হবে। সে সময় যাতায়াতের ভাড়া ২,০০০ টাকার কিছু বেশি। আমরা ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবেছিলাম, তিনি চলে আসবেন। তাঁর মতো মানুষের কাছে এই টাকা কোনও ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমরা তো পাঁচ-দশ টাকা চেয়ে চেয়ে আর্টস একর গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। আমাদের কাছে অগ্রিম পাঠানো দুষ্কর। বিশপ লেফ্রয় রোডে আবার যেতে হল জানাতে। সত্যজিৎ রায় একটু মৃদু হেসে আমায় বলেন, ঠিক আছে সুন্দর আমার ব্যাপারে খুব উৎসাহী। ঠিকঠাক বলতে পারবে। সুন্দর মানে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। আমি চলে যাই তখনই। ম্যাক্সমুলার ভবনের পাশ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা গলি ঢুকে গিয়েছে লাভলক প্লেস। একটি ফ্ল্যাট বাড়ি। তার দু'তলা কিংবা তিনতলায় মনে নেই। আলাদা করে গ্রিলের দরজা লাগানো সে সিঁড়ি। তখন দেড়টা বেজে গিয়েছে। ধৃতিমান

নিজেই দরজা খুলে দিল। ঘরে বসি। ওর সঙ্গে আমার এক বন্ধুর সূত্রে পরিচয়। যদিও ওর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আগে আলাপচারিতা হয়নি। কিন্তু আমরা পরস্পরকে চিনতাম। ধৃতিমান খুবই উৎসাহ দেখাল আর বলল, মানিকদা যখন আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি নিশ্চয় ঠিকঠাক তৈরি করে নেব। কোনও অসুবিধা হবে না। সময়মতো পৌঁছে যাব, আর ইতিমধ্যে তো যোগাযোগ হবে। আমি নিশ্চিন্ত হই। অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয় শম্ভু মিত্রের বদলে একদিন শুধু আবৃত্তি পাঠ। যেখানে শক্তিদা, অপর্ণা সেন প্রভৃতিরা। প্রথম দিন সত্যজিৎ রায়ের সন্ধ্যায় ঠিক হয় 'সদগতি' তথ্যচিত্র দেখানোর। সত্যজিৎ রায় শ্যাম বেনেগালের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে দেন আমায়। শ্যাম বেনেগালের সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের যে চলচ্চিত্র সেটি যাতে আমরা ওই সন্ধ্যায় দেখাতে পারি। চিঠিটি আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাই। খুব দ্রুতগতিতে কাজ চলে। সারাদিন ছুটে বেড়াই আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। একদিকে টাকা জোগাড় অন্যদিকে মঞ্চ সাজানো। সামগ্রিক সাজসজ্জা প্রচারের ভাবনা আর অন্যদিকে অশান্ত সময়ের অনিশ্চয়তা ভিতরে ও বাইরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হল— বেশ বড়। রবিশঙ্কর ওখানে আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেও এক ঘটনা। অসম্ভব নৈরাজ্য তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রতিদিন ধিকৃত হচ্ছেন। একদল ছাত্র-কর্মচারী তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেয় না। গালিগালাজ অপমান সহ্য করে তিনি অনড় অবিচল হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক আবহাওয়া একেবারেই ভালোর দিকে নয়। পরিতোষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এক সকালবেলায় সন্তোষবাবুর কাছে যাই। উনি রাজি হয়ে প্রাথমিক অনুমতি দিয়ে দেন। কিন্তু ঝামেলা, যেসব রীতিনীতি যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীর কাজ, তা নিয়ে এক টালবাহানার সম্মুখীন হই। কোনও কিছুতেই যেন সঠিক নিয়মনির্দেশ নেই। সব কিছুই যেন অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনায় আর উৎকণ্ঠায় কাটে। এরকম সময়ে এক সকালে নির্মাল্য আচার্য আমার বাড়িতে আসেন। শুধু উনি এই মহল্লার বাসিন্দাই নন— সেই ইন্দ্রনাথ মজুমদারের দোকানে যেখানে আমি বহুদিন থেকে যাতায়াত করছি, সেখান থেকে 'এক্ষণ' প্রকাশ হত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর

'উৎসব-রূপ-রস-ধ্বনি'র পোস্টার। ১৯৮৫ সাল

নির্মাল্যদা যুগ্ম-সম্পাদক। উনি খুব কম কথা বলতেন। একনিষ্ঠভাবে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সেইভাবে নানান কাজে, নানান কথায় নির্মাল্যদা ছিলেন আমার খুব কাছের মানুষ। মনে আছে আমি প্যারিস যাচ্ছি শুনে উনি কিছু তালিকা দিয়ে দিলেন ওখান থেকে নিয়ে আসার। সেই নির্মাল্যদা সে সময় মানিকবাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। 'এক্ষণ'-এর প্রচ্ছদ আঁকা থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সব মিলে ওঁদের খুব কাছের সম্পর্ক ছিল। পরে যখন সৌমিত্ররা 'এক্ষণ' থেকে আলাদা হয়ে গেলেন তখন থেকে 'এক্ষণ'-এর প্রকাশক, সম্পাদক সবকিছুই ছিলেন নির্মাল্যদা। ওই সময় সত্যজিতের ছায়াসঙ্গী হয়ে যান নির্মাল্য আচার্য। আমার বাড়িতে এসে উনি জানালেন, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ইউনিভার্সিটির শতবার্ষিকী হলে তোমরা যে ওঁকে নিয়ে আসছ— মনে হয় ওঁর শরীরের পক্ষে ঠিকঠাক হবে না। তুমি ভেবে দেখো। মানিকদাকে না আনাই ভালো। আমাদের সাংস্কৃতিক মহল খুব একটা বড় নয়। সকলেই সকলের মনোভাব, মানসিকতা জানেন। কোনও গোপন থাকে না। নির্মাল্য আচার্য যে একমাত্র সত্যজিৎ রায়কে নিয়ন্ত্রণে রাখেন আর তিনিই যে তাঁর গতিবিধির নিয়ন্তা! তিনি সত্যজিতের অন্যতম

হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সে সময় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে আমি এক ভুঁইফোড়। সত্যজিৎ রায়কে রাজি করিয়েছি এবং কলেজ স্ট্রিট পাড়ার চৌহদ্দিতে তিনি আসছেন। যেখানে নির্মাল্য আচার্যের কোনও ভূমিকা নেই বা কোনও অনুমতি নেই এটা ঠিক হতে পারে না। তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে মানিকবাবুকে পরামর্শ দিয়েছেন এই অনুষ্ঠান থেকে সরে আসতে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় উৎসাহী ছিলেন, তাঁর কথামতো ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় রাজি হয়েছে আমার সঙ্গে কথোপকথন করে। তিনি নিজ হাতে চিঠি লিখেছেন শ্যাম বেনেগালকে। যাতে সেই অনুষ্ঠানে সেই ছবি দেখানো যায়। তাঁর এইসব অনুমতি নিয়েই তো আমরা পোস্টার ছেপেছি, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি— এর পরেও যদি মত পরিবর্তনের উপদেশ কেউ দেয় আমি আর কী করতে পারি। সেদিন আমি বিশেষ কাজে আনন্দবাজার অফিসে গিয়েছি।

১৫ পরিচ্ছেদের বাদ পড়া অংশ

আনন্দবাজারে গিয়েছিলাম অনুষ্ঠান নিয়ে কারও কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য। হঠাৎ এক ফাঁকে অভীক সরকারকে দেখতে পাই। উনি আমাকে দেখেই বলেন, আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম। মানিকবাবু আমায় ফোন করেছিলেন। ওঁর কাছে আপনার কোনও কনট্যাক্ট নাম্বার ছিল না। তাই আমায় ফোন করে আপনাকে জানাতে বলেছেন। উনি আপনাদের অনুষ্ঠানে সেদিন উপস্থিত থাকতে পারবেন না। সেটাই জানাতে বলেছেন। আমরা যেন বিজ্ঞাপনে তাঁর নামটা ব্যবহার না করি। আমি খুব মুষড়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, এক প্রভাবশালী চক্র আমার বিরুদ্ধে লেগেছে। সবসময় আমি একা। আমার অহংকার আমার ছাত্রছাত্রীরা। আর আশৈশব মানুষের সঙ্গে মেশা। মানুষকে কাছে পাওয়া। যেন গোত্রহীন ব্রাহ্মণ আমি। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলে এত অসংখ্য নেতি ব্রাহ্মণের রমরমা যে, তথাকথিত ব্রাহ্মণকুলে প্রবেশ করলে বোঝা যায়, প্রকৃত শিক্ষিতের চেয়ে ঈর্ষা, হীনমন্যতা, সামান্যতম লোভ সংবরণ না করতে পেরে অমানবিক আচরণ করা এদের স্বাভাবিক চরিত্র। সেদিন সন্ধ্যায় আমার সহযোগীদের নিয়ে এ পরিস্থিতিতে নানান বিপদের আশঙ্কা আর কীভাবে বিজ্ঞাপিত, প্রচারিত সত্যজিৎ রায়ের সন্ধ্যা পালন করব তারই আলোচনায় বসে ঠিক হয়, যেহেতু সেই দিনটা সেই ভাবে

শতবার্ষিকী ভবনে মঞ্চ সাজানোর বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছি। ১৮ ফুট বাই ৬ ফুট ছবি এঁকেছি। সেটা আমাদের মঞ্চের ব্যাকড্রপ। আর ত্রিস্তরে সাজানো জ্যামিতিক ভাবে সিঁড়ির মতো উঠে যাওয়া মঞ্চের ওপরে মঞ্চ। সেখানে বাজাবেন রবিশংকর।

প্রচারিত, সেখানে শুধুমাত্র তাঁর উপস্থিতি বাদ দিয়ে পুরো অনুষ্ঠানটাই সত্যজিৎ বিষয়ে হবে। দুর্ঘটনার কথা রাধাপ্রসাদ গুপ্তকে বললাম। এদিকে পরিতোষ সেন তো ছিলেনই আর সত্যজিতের নায়িকা স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে আমন্ত্রণ জানালাম। ধৃতিমানও ছিলেন। সেই মতো বিজ্ঞাপনের ভাষা সামান্য বদল করে অনুষ্ঠানসূচি ছাপতে দিলাম। যথারীতি পরিশ্রম করে অর্থ জোগাড় করে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করে আমার সহযোগী ছাত্ররা কাজ করে চলল। অনুষ্ঠানের দিন একটু রদবদল হয়েছে। প্রথম দিন রবিশংকর বাজাবেন। তারপর কবিতা সন্ধ্যা, শেষ দিন সত্যজিৎ রায় সন্ধ্যা। শতবার্ষিকী ভবনে মঞ্চ সাজানোর বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছি। ১৮ ফুট বাই ৬ ফুট ছবি এঁকেছি। সেটা আমাদের মঞ্চের ব্যাকড্রপ। আর ত্রিস্তরে সাজানো জ্যামিতিক ভাবে সিঁড়ির মতো উঠে যাওয়া মঞ্চের ওপরে মঞ্চ। সেখানে বাজাবেন রবিশংকর। উনি আমার প্রতি এতটাই আস্থাশীল হয়েছিলেন যে, আমাদের আয়োজনের কথা শুনে ফরাসি চলচ্চিত্রকারদের দল— যাঁদের কথা ছিল দিল্লিতে মভোলঙ্কার হলের অনুষ্ঠানটির ছবি তোলার, কিন্তু রবিশংকর তাদের অনুরোধ করেছিলেন কলকাতায় আমাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আসতে, ছবি তুলতে। আমরা সাধ্যমতো আর স্বপ্নমতো হল সাজিয়েছিলাম। সেই ফরাসি ক্যামেরাম্যান আর তথ্যচিত্রের দল তাঁদের মতো ঠিকঠাক করে নিয়েছিল জায়গা। হলঘর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। টিকিটের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ৫০ টাকা। অধিকাংশ ৫ আর ১০ টাকা। চারদিকে হোর্ডিং, পোস্টার, তোরণ। বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো হয়েছিল টিকিটের কাউন্টার।

রবিশংকরের বাজনা তো ঘনঘন হয় না। সুর বুঝুক বা না-বুঝুক প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর বাজনা দেখার কৌতূহল তো ছিলই। ঠিকঠাক সময়ে রবিশংকর এলেন, নিজে নিজেই। আমায় বলেছিলেন, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। আমি লালাজির বাড়ি থেকে সরাসরি চলে আসব, তবলার জন্য অনিন্দ্য চলে আসবে, ও কোনও পারিশ্রমিক নেবে না। সেদিনের অনুষ্ঠান খুব ভালো হল। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, পৃষ্ঠপোষক, জ্ঞানীগুণী মানুষেরা অনুষ্ঠান অলংকৃত করেছিলেন। আমার কিছুটা উত্তেজনার ক্লান্তি অথচ যেন ভার-লাঘবের অবস্থা। সাপুড়ের বাঁশিতে যেন মুগ্ধ, তখন হয়তো অন্য ইন্দ্রিয় স্তব্ধ। রবিশংকরের মঞ্চে প্রিয়জন এবং পৃষ্ঠপোষকের এমন দায়ভারে আছি, তাই অন্য কোনও সুর, গুঞ্জন কানে আসেনি। অনুষ্ঠান সেরে রবিশংকর চলে গেলেন। কৃতজ্ঞতা, বিদায় জানিয়ে আগামী দিনের চিন্তায় ডুব দিলাম। কিন্তু গুঞ্জন বাড়তে লাগল। সেই গুঞ্জনের মূল হোতা হয়ে দাঁড়াল উৎসবের দায়িত্বে থাকা একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী কয়েকজন ছাত্র। যাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মনে করেছি, তুলনাহীন আস্থা রেখেছি— তারাই। ওদের পিছনে কিছু মানুষের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছিল। সেই ইন্ধনদাতারা সফল হয়েছিলেন। আমার এত পরিচিতি বা ক্ষমতা তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। নানা মিথ্যা অপবাদে-প্রলোভনে মন বিষাক্ত করেছিল সেইসব ছাত্রদের। ওরা নানাভাবে হেনস্থা করতে শুরু করল। শেষপর্যন্ত এক অদ্ভুত অপবাদ গুঞ্জরিত হল। যেহেতু আমরা সিজন টিকিট বিক্রি করেছিলাম, পুরো তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রবেশের জন্য, তাতে একদল চড়াও হতে লাগলেন। তাদের অভিযোগ, আমি মিথ্যা প্রচার করেছি, তাই তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক। আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেও বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। কারণ পরিকল্পিতভাবেই তারা অনুষ্ঠান ভন্ডুল করার চেষ্টা করছে। রবিশংকরের অনুষ্ঠান দেখেছে অথচ কী করে পুরো টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে? তবে যথাযথ ভাবে আমাদের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শহরে ক্রমশ সেই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ কবিতার দিন শক্তি চট্টোপাধ্যায়,

১৯৮৯। আর্টস একর-এ এসেছেন সলিল চৌধুরি, সবিতা চৌধুরি ও অশীন দাশগুপ্ত

অপর্ণা সেন, ধৃতিমান সবাই মাতিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই কয়েকটি ছাত্রের আচরণ প্রত্যক্ষ হল। অন্যান্য সহযোগী ছাত্ররা আমায় সাবধান করে দিতে লাগল তাদের ব্যাপারে। শেষদিনে সত্যজিৎ রায়ের যে সন্ধ্যা, তাতে বিশৃঙ্খলা চরম আকার নিল। বহু লোক রে রে করে তেড়ে এল। অনুষ্ঠানে গণ্ডগোল বাঁধাবার চেষ্টা করল। আমি তাদের অনুনয়-বিনয় করে জানালাম আর টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। প্রত্যক্ষ করলাম, এর মূল নেতৃত্বে আমার সবথেকে আস্থাভাজন দু'টি ছাত্রের ভূমিকা। অনুষ্ঠান হল, আমার মন ভেঙে গেল। কৃতজ্ঞ রইলাম সেইসব অতিথি আর কলাকুশলীদের প্রতি, যাঁরা কথা দিয়েছিলেন, এসেছিলেন, অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই দুর্ঘটনাতেও আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন, এই তিনদিনের অনুষ্ঠান করে এমনকী রবিশংকরের মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবাদপ্রতিম মানুষের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমরা বোধহয় খুব লাভবান হয়েছি, আর্টস একরের জন্য অনেক ফান্ড তুলতে পেরেছি, কিন্তু তা নয়। টিকিট বিক্রি করে

শেষদিনে সত্যজিৎ রায়ের যে সন্ধ্যা, তাতে বিশৃঙ্খলা চরম আকার নিল। বহু লোক রে রে করে তেড়ে এল। অনুষ্ঠানে গণ্ডগোল বাঁধাবার চেষ্টা করল। আমি তাদের অনুনয়-বিনয় করে জানালাম আর টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। প্রত্যক্ষ করলাম, এর মূল নেতৃত্বে আমার সবথেকে আস্থাভাজন দু'টি ছাত্রের ভূমিকা।

এবং টিকিট ফেরত দিয়ে আমাদের কিছু লোকসান হয়েছিল। শতবার্ষিকী হলের আসনসংখ্যা প্রায় তেরোশো। এর মধ্যে ১৩০টি টিকিট কর্তৃপক্ষের জন্য রেখে দিতে হয়। আমরা ছ'শো টিকিট ৫ টাকায় আর তিনশো টিকিট ১০ টাকায়, বাকি ২০ ও ৫০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছিলাম। সবমিলিয়ে যে টাকা উঠেছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা। কিন্তু তিনদিনের হলভাড়া, ছাপা, আপ্যায়ন, মঞ্চসজ্জা, গাড়িভাড়া— এসব নিয়ে প্রায় ৬ হাজার টাকা ঘাটতি হল। রবিশংকর আরও প্রচারিত হলেন। তাঁর আর্টস একরের প্রতি ভালোবাসা, অর্থ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা কোনওদিনই আমরা ভুলব না। কিন্তু আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নানা অপ্রীতিকর ঘটনায় মানসিক আঘাত— এগুলোর মূল্য কীভাবে যোগ-বিয়োগ হবে? তবে হ্যাঁ, জীবনের সবকিছু কাজ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় সেগুলো কম কী! কাউকে দোষারোপ করার কোনও অর্থই হয় না। আঘাতকে আমি পুরস্কার বলে এখনও মনে করি। এগুলো নিয়ে আজ আর মাথা ঘামাতে

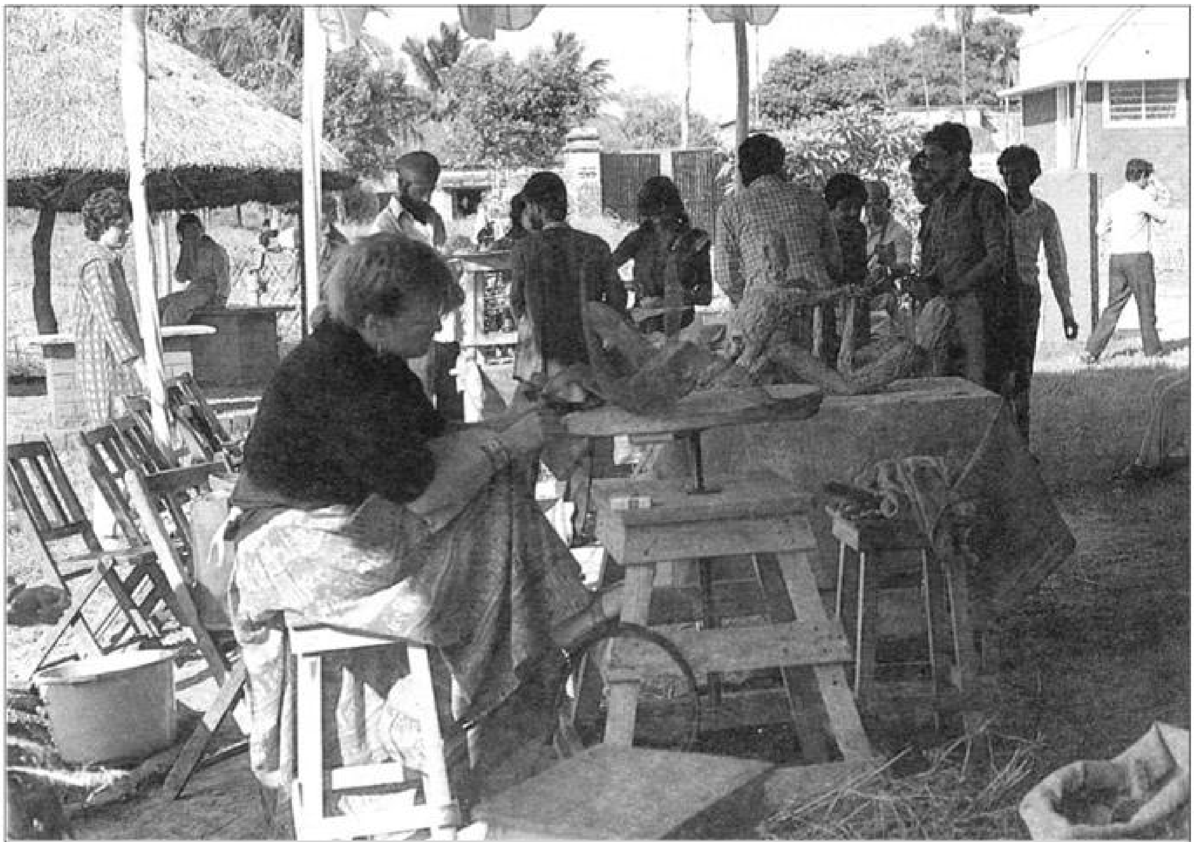

বছরটা ১৯৮৮। ব্রিটিশ শিল্পী নিকোলা হিকস আর্টস একর-এ শিল্পসৃষ্টিতে মগ্ন

চাই না। এ আমার ছবি-জীবনের প্রবাহ মাত্র। এ প্রসঙ্গে আরও দুটো ঘটনা বলে ফেলা যাক।

একদিন সকালে তবলাবাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এলেন, যিনি সেদিন রবিশংকরের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন। আমি তাঁর নাম শুনেছিলাম, কিন্তু সেভাবে আলাপিত ছিলাম না। আমার স্টুডিওয় বসলেন। তারপর আমার কাছে ২,৫০০ টাকা দাবি করলেন। আমি তখন জানালাম, রবিশংকর আমাকে বলেছিলেন, আপনি কোনও সম্মান-দক্ষিণা নেবেন না, আমরা সেইমতো আমাদের খরচখরচা ধরেছি। তাই আপনার জন্য কোনও বরাদ্দ রাখিনি। উনি আমায় জানালেন, এ টাকা আমার পারিশ্রমিকের নয়। আমি ওইদিন আপনাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য সোজা বম্বে থেকে এসেছি আর বম্বেতে ফিরে গিয়েছি। এটা আপনাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিমানভাড়ার টাকা। সেটা আপনার দেওয়া উচিত। আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অগত্যা আমাকে খুব অসুবিধার মধ্যে সে-টাকা জোগাড় করে দিতে হল। উনি কলকাতা থেকে এসেছিলেন। বম্বে থেকে যাতায়াত করেননি, এই খবরটা অন্য এক সহযোগী জানিয়েছিলেন।

শিল্প-সংস্কৃতি কী হওয়া উচিত, কোনটা পুরস্কৃত করা উচিত, কাকে কোথায় বসানো উচিত— এসবই এদের মতামতে হয়। অথচ কিছু বই পড়া ছাড়া এঁদের বোধ-উপলব্ধি কিছুমাত্র নেই। ইংরেজি ভাষাটা ঠিকঠাক রপ্ত। আর উচ্চস্তরের বিমানপথে ওঁদের যাতায়াত।

কিছুদিনের মধ্যে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে এলা দত্ত একটা বড় লেখা লিখলেন। এলা দত্ত আমার পরিচিত ছিলেন। এ লেখা লেখার আগে বাড়িতে এসেছিলেন। উঁচুমহলে তাঁর বিচরণ। শিল্প-সংস্কৃতি কী হওয়া উচিত, কোনটা পুরস্কৃত করা উচিত, কাকে কোথায় বসানো উচিত— এসবই এদের মতামতে হয়। অথচ কিছু বই পড়া ছাড়া এঁদের বোধ-উপলব্ধি কিছুমাত্র নেই। ইংরেজি ভাষাটা ঠিকঠাক রপ্ত। আর উচ্চস্তরের বিমানপথে ওঁদের যাতায়াত। নির্মাল্য আচার্যরা এঁদের ঘনিষ্ঠ। সেই এলা দত্ত একটি বড় প্রবন্ধে আমাদের উদ্যোগ আর আমি যে সত্যজিতের নাম ভাঁড়িয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান করেছি— তা নিয়ে লিখলেন। একটা বিশেষ মহল জানল, আমি খলচরিত্রের মানুষ। অথচ কারও সঙ্গেই আমার বিদ্বেষ ছিল না। নির্মাল্যদাকে সেই কতদিন ধরে চিনি। এই গোষ্ঠীর সকলের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার

সম্পর্ক। সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে আর যেহেতু তিনি আর্টস একরের ব্যাপারে উৎসাহিত ছিলেন, অর্থসাহায্য করেছেন, তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠানে তিনি নিজে সম্মতি জানিয়ে কীভাবে উপস্থাপিত হবেন সে-ব্যাপারে পরামর্শমতো তাঁর পছন্দের মানুষ হিসেবে চিদানন্দ দাশগুপ্ত হাজির থাকতে না পারার জন্য ধৃতিমানের কথা উনিই বলেছিলেন, এমনকী শ্যাম বেনেগালের ছবির জন্য তিনি বেনেগালকে নিজহাতে লিখে দিয়েছিলেন, কিন্তু তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষীর কথায় হয়তো শেষমুহূর্তে মত বদল করেন। এজন্য আমি আর জবরদস্তি করিনি। আমাদের হাতে সময় ছিল না, তাই অনুষ্ঠানে সূচি সামান্য পরিবর্তন করে তাঁর অনুপস্থিতির ফাঁক চেষ্টা করেছি পূরণ করার। এর মধ্যে অসত্য কোথায়? আর সত্যজিৎ রায়ের শ্রোতা, দর্শক তো কিশোরকুমারের শ্রোতা নন। তাহলে এই উন্মাদনা আর আচরণ আসে কাদের ইন্ধনে? এ প্রশ্ন থেকে যায় সারা জীবন— যাঁরা বোঝার বোঝেন। সেই ঘটনার তরঙ্গ বহুদূর গড়িয়েছিল। আমাকে পিছুতাড়া করেছিল নানা অপবাদ। আমি সন্দেহভাজন-গোলমেলে চরিত্র হয়ে গিয়েছিলাম।

স্বপ্ন-বিশ্বাস এতটাই তাড়িত করত, তাতে আমার উদ্যোগের পরিশ্রম অনেকটা সময় আবেগের উদ্দেশ্যে খরচা হয়ে যেত। এগুলো তখন তো বোঝার সময় নয়। এখন বুঝি। মানুষ ধাক্কা খেতে খেতে, আঘাত পেতে পেতে শিলা হয়ে যায়। কী জানি, আমি হতে পারিনি!

এত দশক কাটিয়ে এসেও কি আমি বদলাতে পেরেছি? আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যে একটা বিশ্বাসহীনতা দানা বেঁধেছে, সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। কৃতজ্ঞ কেউ হতে চায় না। এটাই হয়তো মানুষের চরিত্র। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কে আমার কাছে চলে আসছে বা কে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে— এই নিয়ে কী প্রলয় অবস্থা নিজেদের মধ্যে শুরু হয়েছিল, সেটা আমার বোঝার উপায় ছিল না। সামনাসামনি তারা সবাই শ্রদ্ধাশীল, ভালোবাসার, বিশ্বাসের ভান করত। পিছনে অন্য কিছু। আবেগের অন্যতম লক্ষণ হল সবাইকে একান্ত ভাবা। উচ্ছ্বাসে সবকিছু উজাড় করা। হয়তো সমাজ-সংসারের কূটনীতিতে এসবের ফলাফল ঠিক হয় না। কিছু বাইরের দাদারা নানা প্রলোভন দেখাতে শুরু করল কিছু ছাত্রদের। তারা কিছুটা নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করতে শুরু করল। একটি ছাত্রের কথা বলি, সে গোড়া থেকেই

স্বপ্ন ছিল, আমি গড়ে তুলব একটা সুন্দর শিল্পক্ষেত্র। যেখানে আমার ছাত্রছাত্রীরা থাকবে, কাজ করবে। তাদের জীবনযাত্রাও একটু অন্যরকম হবে। যে সম্পর্কটা গড়ে উঠবে, সেখানে সৃষ্টিশীলতা ছাড়া কোনও প্রতিযোগিতা থাকবে না। সারা পৃথিবীর মানুষ আসবেন, ছবি দেখবেন, ছবি সংগ্রহ করবেন। সংস্কৃতির আদানপ্রদান হবে।

আমার প্রতিষ্ঠানে যুক্ত। শুধু ছবি আঁকা নয়, তার পারিবারিক অবস্থার সংকটকালে তার মাকে এবং তার পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করে কিছুটা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন আমার নিজস্ব আর্থিক অবস্থা একেবারে ভালো ছিল না। কিন্তু সাধ্যমতো অন্যকে সাহায্য করার সাহস ছিল, মন ছিল। সেই ছাত্রটির মা আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি বিধবা, আমার কোনও আত্মীয়স্বজনও আপনার মতো এভাবে বিপদে পাশে দাঁড়ায়নি। আপনার ঋণ কোনওদিন ভুলব না।' তার কিছুদিন পরে একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে আমি তার চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। সে-প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষ বিভাগে আমার কিছুটা জোর ছিল। কারণ, সেই বিভাগের প্রধানকেও সেখানে যুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। সে-সময়ে ওই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়া সহজ ঘটনা ছিল না। পরবর্তীকালে সে-ছাত্রটির বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও আমাকে অভিভাবকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। যদিও আমার প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধুই কয়েক ঘণ্টার শিল্পচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সবারই ব্যক্তিগত সমস্যা, ভবিষ্যৎ সবকিছুরই যেন জিম্মাদারি নিয়ে ফেলেছিলাম। আমার জগৎ, জীবন, সমাজ, আনন্দ, যন্ত্রণা এদের নিয়েই ছিল। সেই অনুষ্ঠান ভন্ডুল করার কাজে মুখ্যত সেই ছাত্রটি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। তাতে যোগ দিয়েছিল আরও কিছু প্রধান চরিত্র।

আর্টস একরের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে গিয়েছে। পুরোদমে নেমে পড়েছি অর্থ সংগ্রহের কাজে। কখনও মিছিল করে, মিটিং করে, ট্যাবলো সাজিয়ে, কৌটো হাতে দান সংগ্রহ করতে শামিল করেছি কিছু অভিভাবক, কিছু বন্ধু শিল্পী-কবি যাঁরা সেসময় আমায় ভালোবাসতেন। একদিকে গড়ে উঠছে তিলে তিলে, কখনও অর্থ জোগানের ঘাটতি থাকায় বন্ধ থাকছে। সবকিছু নিয়েই এক দুশ্চিন্তার, অনিশ্চয়তার অবস্থা। তারই মধ্যে ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে শত্রুতা, বিদ্রোহ দানা বাধতে লাগল। যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমি এর মূল ভাবনায় শামিল হয়েছিলাম, তারা সাকুল্যে সাত-আটজন। কথা হয়েছিল, সবাই সমান অংশের টাকা গচ্ছিত রাখবে ট্রাস্টের নিয়ম অনুযায়ী এবং তারাই হবে মূল ট্রাস্টি। কিন্তু সকলের সেই অর্থ দেওয়ার অবস্থা ছিল না। তাই কেউ অংশত, কেউ পরে দেবে এই আশ্বাসে যুক্ত হয়েছিল। সেখানেও অনেক দুর্বলতা কাজ করেছিল। ইতিমধ্যে একজন বিদেশ পাড়ি দিয়েছে, আমারই উৎসাহে। সেখানেই সে কয়েক দিনের মধ্যে জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়েছে। আর্টস একরের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ জীবন যুক্ত করার ভাবনা থেকে সরে গিয়েছে। স্বপ্ন ছিল, আমি গড়ে তুলব একটা সুন্দর শিল্পক্ষেত্র। যেখানে আমার ছাত্রছাত্রীরা থাকবে, কাজ করবে। তাদের জীবনযাত্রাও একটু অন্যরকম হবে। যে সম্পর্কটা গড়ে উঠবে, সেখানে সৃষ্টিশীলতা ছাড়া কোনও প্রতিযোগিতা থাকবে না। সারা পৃথিবীর মানুষ আসবেন, ছবি দেখবেন, ছবি সংগ্রহ করবেন। সংস্কৃতির আদানপ্রদান হবে। সর্বোপরি এক সুন্দর আকর্ষণীয় ক্ষেত্র গড়ে উঠবে। একটা সময় পর্যন্ত এই জীবন কাটিয়ে পরবর্তী নবীন শিল্পীরা সুযোগ পাবেন। এইভাবে একটা জীবনচর্চা, সৃষ্টিচর্চার প্রবাহমান প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। কিন্তু দু'-একজনের উদ্দেশ্য, ভাবনা আর লক্ষ্য ছিল একটু অন্য— যারা ট্রাস্টের সঠিক ভাবনাটা জানত না, বা জানতে চাইত না। ট্রাস্টের আইনত ধারা হল যে— ট্রাস্টিরা কোনও ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে না। ট্রাস্টিরা দান করতে পারে। ট্রাস্ট গঠন করে হয়তো ট্রাস্টের সুবিধার্থে কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, সেটাও পরস্পর আলোচনা করে। আমার ভাবনায় 'ট্রাস্ট' শব্দটি শব্দের অর্থবহতাতেই প্রাধান্য পেয়েছিল। মানুষ সাধারণত আদর্শের

উত্তরাধিকারী হতে চায় না, চায় টাকা, জমি-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে। আমার স্বপ্ন, আবেগ কিন্তু আদর্শের উত্তরাধিকারী গড়ে তোলার ভাবনায় উদ্যোগী ছিল। দল থেকে যখন তারা সরে যাচ্ছিল, তখন অপেক্ষাকৃত নবীন ছাত্রছাত্রী অথচ আমাদের এই ভাবনার খুব কাছের একদলকে মূল সংগঠনে যুক্ত করে নিয়েছিলাম। এদের যুক্ত করার জন্য ক্ষোভে আরও ঘৃতাহুতি পড়ল। ভেবেছিল, তারা সরে গেলে শুভাদা দুর্বল হয়ে পড়বে, কিন্তু তা না হওয়াতে আর তাদের চেয়ে নবীনরা নানাভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করাতে আমার পূর্বতনরা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত কিছু মানুষদের মধ্যে যুক্ত হয়ে নানা অপবাদের কাজে লেগে পড়ল। তারই চরমতম ঘটনা ঘটল ওই দুর্বল ছেলেটির পরিণতি।

আর্টস একর গড়ে তোলার কাজে একদিনও থেমে থাকেনি। মানুষের কাছে কোনও ভাবে হাতপাতা যে কত গ্লানির, সেটা প্রতিদিন বুঝতাম। কিন্তু আমাদের কোনও উপায় ছিল না। এত বড় একটা কাজ মাথায় নিয়েছি অথচ আমার ব্যক্তিগত এমন কোনও পুঁজি ছিল না, যাতে আমি নিজে নিজেই কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। মেয়ে তখন ২ বছর হয়ে গিয়েছে। কলেজ স্ট্রিটের নতুন বাড়ি। সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার করি। স্টুডিওটা বড় করেছি। চুটিয়ে কাজ করছি। এখন সকলেই কোনও-না-কোনও শিল্পীদলে যুক্ত। কিন্তু সবই দাদাদের দখলে। এই দাদারা বা অগ্রজ শিল্পীরা আমাকে ভয় করেন। আমি তো বেপরোয়া। আমার নিজস্ব সংগঠন আছে। আর্টস একরে নিয়মিত প্রদর্শনী হয়। যদিও সেখানে আমার ছবি রাখি না। কলকাতায় বিদেশি আর কিছু শিল্প সংগ্রহকারী মানুষ— যাঁরা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসেন, ছবি কেনেন, আমি তাঁদের উৎসাহিত করি আর বলি, আর্টস একরে যেতে। সেখানে কম দামে তরুণ শিল্পীদের কাজ সংগ্রহ করতে।

মেলা শুরু হল আর্টস একরে। কয়েক মাস ধরে সেই মেলার প্রস্তুতি চলত। ছবি আঁকা ছাড়াও, পুতুল, ভাস্কর্য, নানারকম কারুকাজ, একটু অন্য রকমের করে আর্টস একর আর তার সংলগ্ন জমিতে খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে তোরণ নির্মাণ করে, পোস্টার ছাপিয়ে সেই মেলা সাজানো হত। কত দূরদূরান্ত থেকে মেলা দেখতে আসতেন কত রকমের মানুষ। এ ধরনের পরিবেশ, ভাবনা এর আগে কখনও কলকাতার মানুষ দেখেননি। এইসব কর্মকাণ্ড দেখে লোকমুখে আমাদের দাদারা অর্থাৎ অগ্রজ শিল্পীরা চাউর করে দিলেন— শুভাপ্রসন্ন এখন একজন অর্গানাইজার। চিত্রীর নামটা উহ্য করে দিলেন। অথচ প্রতিদিন আমি কাজ করি। ছবি আঁকাই আমার জীবন-জীবিকা। বেঁচে থাকবার অন্য কোনও পথ ছিল না। তবে হ্যাঁ, আর্টস একর অনেকটাই আমার সময় নিয়ে নিত। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আর্টস একরের প্রদর্শনী দিল্লি, বম্বে আয়োজিত হতে লাগল। গ্যালারিতে সাজিয়ে রাখি আর্টস একরের ছবি, কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র ইত্যাদি। শিল্পী-শিবির আয়োজন করি। তাতে যোগ দেন বহু বিদেশি কৃতী শিল্পীরা। আমার সঙ্গে বিদেশি দূতাবাসের যোগাযোগ থাকায় কোনও বিখ্যাত কৃতী মানুষ কলকাতায় এলে ম্যাক্সমুলার ভবন, ব্রিটিশ কাউন্সিল, অ্যালিয়াস ফ্রাঁসেস প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের কাছে আসতেন। এমনকী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও ঘুরে যেতেন এই শিল্পীগ্রামে। আর আমাদের দেশের যেমন সংস্কৃতির মানুষেরা, শিল্পীরা অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের বহু কৃতী মানুষেরা নিয়মিত আসতেন। শিল্প সংগ্রহ করতেন। সংশ্লিষ্ট তরুণ শিল্পীরা উৎসাহিত হত। ক্রমশ জমে উঠল আর্টস একর...

ক্রমশ

অনলাইনে কিনতে ▸ www.swarnakshar.in

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

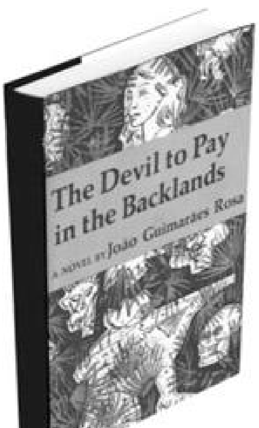

ফিরে পড়া বই

হোয়াও গুইমারেজ রোসা'র

দ্য ডেভিল টু পে ইন দ্য ব্যাকল্যান্ডস

বিশ শতকে ব্রাজিলের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে? গ্রাসিলিয়ানো র‍্যামোস? ক্লারিস লিসপেকটর? হোর্হে আমাদু? রাচেল দি কুয়েরোজ? হোসে লিনস দো রেগো? এরিকো ভেরিসিম্মো? লিমা ব্যারেটো? অসওয়াল্ড দি আন্দ্রাদে? মারিও দি আন্দ্রাদে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সম্প্রতি রিও দি জেনেইরোর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মানচেতে' একটি সমীক্ষার আয়োজন করেছিল। বলা বাহুল্য, এই সমীক্ষায় ৩১৫টি ভোট পেয়ে যিনি শীর্ষস্থান পেয়েছেন, তাঁর নাম হোয়াও গুইমারেজ রোসা। উনিশ শতকের মাচাদো দি আসিসের (১৮৩৯-১৯০৮) পরবর্তীকালে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ব্রাজিলের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। রোসার 'দি ডেভিল টু পে ইন দ্য ব্যাকল্যান্ডস' (যে উপত্যকায় শয়তানকে দাম দিতে হয়) ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। বিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে জয়েসের 'ইউলিসিস', ফরাসি সাহিত্যে প্রুস্তের 'রিমেমব্রেন্স অব থিংস পাস্ট', জার্মান সাহিত্যে মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন', ইতালীয় সাহিত্যে স্যাভোর 'কনফেশনস অব জেনো', স্প্যানিশ সাহিত্যে হোসে লেজামা লিমার 'প্যারাদিসো'র

মতোই পর্তুগিজ সাহিত্যে রোসার উপন্যাস এক ব্যতিক্রমী মর্যাদার অধিকারী।

রোসার জন্ম ১৯০৮ সালের ২৭ জুন, মিনাস জিরেইস প্রদেশের কোরদিসবুর্গোতে। বাবার নাম ফ্লোদুয়ার্দো পিন্টো রোসা, মায়ের নাম ডি ফ্রান্সিসকা গুইমারেজ রোসা। বাবা-মায়ের ছয় সন্তানের মধ্যে সবার বড় ছিলেন রোসা। শৈশব থেকেই ভাষা শেখার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। সাত বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি ফরাসি ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে একটি সাক্ষাৎকারে রোসা জানিয়েছিলেন, তিনি বলতে পারেন পর্তুগিজ, জার্মান, ফরাসি, ইংরাজি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, এসপারান্তো, রুশ; পড়তে পারেন সুইডিশ, ডাচ, ল্যাটিন ও গ্রিক; ব্যাকরণ পড়েছেন হাঙ্গেরিয়ান, আরবি, সংস্কৃত, পোলিশ, লিথুয়ানিয়ান, টুপি, হিব্রু, জাপানি, চেক, ফিনিশ, ড্যানিশ ভাষার। রোসার বিশ্বাস ছিল, যত বেশি ভাষাকে জানা যাবে, তত নিজের ভাষাকে গভীরভাবে বোঝা সম্ভব হবে। শৈশবেই রোসা চলে যান বেলো হরিজন্তে, দাদু-দিদার কাছে থাকতে। স্নাতক হওয়ার পর ১৯২৫ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মিনাস জিরেইস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা পড়বেন বলে আবেদন করেন।

১৯৩০ সালের ২৭ জুন বিয়ে করেন লিজিয়া ক্যাব্রাল পেন্নাকে। লিজিয়ার বয়স তখন মাত্র ১৬। তাঁদের দু'টি মেয়ে হয়, ভিলমা ও অ্যাগনেস। মিনাস জিরেইসের বিভিন্ন এলাকায় চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সময় পশ্চাৎপ্রদেশের বিস্তৃত উপত্যকা সম্পর্কে একটু একটু করে তাঁর অভিজ্ঞতা হতে থাকে। ১৯৩২ সালে রোসার সঙ্গে পরিচয় হয় ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট জাসসেলিনো কুবিতশেকের। ব্লাড হসপিটালের তিনি ছিলেন প্রধান ডাক্তার। ১৯৩৩ সালে রোসা যান বার্সিলোনায়, নাইনথ আর্মড ব্যাটেলিয়ানের ডাক্তার হয়ে। রোসার জীবনের বেশিরভাগই কেটেছে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায় ব্রাজিলের কূটনীতিক হিসেবে। ১৯৩৮ সালে জার্মানির হামবুর্গে অ্যাসিসটেন্ট-কনসাল হিসেবে থাকার সময় রোসার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কার্ভালহোর সাক্ষাৎ হয়। ১৯৬৩ সালে রোসা সর্বসম্মতিক্রমে 'ব্রাজিলিয়ান অ্যাকাডেমি অব লেটার্স'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালের ১৯ নভেম্বর রিও দি জেনেইরো'তে আচমকা হার্ট অ্যাটাকে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে রোসার মৃত্যু হয়।

রোসার রচনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অন্তর্মুখী, তিনি কথ্যভাষাকে ব্যবহার করলেন শুধুমাত্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেই নয়, জয়েসের মতো এক নতুন আখ্যানশৈলী সৃষ্টিতেও তাকে কাজে লাগালেন।

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় রোসার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সাগারানা'। এর আগে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মাগমা'। এই গ্রন্থে ছিল ন'টি বড়গল্প বা নভেলা। রোসার ভাষা-ব্যবহারের শক্তি, কাব্যগুণ ও অভিনবত্ব পাঠককে বিস্মিত করে দেয়। অসংখ্য নতুন শব্দ ব্যবহার করেন তিনি। ১৯২৮ সাল থেকেই ব্রাজিলে দ্বিতীয় প্রজন্মের আধুনিকতাবাদী ঔপন্যাসিকেরা লেখালেখি শুরু করে। এরা ছিলেন একইসঙ্গে আঞ্চলিক ও বাস্তববাদী। হোসে লিনস দো রেগো বা হোর্হে আমাদু ব্রাজিলীয় সংস্কৃতি ও বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চাইছিলেন, আঞ্চলিক কথ্যভাষা প্রয়োগ করছিলেন, বাইরের সামাজিক জীবন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই ছিল তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রোসার রচনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অন্তর্মুখী, তিনি কথ্যভাষাকে ব্যবহার করলেন শুধুমাত্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেই নয়, জয়েসের মতো এক নতুন আখ্যানশৈলী সৃষ্টিতেও তাকে কাজে লাগালেন। 'সাগারানা' ব্রাজিলের গ্রামজীবনের রঙ্গমঞ্চ হয়েই শুধু রইল না, তা হয়ে উঠল সেই প্রতীকী ভূখণ্ড, মানুষের নিয়তি ও নিঃসঙ্গতার ভূমিকা যেখানে প্রবল হয়ে ওঠে।

এরপর প্রায় দশ বছর রোসা দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। ১৯৫৬ সালে একসঙ্গে প্রকাশিত হয় রোসার জীবনের মনুমেন্টাল দু'টি গ্রন্থ 'করপস দি ব্যালে' এবং 'দি ডেভিল টু পে ইন দি ব্যাকল্যান্ডস।' 'করপস দি ব্যালে' একটি বিশাল আয়তনের গ্রন্থ যাকে তিন পর্বে ভাগ করা হয়েছে। কেউ এই গ্রন্থকে বলেছেন 'উপন্যাস', কেউ 'গল্প', কেউ 'কবিতা।' পশ্চাৎপ্রদেশের মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক, পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্র ঘুরেফিরে এসেছে এইসব আখ্যানে। একটি আখ্যানের নাম 'উঁচু সমভূমির মাঠ।' এই আখ্যানের নায়ক এক সংবেদনশীল বালক, যার নাম মিগুইলিম। নৈতিকতা, আবেগজনিত ক্ষতি, প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি জটিল বিষয় নিয়ে সে ভাবনাচিন্তা করে। নিজের উপত্যকা ছেড়ে বাইরে যায়, সেখানে কেউ তার অঞ্চলকে বলে সুন্দর, কেউবা বলে কুৎসিত। কারও চোখে যা সুন্দর, তা-ই যখন কারও চোখে কুৎসিত হয়ে যায় তখন তা আসলে সুন্দর না কুৎসিত, তা-ই সে নির্ধারণ করতে চায়। শেষপর্যন্ত বালকটি এই দুই-য়ের মধ্যে এক প্রতীকী সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। এক গ্রাম্য চিকিৎসকের চশমা চোখে দিয়ে সে বুঝতে পারে, তার দৃষ্টি সীমিত হয়ে ছিল, এখন তা প্রসারিত হয়েছে, সে নতুন চোখে জগৎকে দেখছে এবং নতুন নতুন প্রশ্ন জেগে উঠছে তার মনে।

১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় রোসার চতুর্থ গ্রন্থ 'দি থার্ড ব্যাঙ্ক অব দ্য রিভার অ্যান্ড আদার স্টোরিস'। মোট একুশটি গল্প রয়েছে এই গ্রন্থে। অসম্ভব সব সংবেদনশীল শিশুরা এসেছে এর পাতায় পাতায়। এর সঙ্গে রয়েছে উন্মাদেরা। চিকিৎসাবিদ্যার চোখ দিয়ে দেখা উন্মাদ নয়। বরং এই উন্মাদেরা এক-এক জন দ্রষ্টা যারা নানা পরিবর্তনের দূত হয়ে এসেছে। এদের সাহায্যে রোসা প্রবেশ করেছেন অযৌক্তিক, অবাস্তব, জাদুময়, কাব্যিক জগতে। এই সংকলনের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পটিই হল 'নদীর তৃতীয় বাঁধ।' এই গল্পে একজন মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে ও একটি ছোট নৌকোয় চেপে নদীতে ভেসে যায়। দু'টি বাঁধের মধ্যেই তার যাবতীয় চলাচল। কাহিনির বক্তা ওই লোকটির পুত্র, পিতার দৃষ্টান্ত দেখে সে তাকেই অনুসরণ করবে বলে স্থির করে। নির্দিষ্ট মুহূর্তে সে ভয়কে জয় করে এবং পিতার মতোই নৌকোয় চেপে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। অজানা

ও অস্বাভাবিকের প্রতি মানুষের ভীতি ও আকর্ষণ মিশ্রিত মনস্তত্ত্বকেই রোসা তুলে ধরতে চেয়েছেন এই কাহিনিতে। তৃতীয় বাঁধ এখানে হয়ে উঠেছে মানুষের সৃষ্টিশীলতা, স্বাধীনতা ও উত্তরণের প্রতীক। উপন্যাসের পশ্চাৎপ্রদেশের বৃহৎ উপত্যকার মতো শাশ্বত নদীতে ভেসে যাওয়ার রূপকের মধ্য দিয়ে রোসা মানবিক অভিজ্ঞতার প্রবহমান ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় হয়ে ওঠাকে ধরতে চেয়েছেন।

রোসার প্রকাশিত শেষ গ্রন্থটির নাম 'তুতামিয়া।' ১৯৬৭ সালে এটি প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে, রোসার যাবতীয় আখ্যানের চাবিকাঠিগুলি এই সংকলনেই রয়েছে। এতে রয়েছে চল্লিশটি অণু-আখ্যান এবং চারটি প্রস্তাবনা। এই সরস ও দার্শনিক গ্রন্থে রোসা ননসেন্স বা অর্থহীনতার তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছেন। রোসা 'বিমূর্ততা সংক্রান্ত সত্যকাহিনি' বলে অভিহিত করেছেন একে এবং নাথিংনেস বা অস্তিত্বহীনতার সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করতে চেয়েছেন। বাস্তবতার কাব্যিক রূপান্তর কেমন হয়, উন্মত্ত মানুষের ভাবনায় বক্রতা নিয়ে কীভাবে তা প্রকাশ পায়, সরসভাবেই তাকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তিনি। এখানে আখ্যানগুলি সংক্ষিপ্ত, অনেকটা প্যারাবলের মতো। চরিত্রগুলির অবস্থান একেবারে যেন স্বাভাবিকতা ও মানসিক সুস্থতার সীমান্তে। মূলত চার ধরনের বিষয় এসেছে: বিভ্রম বনাম বাস্তবতা, অস্তিত্বহীনতা, ভাবনার বক্রতা ও ভাষাগত রূপান্তর। একটি আখ্যানে দেখা যায়, একজন উপত্যকাবাসী 'সভ্য' ব্রাজিলের জনৈক শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে অবিরামভাবে কথা বলে চলেছে। এক শ্বেতাঙ্গ অবস্থানকারী ও ভারতীয় মহিলার সন্তান সে। বন্য বেড়ালদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই সে নিযুক্ত হয়েছিল। কথা বলতে বলতে সে ক্রমে নিজেই বন্য বেড়ালের মতো হয়ে ওঠে এবং তার বাক্যে পর্তুগিজ শব্দ কমে আসতে থাকে, আধিক্য দেখা যেতে থাকে স্থানীয় টুপি ভাষার। গল্পের শেষে সব শব্দ মুছে যায়, বন্য বেড়ালের মতোই সে শুধু গর্জন করতে থাকে।

রোসার উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে গোটা ব্রাজিলে আলোড়ন পড়ে যায় এবং উপন্যাসটিকে অভিনন্দিত করে বলা হয়, 'ফার্স্ট মেটাফিজিক্যাল নভেল অফ ব্রাজিলিয়ান লিটারেচার।' উপন্যাসটির বিষয় ছিল, 'শয়তানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।' এই যুগান্তকারী গ্রন্থ সাহিত্য-সমালোচকদের যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। রোসার উপন্যাসের মূল চরিত্র ও বক্তা একজন প্রাক্তন 'জাগুনকো', নাম রিওবাল্ডো। ভাড়াটে বন্দুকবাজদের বলা হত 'জাগুনকো।' এই 'জাগুনকো'দের উত্থানের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৫০০ সালে পর্তুগিজরা

রোসার উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে গোটা ব্রাজিলে আলোড়ন পড়ে যায় এবং উপন্যাসটিকে অভিনন্দিত করে বলা হয়, 'ফার্স্ট মেটাফিজিক্যাল নভেল অফ ব্রাজিলিয়ান লিটারেচার।'

প্রথম ব্রাজিলে আসে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে তারা নানা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। সতেরো শতকের শেষার্ধ থেকেই তারা ব্রাজিলের ভিতরে ক্রমশ ঢুকতে শুরু করে। সান ফ্রান্সিসকো নদীর উপত্যকায় গড়ে ওঠে তাদের এক নতুন উপনিবেশ। এই উপত্যকাই রোসার উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এসেছে। এখানকার সমাজে ছিল মূলত দুই শ্রেণির মানুষ। যাদের জমি আছে এবং যাদের জমি নেই। গবাদি পশুপালনই ছিল তাদের মূল জীবিকা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধিপতির হাতেই ছিল সর্বময় ক্ষমতা। তারা ভাড়াটে বন্দুকবাজদের সাহায্যে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখত। সরকারের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। গোষ্ঠীপতিদের প্রতি যারা আনুগত্য দেখাত, তারা রক্ষা পেত। হিংসায় জর্জরিত দুনিয়ায় এই ধরনের আনুগত্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। সম্পত্তির সীমানা, সম্মানহানি, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার, পারিবারিক ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে বচসা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। এর পাশাপাশি ছিল স্থানীয় উপজাতি ও পলাতক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের হামলার আশঙ্কা। দশকের পর দশক ধরে গোটা উপত্যকাটি যেন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

১৮২২ সালে পর্তুগালের হাত থেকে ব্রাজিল স্বাধীনতা পায়। গোষ্ঠীপতিদের দ্বন্দ্ব কমার বদলে উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে। নিজেদের এলাকায় নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলিতে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তারাই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা। আর এসবের জন্য গোষ্ঠীপতিরা সকলেই নিজেদের বন্দুকবাজ বাহিনী গড়ে তোলে। পুরনো গণতন্ত্রের আমলে (১৮৮৯-১৯৩০) উপত্যকা এলাকায় রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ডাক পরিষেবা চালু হয়। কাহিনির গোড়াতেই রিওবাল্ডো ট্রেনে চড়ার উল্লেখ করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। ব্রাজিলের রাজবংশকে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রের সূচনার ফলে এক নতুন রাজনৈতিক যুগের আবির্ভাব হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় বিভিন্ন অঞ্চলে গোষ্ঠীপতিদের হাতে ক্ষমতা আরও

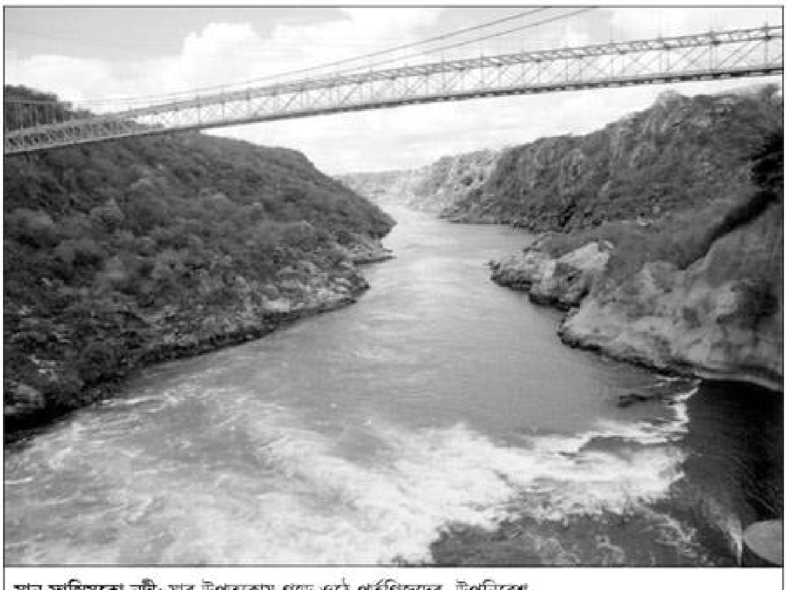

সান ফ্রান্সিসকো নদী: যার উপত্যকায় গড়ে ওঠে পর্তুগিজদের উপনিবেশ

বেড়ে যায়। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও দখলদারি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম আকার নেয়। বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নরেরা সরাসরি নির্বাচিত হতে এবং রাজস্ব আদায় করতে শুরু করে। ব্রাজিলের কৃষকদের জীবন কোনওদিনই সুখের ছিল না, এখন ভয়াবহ আকার নেয়। জমির দাম বেড়ে যেতে থাকে। জনসংখ্যা ও দুর্ভিক্ষ বেড়ে যাওয়ায় বহু মানুষ উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে থাকে।

এরকম অসন্তোষ ও অস্থিরতার সময় এই প্রথম বিভিন্ন অঞ্চলে ডাকাতদল গড়ে উঠতে থাকে। এই ডাকাতদেরই বলা হত 'জাগুনকো।' নেতার নামেই ডাকাতদলের অন্যান্য সদস্যরা পরিচিত হত। এরা যেমন সরকারি সৈন্য, তেমনই গোষ্ঠীপতিদের ভাড়াটে বন্দুকবাজদের সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। বিভিন্ন অবিচারের শিকার হয়েই এরা ডাকাত হত এবং সেইসব অবিচারের প্রতিবিধানে ডাকাতদল গড়ে তুলত। পরিস্থিতি অনুযায়ী এরা যেমন নির্মম আচরণ করত, তেমনই দয়ালু হয়ে উঠত। নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে এই ডাকাতেরা কিংবদন্তির মতো হয়ে উঠেছিল, তাদের নিয়ে তারা লোকসাহিত্য রচনা করত।

প্রবাদের মতো

শিক্ষক তিনি নন যিনি শিক্ষা দান করেন, বরং তিনি, যিনি সহসা নিজে শেখেন।

...

ছোট কাগজের নৌকোদেরও রসাতলে যাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

...

সত্য না কখনও যাত্রার শুরুতে জানা যায়, না গন্তব্যে পৌঁছে। সে আমাদের কাছে আসে যাত্রার মাঝপথে।

...

আমরা যা বুঝতে পারি না, কেবল সেসবই আমাদের জানা।

...

আমাকে যদি সতর্ক থাকতে হতো, তাহলে শুরুতেই আমার মধ্যে জন্ম নিত ভয়। সাহস অন্য ধরনের অনুশীলন থেকে আসে। তা হল, যা অসম্ভব তাতে তোমায় বিশ্বাস রাখতে হবে
— কেবল এই।

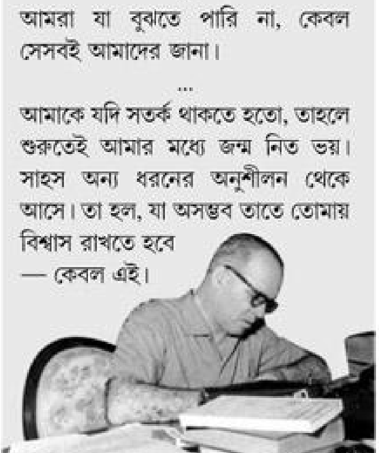

রোসার উপন্যাসটি আগাগোড়াই দু'টি মানুষের কথোপকথন। বক্তা মূলত অবসরপ্রাপ্ত 'জাগুনকো' রিওবাল্ডো। শ্রোতা একজন নামহীন শিক্ষিত শহুরে মানুষ। এই মানুষটি গোটা উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা দেখছে ও শুনছে সে সম্পর্কে নোটপত্র সংগ্রহ করছে। এই শ্রোতার সঙ্গে অনেকেই স্বয়ং রোসার মিল খুঁজে পেয়েছেন।

জমিমালিকেরা এদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে না পেরে রীতিমতো আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ১৮৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরপরই তারা এই ডাকাতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারকে চাপ দিতে শুরু করে। ডাকাতদলের সঙ্গে লড়াই চালাবার জন্য বিশেষ পুলিশবাহিনী গঠন করে সরকার। ফলে গোটা পুরনো গণতন্ত্রের সময়কালে সরকারি ও গোষ্ঠীপতিদের যৌথবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন ডাকাতদলের সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ব্রাজিলের ইতিহাসের এই অশান্ত সময়ের প্রেক্ষাপটেই রোসার উপন্যাস লেখা হয়েছে। যদিও রিওবাল্ডো কোনও নির্দিষ্ট সময়-তারিখের উল্লেখ করেনি, বর্ণিত ঘটনাবলিকেও নির্দিষ্ট কোনও ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি, তবু রোসার উপন্যাসের সময়কে নির্ভুলভাবে চিনে নিতে কোনও সমস্যা হয় না।

রাজনীতি ছাড়াও রোসার উপন্যাসে এসেছে ধর্ম। সরকারিভাবে ব্রাজিল একটি রোমান ক্যাথলিক রাষ্ট্র। কিন্তু স্থানীয় বহু ধর্মাচার মিলেমিশে ব্রাজিলের ধর্মচর্চার বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে। এইসব ধর্মাচারে রয়েছে নানা অতিপ্রাকৃত উপাদান, যা প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। রোসার উপন্যাসে বারবার এসেছে এইসব অতিপ্রাকৃত উপাদান। শয়তানের সঙ্গে চুক্তি হয়, ইউরোপের মতো ব্রাজিলেও এরকম জনশ্রুতি ছিল। এই চুক্তি হয় কোনও রাস্তার মোড়ে, মাঝরাতে, ঝড়ের মধ্যে বা গাছের তলায়। শয়তান কখনও বা আসে কোনও পশুর বেশে। গোটা উপন্যাসে রিওবাল্ডোকে তাড়িত করেছে একটিই প্রশ্ন। শয়তান আছে, না নেই! যদি থাকে তবে তার সঙ্গে আদৌ কোনও চুক্তি হয়েছে কিনা! শয়তানের ভূমিকা রোসার উপন্যাসে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এই উপন্যাসের শিরোনাম দেখেই বোঝা যায়।

রোসার উপন্যাসটি আগাগোড়াই দু'টি মানুষের কথোপকথন। বক্তা মূলত অবসরপ্রাপ্ত 'জাগুনকো' রিওবাল্ডো। শ্রোতা একজন নামহীন শিক্ষিত শহুরে মানুষ। এই মানুষটি গোটা উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা দেখছে ও শুনছে সে সম্পর্কে নোটপত্র সংগ্রহ করছে। এই শ্রোতার সঙ্গে অনেকেই স্বয়ং রোসার মিল খুঁজে পেয়েছেন। রিওবাল্ডো প্রায় স্বগতোক্তির মতো তিনদিনে তার মহাকাব্যিক জীবনের একের পর এক কাহিনি বলে যায়। শ্রোতা কদাচিৎ মন্তব্য করে, যা আন্দাজ করা যায় রিওবাল্ডোর প্রতিক্রিয়া থেকে। গোড়া থেকেই মনে হয় কাহিনিটি শেষ করার ব্যাপারে রিওবাল্ডোর যেন তাড়া আছে। অতীতের ঘটনাবলির তাৎপর্যকে সে বুঝতে চায়। যত সে অতীতের গভীরে ঢুকতে থাকে আখ্যানের দু'টি স্তর তত স্পষ্ট হতে থাকে। শয়তানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি। সঙ্গী জাগুনকো দিওদোরিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক। সময়ের ধারাবাহিকতাকে এখানে অনুসরণ করা হয়নি। স্মৃতিশক্তি ও অতীতকে বুঝতে চাওয়ার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুযায়ী সময় এগিয়ে-পিছিয়ে গিয়েছে। পটভূমি হিসেবে এসেছে জিরেইস প্রদেশের বিস্তৃত ও রহস্যময় এক প্রান্তিক উপত্যকা। এই পশ্চাৎপ্রদেশে রয়েছে জাদুকর পথিক, পুরাণ-প্রতিমা আর নানা কিহোতিক অ্যাডভেঞ্চার।

রিওবাল্ডোর বয়স যখন চোদ্দো, তখন এই কাহিনির শুরু। ওই বয়স থেকে বর্তমান বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত রিওবাল্ডোর জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস এই কাহিনির বিষয়। চোদ্দো বছর বয়সে রিওবাল্ডোর সঙ্গে এক রহস্যময় বালকের সাক্ষাৎ হয়। বালকটির প্রতি সে দুর্বোধ্য আকর্ষণ অনুভব করে। এই সাক্ষাৎ তার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। বালকটি একটি খরস্রোতা নদী অনায়াসে পেরিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা রিওবাল্ডোর মন থেকেও ভয়-ভীতি সমস্ত দূর করে দেয়। বালকটি অদৃশ্য হয়ে যায় ঠিকই, রিওবাল্ডোও সারা জীবনের মতো পাল্টে যায়। মা'র মৃত্যুর পর এক ধনী

জমিদার রিওবাল্ডোর দেখভালের ভার নেয়। এই মানুষটি জাগুনকোদের নানা রোমহর্ষক কাহিনি বলতে খুব ভালোবাসতেন। এই মানুষটির বাড়িতেই রিওবাল্ডো জীবনে প্রথম একজন আসল ডাকাতকে দেখতে পায়। এই ডাকাতটির নাম ছিল জোকা রামিরো। এর দলেই পরবর্তীকালে রিওবাল্ডো যোগ দেয়। কিছুদিন পরে আকস্মিকভাবে রিওবাল্ডো জানতে পারে এই ধনী জমিদারটিই প্রকৃতপক্ষে তার বাবা। অপমানে, ক্রোধে সে পালিয়ে যায় এবং বহু দূরে গিয়ে শিক্ষকতার জীবিকা নেয়। এখানেই ছাত্র হিসেবে তার কাছে আসে জি বেবেলো।

জি বেবেলো ছিল রাজনৈতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক যুবক। গোটা উপত্যকায় শান্তি-শৃঙ্খলা-উন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল সে। কিছুদিনের মধ্যে সে একটি নিজের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে এবং সেখানে তার সচিব হিসেবে যোগ দিতে রিওবাল্ডোকে আহ্বান জানায়। গোটা ব্যাপারটায় রিওবাল্ডো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা ও অবিরাম সফরের লোভে সে ওই দলে যোগ দেয়। কিন্তু একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সে ক্রমেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে একদিন সে পালিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ঠাঁই হয় শত্রুশিবিরে। এই নতুন দলে আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সেই রহস্যময় বালকটির। এখন অবশ্য সে আর বালক নেই, হয়ে উঠেছে এক সুপুরুষ যুবা 'জাগুনকো।' রিওবাল্ডোর মন আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে ঠিক করে, আর কখনও এই যুবাটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই সুপুরুষ যুবা, যার নাম দিয়াদোরিম, সেও তাকে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে এবং অকুণ্ঠভাবে রিওবাল্ডোকে নিজেদের দলে আহ্বান জানায়। এই দলটিরই নেতা ছিল জোকা রামিরো।

জে বেবেলো ও জোকা রামিরোর দলের মধ্যে একের পর এক সংঘর্ষ চলতে থাকে। জোকার এক সহচর ছিল হেরমোজিনেস। এরই নেতৃত্বে রিওবাল্ডোকে লড়াই করতে হত। হেরমোজিনেস ছিল এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। একদিকে এই লোকটির প্রতি তীব্র ঘৃণা, অন্যদিকে দিয়াদোরিমের প্রতি গভীর ভালোবাসা, এই দুই বিপরীত আবেগের টানাপোড়েনে রিওবাল্ডো ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল। দলের মধ্যে তিরন্দাজ হিসেবে তার সুনাম ছিল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্য দলে তার নাম হয়ে গিয়েছিল তাতারানা বা 'আগুনে শুঁয়োপোকা।' একবার এক সংঘর্ষে জে বেবেলো ধরা পড়ে, বিচারের জন্য তাকে নিয়ে আসা হয়। হেরমোজিনেস ও তার প্রধান অনুচর রিকার্ডো বেবেলোর মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। দিয়াদোরিম ও রিওবাল্ডো এর বিরোধিতা করে, বেবেলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সওয়াল করে। রিওবাল্ডো এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেয়। জোকা বেবেলোকে না মেরে নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘটনায় হেরমোজিনেস ও রিকার্ডো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বৈত স্রোতে ভাসতে ভাসতে রিওবাল্ডোও স্থির করে, সে-ও শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে। নিজের পৌরুষকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং দিয়াদোরিমের প্রতি নিজের ভালোবাসাকেও ভুলে থাকতে পারবে। মৃতদের সেই উপত্যকায় মাঝরাতে উঠে সে রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হয় এবং শয়তানকে আহ্বান করে।

ইতিমধ্যে সরকারি বাহিনী চারদিক থেকে জোকার দলকে আক্রমণ করে। জোকার দল ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতিআক্রমণ শানাতে থাকে। ইতিমধ্যে দিয়াদোরিম ও রিওবাল্ডো খবর পায়, হেরমোজিনেস ও রিকার্ডো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং এর ফলে জোকার মৃত্যু হয়েছে। প্রতিশোধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তারা হেরমোজিনেস ও রিকার্ডোকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের পিছু ছাড়ে না এবং একের পর এক ভুল হতে থাকে। জি বেবেলো ফিরে আসে এবং জোকার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। তারা যেন নরকে অধঃপতিত হয় এবং পালাতে পালাতে উপত্যকার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অজানা এক গ্রামে এসে হাজির হয় যেখানে সবাই মহামারীতে আক্রান্ত। বেবেলো সব আশা হারিয়ে ফেলে, রিওবাল্ডো হতোদ্যম হয়ে ওঠে। গুজব শোনা যায়, হেরমোজিনেস এত সফল হয়েছে কারণ সে শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ফলে তার শরীর দুর্ভেদ্য এবং সে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে।

আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বৈত স্রোতে ভাসতে ভাসতে রিওবাল্ডোও স্থির করে, সে-ও শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে। নিজের পৌরুষকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং দিয়াদোরিমের প্রতি নিজের ভালোবাসাকেও ভুলে থাকতে পারবে। মৃতদের সেই উপত্যকায় মাঝরাতে উঠে সে রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হয় এবং শয়তানকে আহ্বান করে। যদিও শয়তানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না এবং তার সঙ্গে কোনও চুক্তি হয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও রিওবাল্ডো নিশ্চিত হতে পারে না, কিন্তু সে ফিরে আসে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক মানুষ হয়ে। বেবেলোর হাত থেকে সে দলের নেতৃত্বভার নিয়ে নেয় এবং নিজের সাফল্য সম্পর্কেও নিঃসংশয় হয়ে ওঠে। মহাবিষধর সাপের মতোই সে চতুর ও নির্মম হয়ে ওঠে। ক্ষমতা যেন তাকে উন্মাদ করে তোলে। দিয়াদোরিমের প্রতি আকর্ষণও যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে চায়। ইতিমধ্যে দিয়াদোরিম জানায়, সে আসলে জোকা রামিরোর পুত্র এবং নিজের পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নানাভাবে আক্রমণ করেও হেরমোজিনেসকে পর্যুদস্ত করতে না পেরে শেষপর্যন্ত এক মারাত্মক কৌশল স্থির করে রিওবাল্ডো। এক ভয়ানক মরুভূমি, যাকে পেরোনোর কথা তার চিন্তা করতেও ভয় হত, তাকে অনায়াসে পার হয়ে আকস্মিক আক্রমণে হেরমোজিনেসকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়, রিকার্ডোকে মেরে

নিজের সম্পর্কে লেখক

যে-জীবনে আমি ইতিমধ্যেই বাস করেছি লেখায় তারই পুনরাবৃত্তি করি। এবং সেই দুটি জীবনের জন্য একটাই অভিধান যথেষ্ট নয়। অন্য কথায়, আমি সান ফ্রান্সিসকোয় বসত করা একটি কুমির হতে চাইব, কারণ আমি মহৎ নদীদের ভালোবাসি, কারণ তারা মানুষের আত্মার মতোই অতল। তাদের উপরিভাগ প্রাণবন্ত ও পরিষ্কার, কিন্তু গভীরে তারা প্রশান্ত এবং মানবযন্ত্রণার মতো অন্ধকারময়।

ফেলে এবং হেরমোজিনেসের স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে আসে।

সব হারিয়েও হেরমোজিনেস দমে যায় না এবং ছোট এক গ্রামে অপ্রস্তুত অবস্থায় রিওবাল্ডোর দলকে আক্রমণ করে বসে। উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। দিয়াদোরিম ও হেরমোজিনেস পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং শেষপর্যন্ত দিয়াদোরিম তাকে হত্যা করতে পারে। এরপরই দিয়াদোরিম অদৃশ্য হয়ে যায় এবং রিওবাল্ডো জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে জানতে পারে, দিয়াদোরিম মারা গিয়েছে। তাকে সমাধি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করার সময় আসল সত্য জানা যায়, যে সত্যের আভাস গোটা আখ্যানে বারবার রিওবাল্ডোকে ভাবিয়েছে। সে জানতে পারে, দিয়াদোরিম আসলে এক অসামান্য রূপসি নারী যে সর্বদাই ছদ্মবেশে থাকত। তার নাম আসলে মারিয়া দিওদোরিনা। জোকা চেয়েছিল, তার মেয়ে অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বড় হোক। ব্রাজিলে মেয়েরা থাকত পুরোপুরি পুরুষের অধীনে। তবে পুরনো গণতন্ত্রের অশান্ত সময়ে অনেক মেয়েই নিজের পরিবারের বেড়া ডিঙিয়ে 'জাগুনকো'দের দলে এসে যোগ দিয়েছিল। তাদের গল্পগাথা লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দিয়াদোরিমও শৈশব থেকেই পুরুষের ছদ্মবেশ ও ভূমিকায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

তার মৃত্যুর পর গভীর হতাশায় রিওবাল্ডো নিজের 'জাগুনকো' জীবন ত্যাগ করে, গভীর অসুস্থ হয়ে কিছুদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে, শেষপর্যন্ত সুস্থ হয়ে উঠে বাবার সম্পত্তি লাভ করে এবং স্থানীয় একটি মেয়ে ওতাসিলিয়াকে বিয়ে করে কৃষকের জীবন বেছে নেয়। এই অন্তর্মুখী আখ্যানের শেষে গিয়ে দেখা যায় অতীত রিওবাল্ডোর পিছু ছাড়েনি এবং সে এক গভীর অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে আছে। শুভ-অশুভের প্রকৃতিকে সে বোঝার চেষ্টা করে চলেছে। ভালোবাসার সাহস ঘৃণা করার সাহসের চেয়ে বেশি জোরালো কিনা, মনের গোপন তুলাদণ্ডে তা মেপে দেখতে চাইছে। আর এগুলিই তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে তার জীবনের গোটা আখ্যান। রিওবাল্ডো একদিকে যেমন আগাগোড়া খুঁজে গিয়েছে দিয়াদোরিমের প্রকৃত পরিচয়, অন্যদিকে যে প্রশ্নটি তাকে ক্ষতবিক্ষত করে গিয়েছে তা হল, শয়তানের সঙ্গে আদৌ তার কোনও চুক্তি হয়েছিল কি হয়নি, যার পরিণামে সাফল্য এল দিয়াদোরিম নামক স্বর্গের বিনিময়ে এবং তাকে নিক্ষিপ্ত হতে হল চিরস্থায়ী নরকে। ব্রাজিলের বন্য পশ্চিমের উপত্যকায় এভাবেই যেন ফাউস্টের কাহিনি পুনরুজ্জীবন পেয়েছে।

ব্রাজিলে মেয়েরা থাকত পুরোপুরি পুরুষের অধীনে। তবে পুরনো গণতন্ত্রের অশান্ত সময়ে অনেক মেয়েই নিজের পরিবারের বেড়া ডিঙিয়ে 'জাগুনকো'দের দলে এসে যোগ দিয়েছিল। তাদের গল্পগাথা লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দিয়াদোরিমও শৈশব থেকেই পুরুষের ছদ্মবেশ ও ভূমিকায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শৈশবে যে উপত্যকায় তার জীবন কেটেছে, তাকে কখনও ভুলতে পারেননি।

ভাষার অভূতপূর্ব ব্যবহার ও দার্শনিক বিশ্লেষণই এই গ্রন্থকে এক ভিন্ন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। এমনকী স্থানীয় পাঠকদের কাছেও এ এক জটিল ও দুর্বোধ্য গ্রন্থ। রিওবাল্ডোর আঞ্চলিক কথ্যভাষায় উঠে এসেছে পশ্চাৎপ্রদেশের বন্য উপত্যকার নানা রহস্য, বিশ্বাস, সংস্কার, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর জীবনযাপন। জীবনে বিভিন্ন পেশার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে রিওবাল্ডোকে। কখনও সে পশুপালক, কখনও বন্দুকবাজ, কখনও শিক্ষক, কখনও ধর্মগুরু— এদের ভাষা মিলেমিশে গিয়েছে তার বয়ানে। ভাষা, চরিত্র, ঘটনার সমন্বয়ে উপন্যাসটির সঙ্গে মধ্যযুগের মহাকাব্যগুলির সাদৃশ্য পাওয়া যায়, মৌখিক ও লিখিত লোকসাহিত্যের বহু উপাদানে যা সমৃদ্ধ হয়ে আছে। রিওবাল্ডো যেন সেই লোকগায়ক অতীতের নাইটসুলভ জীবনযাপনের বর্ণনা যে দিয়ে চলেছে। এই জীবনে তারা সমস্ত অবিচারের অবসান চেয়েছিল এবং তার জন্য শয়তানকে আহ্বান করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এইসব ডাকাতদলের নেতাদের আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ, সম্মানবোধ যেন মধ্যযুগীয় রোমান্সকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রোসা বহুবছর বিদেশে কাটিয়েছেন, বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু শৈশবে যে উপত্যকায় তার জীবন কেটেছে, তাকে কখনও ভুলতে পারেননি। বারবার এখানে তিনি ফিরে এসেছিলেন নিজের অঞ্চলে। দেড়শো মাইল দীর্ঘ গোটা উপত্যকায় টানা দশদিন ধরে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এইসময় গলায় বাঁধা নোটবুকে তিনি বহু নোট নিয়েছিলেন। ভূগোল ও ভাষা সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এইসময়ই এক বয়স্কা কথকের সঙ্গে রোসার সাক্ষাৎ হয়। সেই বৃদ্ধা ছিলেন এক লোকগায়িকা। তিনি রোসাকে অনেক লোককথা শুনিয়েছিলেন। রোসার উপন্যাসটি অবশ্য অঞ্চলকেন্দ্রিক হলেও বাস্তববাদী ধারার নয়। একে বরং একটি দার্শনিক গ্রন্থ বলা যেতে পারে যেখানে তিনি শুভ-অশুভ, সাহস ও ভয়, মৃত্যু ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও ভূগোলটিও আদ্যোপান্তভাবে এসেছে এবং হয়ে উঠেছে হিংসা ও আইন-লঙ্ঘনের কুটিল রঙ্গমঞ্চ।

কিন্তু মূলত এই উপন্যাসটি মানুষের অন্তর্জীবনের কাহিনি। বাইরের পরিসরটি যেন অন্তরের পরিসরের প্রতীক, যেখানে চলছে

একইরকম বিশৃঙ্খলা ও শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব। রিওবাল্ডো তাই বলে ওঠে, 'পশ্চাৎপ্রদেশ সর্বত্রই রয়েছে এবং এই জগৎটিই একটি পশ্চাৎপ্রদেশ।' এইভাবে সে যেন বলতে চায় তার আখ্যানের একটি প্রতীকী ও সর্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এবং সেই কারণেই 'কথন প্রক্রিয়া এত কঠিন।' জীবনে চলার পথে এত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে রিওবাল্ডো, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এত জটিল প্রক্রিয়া দেখেছে যে তাদের নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় আনতে ও তাদের তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে গিয়ে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে আখ্যানকে বিবৃত করার জটিলতাকে। সংশয় ও দ্ব্যর্থবোধকতা তাই আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে রাখে রিওবাল্ডোর বয়ানটিকে। নিয়তির প্রশ্নটিও তাকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছে। একটি ডাকাতদলের সর্দার হওয়াই তার কাছে নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল কিনা, এই প্রশ্ন সে বারবার নিজেকে করেছে। ভ্রাম্যমাণ যোদ্ধা হিসেবে যে বছরগুলি সে কাটিয়েছে সেই সময় সাহস ও ভয় একইসঙ্গে তাকে তাড়িত করেছে, নিজেকে হত্যাকারী ভাবতে গিয়ে অপরাধবোধে ক্লিষ্ট হয়েছে, শয়তান সত্যিই আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে তার সঙ্গে কোনও চুক্তি হয়েছে কিনা, এই ভাবনা কখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। কখনও সে শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে, কখনও বা বিশ্বাস হারিয়েছে, কিন্তু নিজের অতীত সম্পর্কে কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি, তার আত্মার পরিত্রাণ জুটবে কিনা, সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারেনি। যে দৃশ্যে শয়তানের সঙ্গে তার চুক্তি হয়, তা বরাবরই যেন অস্পষ্ট ও অমীমাংসিত থেকে যায়।

শিক্ষিত শ্রোতাটি সমস্তরকম সংস্কারমুক্ত এবং রিওবাল্ডোকে সে বারবার বোঝাতে চায় যে, শয়তানের কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আখ্যানের শেষে তার ঘোষণাটিও যেন অমীমাংসিত মনে হয়। বেশিরভাগ সমালোচকের মতে, রিওবাল্ডো চেয়েছিল তার আত্মার উত্তরণ। আর এই উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে গিয়েই তাকে শয়তানকে আহ্বান করতে হয়েছিল। উপন্যাসে সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাকেই দেখা হয়েছে একজনমাত্র বক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে। গোটা উপত্যকায় যেসব বন্দুকবাজ ঘুরে বেড়িয়েছে তাদের প্রত্যেকেই যেন অনুসন্ধানরত, একইসঙ্গে খুনি ডাকাত এবং ন্যায়প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী বীর। রিওবাল্ডোর চোখে হেরমোজিনেস একজন শয়তানের প্রতিমূর্তি, যদিও এ ব্যাপারেও সে পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারেনি। দিয়াদোরিমও তার কাছে কুয়াশার মতোই অস্পষ্ট হয়ে থেকেছে। তার প্রতি রিওবাল্ডো এক 'অসম্ভব ভালোবাসা'

> রিওবাল্ডোর ভাবনা ও বক্তব্যে মিশে গিয়েছে বহু উপাদান: খ্রিস্টীয় রোমান্স, গ্রিক আদর্শবাদ, হিন্দু দর্শন, বিজ্ঞান, অস্তিত্ববাদ। আর এসব মিলেমিশেই সত্য ও পরিত্রাণের জন্য তার অনুসন্ধান অব্যাহত থেকেছে। যোদ্ধা ও ভাবুক মিলেমিশে গিয়েছে রিওবাল্ডোর আত্মপরিচয়ে।

অনুভব করেছে। সমালোচকেরা বিভিন্নভাবে দিয়াদোরিমকে দেখতে চেয়েছে। কারও মতে সে এক দেবদূত যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে, কারও মতে সে স্বয়ং প্রলোভন, কারও মতে তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক প্লেটোনিক অতীন্দ্রিয়তা।

এই মহৎ গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে রোসা পর্তুগাল ও ব্রাজিলের লোকসংস্কৃতি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছেন। আধুনিক ও প্রাচীন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শন পাঠ করেছেন। রিওবাল্ডোর ভাবনা ও বক্তব্যে মিশে গিয়েছে বহু উপাদান: খ্রিস্টীয় রোমান্স, গ্রিক আদর্শবাদ, হিন্দু দর্শন, বিজ্ঞান, অস্তিত্ববাদ। আর এসব মিলেমিশেই সত্য ও পরিত্রাণের জন্য তার অনুসন্ধান অব্যাহত থেকেছে। যোদ্ধা ও ভাবুক মিলেমিশে গিয়েছে রিওবাল্ডোর আত্মপরিচয়ে। বারবার ভ্রমণের অনুষঙ্গ নিয়ে এসে রোসা যেন বলতে চেয়েছেন, বস্তুর নির্যাস প্রস্থান বা প্রবেশে নেই, রয়েছে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে প্রবহমান গতিতে। এই উপন্যাসে তাই মূল চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে অন্তবর্তী পরিসর ও ক্রমাগত অতিক্রম করে যাওয়া। একদিকে বন্দুকবাজরা উপত্যকার বিস্তীর্ণ পরিসরে একে অপরকে ও নিয়তির পিছনে ধাওয়া করে গিয়েছে, পাশাপাশি রিওবাল্ডোও তার কাহিনির বিস্তৃত পরিসরে প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির সন্ধানে অতিক্রম করে গিয়েছে একের পর এক অভিজ্ঞতা, চূড়ান্ত পরিণাম না জেনেই। উপন্যাসের শেষে গিয়েও দেখা যায় রিওবাল্ডোর সন্ধান সমাপ্ত হয়নি, বরং একটা অন্তবর্তী পরিসরে এসেই থেমেছে।

১৯৩০ সালে বিপ্লবের পর ব্রাজিলে পুরনো গণতন্ত্রের অবসান হয়। ১৯৩০-৪৫ সালে শক্ত হাতে দেশের হাল ধরেন গেতুলিও ভারগাস। নগরায়ণ, আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের জোয়ার আসে। কিন্তু ভারগাস শেষপর্যন্ত স্বৈরচারী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫ থেকেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য দেশের মধ্যে চাপ বাড়তে থাকে। ১৯৪৫-৬৪ সালে গণতন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। ১৯৫১ সালে ভারগাস জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকেন। ১৯৫৬-৬১ কালপর্বে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জাসসেলিনো কুবিতশ্চেক। ১৯৬১ সালে গড়ে ওঠে নতুন শহর ব্রাসিলিয়া। এই প্রথম ব্রাজিলের উপকূল ও পশ্চাৎভাগের এলাকাগুলির মধ্যে প্রকৃত অর্থে সংহতি গড়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকেও পশ্চাৎভাগের উপত্যকা-অঞ্চলগুলি উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। এতদিনে তাদের প্রান্তিক যাপনের অবসান হয়। গোষ্ঠীপতিদের প্রতাপ-দাপটেরও অবসান ঘটে। রোসা যখন এসব নিয়ে উপন্যাসটি লেখেন এবং ১৯৫৬ সালে সেটি প্রকাশিত হয়, তখন তা নেহাতই অতীতের ঘটনা। যদিও সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার একইরকম ছিল। গ্রন্থটি লেখার পরই রোসা হয়ে ওঠেন ব্রাজিলীয় সাহিত্যের নতুন দেবতা। সমালোচকেরা তাঁর উপন্যাসকে স্থান দেন 'দন কিহোতে' এবং 'ইউলিসিসে'র পাশে। উপন্যাসের ভাষায় তাঁরা শুনতে পান গ্যয়তে, দস্তয়েভস্কি ও ফ্লবেয়রের মিলিত স্বর।

রাহুল দাশগুপ্ত

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

নীলকণ্ঠ ঘোষাল

পর্ব ৪
অধ্যায় ৪

কুশধ্বজের হাত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠিয়েছে অম্বরিষ। ওটা আমার হাতে দিয়েই সাইকেলে উঠে রিং বাজাতে বাজাতে চলে গেল কুশো আমার গলি পেরিয়ে। দেওয়াল-ঘড়িতে দেখলাম দুটো বাজে। তার মানে কোনও বিশেষ ব্যাপারে অসময়ে আমাকে তলব দেওয়া হয়েছে। চিরকুটের ভাঁজ খুলতে গিয়ে দেখি এক জায়গায় একটু আঠা লাগানো। মানে, কুশোর এ-চিঠি পড়া বারণ ছিল। লেখা আছে— 'আমি স্কুল থেকে সোজা 'তারকা'য় যাব। তুমি অবশ্যই সাড়ে চারটেয় ওখানে এসো প্লিজ। খুব জরুরি। বিষয়টা মনে হয় বুঝতে পারছ। আলাদা কথা বলা খুব দরকার। — অম্বু।

অম্বরিষের এই জিনিসটাকে কী বলব? আন্তরিকতা? আমার ওপর ভরসা? নাকি কূটচাল? সাংগঠনিক ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলাটা নিয়ম বা বাধ্যতার মধ্যে পড়ে না। তবুও বলে। এই প্রথম নয়। আমি নেপথ্যশিল্পী— অ্যাসোসিয়েট মেম্বার। সংগঠনের আগামী কমিটি-নির্বাচনে আমার কোনও ভূমিকা নেই। সংগঠনের প্রকাশ্য-গোপন ওপর-নীচ ভাঁজগুলোর ভাগাভাগি নিয়ে আমার মনে ধোঁয়াশা আছে, তাই অনেক প্রশ্নও আছে। মোদ্দা যা বুঝি— এই সংগঠনটি শিল্পীদের, শিল্পস্রষ্টাদের। নাটকে যেমন 'গ্রুপ-অ্যাকটিং, সংগঠনে তেমনি 'গ্রুপ-ওয়ার্কিং'— কথাগুলো মহৎ ও দামি। যে কর্মীরা অভিনয় করে না, তারাও শিল্পী। শিল্পের স্বাদ ও বোধ না থাকলে এই সংগঠন তার জায়গা হয়ে উঠতে পারে না। কথা দু'টির মূল হল— সকলের জন্য এক, একের জন্য সকলে। এই 'এক' ও 'সকলে'র মধ্যে কোনও বিরোধ থাকলে বা জন্মালে তাকে তাড়াতে হয়, মুছতে হয়। গ্রুপ-অ্যাকটিং ও গ্রুপ-ওয়ার্কিংয়ের অন্তর্গত শৃঙ্খলার বোধবুদ্ধি দিয়েই তা করতে হয়। এদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল 'গ্রুপবাজি'। হ্যাঁ, উপদল যদি শিল্পনীতির ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তৈরি হয়, তা শিল্পকে ও সংগঠনকে বলবান করে। কিন্তু নিরেট ক্ষমতা ও নিছক সংখ্যা দিয়ে তৈরি হলে তা যে-কোনও সংস্থার সুন্দর বাগানকে কাঁটাঝোপে ভরে দেয়। এই সহজ সোজা কথাগুলো সবাই বোঝে। তবু শিল্পের এ-সংসারেও পরম আশ্চর্যের ব্যাপার হল— সবাই না হলেও অধিকাংশে কোনও না কোনও উপদলে ঢুকে পড়ে। না ঢুকে নাকি উপায় থাকে না। যে হতভাগা বা মাকড়া সোজারাস্তায় হাঁটা-চলায় অভ্যস্ত, বলতে পারি— আমার মতো, সে কারও কাছে কলকে পায় না। সে একা, হয়তো নিঃসঙ্গও। কিন্তু সে কখনই বিচ্ছিন্ন নয়। অন্য অনেকের চেয়ে বেশি সংহত ও সঙ্গতও। তবু অবধারিত কষ্টের হল— তার সাংস্কৃতিক

জীবনযাপন বড়ই হেনস্থার।

মনে আরও দু'একটি কথা ঘাই মারছে। অম্বরিষের এই ক্ষুদ্র অনাকাঙ্ক্ষিত চিরকুটটি আমার ভিতরে না-নেওয়া বা বর্জ্য মন্ত্রণাগুলি ফেলে রাখার যা জায়গাটা আছে, যা রাখতেই হয়, সেটা ঘেঁটে দেখতে প্ররোচিত করল। অতএব পাঠককে তার গন্ধ শোঁকাতেই হচ্ছে। তাঁদের মার্জনার সুযোগটি নিতেই হচ্ছে আমাকে।

যে কথাগুলি উঠে আসছে, তা হল এই প্রতিষ্ঠান খুবই কাজের জিনিস। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকতা বলতে যা বোঝায়, সেটি প্রতিক্রিয়াশীল, যা পরিহার করে চলা উচিত। প্রাতিষ্ঠানিকতা ব্যক্তির মূল্যকে ছোট করে, খাটো করে দেখায়। ব্যক্তিক শৈলীকে তার দুয়ারে ভিখিরি হতে হয়। প্রতিষ্ঠানের নজরে আসার জন্য তাকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। তাছাড়া সেখানে উপদল বেশি থাকলে তো গণতন্ত্রের লন্ডভন্ড অবস্থা হয়। দেখা গিয়েছে, সেখানে শিল্প জন্মালেও অনাদরে তাচ্ছিল্যে সে অচিরে অকালে মারা যায়, বা মার খায়।

অম্বরিষের চিরকুটখানা আমার মধ্যে যে ভাবনাগুলো উসকে দিল, তা আমার আঁতের কথা। সুযোগ পেয়ে তা বলে একটু হালকা হই।

'তারকাপুঞ্জে' এখন যা চলছে তাকে গণতন্ত্রের লুকোচুরি খেলা বললে কিছুটা সত্যি বলা হয়। কোন ভাষায় ব্যাপারটা বোঝানো যায় জানি না। কথায় আছে না— ধরি ধরি করি, তাকে ধরিতে না পারি! এখানে গণতন্ত্রের সেই অবস্থা। যখন কোনও বিষয়ে আলোচনা হয়, তখন শিল্পীদের নেতাসুলভ যে ভাষণ অম্বরিষ সচরাচর দিয়ে থাকে, তা শুনলে যে-কোনও মানুষের মনে হবে— আহা! কী সুন্দর! কী বিধি-বিধান মেনে এই টিমটি চলে! কী শ্রদ্ধা, কী ভালোবাসা নিয়ে মেম্বাররা সবকিছু মেনে চলে! কিন্তু তারা কি দেখতে পায়— কত মেম্বার সারাক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকে, কখনও কখনও কানে হাত চেপে ঘষে, ভাষণ শেষ হলে মাথা এমনভাবে তোলে, মনে হয় কেউ তার মাথা থেকে ভারী বোঝাটা নামিয়ে নিল? তারা কি দেখতে পায়— অনেকে শুনতে শুনতে হাই তোলে ও বারবার মুখে হাত চাপা দেয়? কিংবা বারবার অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নীরবে বলে— শুনছিস! গুরু কী দিচ্ছে! ওরা কেউ অসত্যকে বা ভণ্ডামিকে সহ্য করে, কেউ মন্তব্য করতে চায় এবং অন্যের সমর্থন চায়। ওদের চোখে তারই ছায়া কাঁপে।

ওরা কিন্তু প্রকাশ পেতে চায়, খোলাখুলি কথা বলতে চায়। ওরা শিল্পী হয়ে উঠতে চায়! হ্যাঁ, শতপুষ্পের মতো! ওরা অন্তরে চায়— 'শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব, হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।'

অম্বরিষ আমাকে দরজার কাছে দেখতে পেয়েই উঠে এসেছে। বোঝা গেল, ও সমস্যায় পড়েছে। এমন কোনও সমস্যা, যার সমাধানে আমার সাহায্য লাগবেই। আমার ভাবনা একটু ভারী হল। আর কাউকে ডাকেনি কেন? ওদিকের সকলে কি ওর দাঁড়ে এসে বসে গিয়েছে? তাহলে তো আমাকে ডাকার দরকার হত না।

তার কতটুকু আয়োজন করতে পেরেছে অম্বরিষ? শুধু আলোচনার আয়োজন, ভাষণের আয়োজন? প্রয়োগের আয়োজন কতটুকু? শুধু শৃঙ্খলার দড়ি ছড়ানোই বুঝি কাজ? যা ওদের পা জড়িয়ে ধরছে। এমনি করে ওরা শিল্পের শতেক পাপড়ির ছোঁয়া কি পাবে? নাকি ওরা শুকনো লঙ্কা, শুকনো বীজ হয়ে যাবে— যা থেকে আর কোনও নতুন অঙ্কুর বেরিয়ে আসবে না।

আমার ভাবনাটা খুব কড়া হয়ে গেল, না? তা বটে। শক্ত হলে চলবে না। দেখা যাক না, অম্বু কী বলে। পরামর্শ চায়, নাকি ওর কথা শোনাতে চায় শুধু। একতরফা শুনিয়ে রেখে পরে বলতে পারে— তোমার ওপিনিয়ন চেয়েছিলাম, তুমি দাওনি। এ-সব ছক করতে ও ওস্তাদ। যাই হোক, তেমনি নিছক ছকের গন্ধ পেলে, ওকে আমি একেবারে স্কট-ফ্রি হাঁটতে দেব না। বোঝা যাচ্ছে না, ও আরও কাউকে ডেকেছে কিনা।

না, অন্য কাউকে দেখা গেল না। আমি ইচ্ছা করেই দেরিতে এসেছি। অম্বরিষ আমাকে দরজার কাছে দেখতে পেয়েই উঠে এসেছে। বোঝা গেল, ও সমস্যায় পড়েছে। এমন কোনও সমস্যা, যার সমাধানে আমার সাহায্য লাগবেই। আমার ভাবনা একটু ভারী হল। আর কাউকে ডাকেনি কেন? ওদিকের সকলে কি ওর দাঁড়ে এসে বসে গিয়েছে? তাহলে তো আমাকে ডাকার দরকার হত না। না শুনে বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা।

একটু পরে ও আমাকে চমকে দিল। এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে আমার কাছে এগিয়ে এসে বসল অম্বরিষ। হঠাৎ আমার হাতদুটো ধরে বলল— আর দূরে নয়, এবার কাছে এসে বসো সঙ্কুদা।

ঘরে অন্য কেউ নেই, তাই জোরে হেসে ওঠার দরকার হল না। যে হাসিটা এল, তাতে আমার দেহটা দুলে উঠল বেশি। পুলকিত হয়ে বলে উঠলাম— একী রে অম্বু! যদি মহিলা হতাম, তাহলে কী করতিস?

এবার অম্বরিষ যে হাসিখানা হাসল, তার শেষে ওকে কাশতেই হয়। তাই হল, কাশতে কাশতে উঠে গিয়ে কলসি থেকে জল গড়িয়ে খেল। এসে নিজের জায়গায় বসল। সিগারেট ধরাল। দুটো টান মারার পর আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে দেখছিলাম। চোখে চোখ পড়তেই হাসলাম, মানে হাসতে হল। ও কী বলতে চায়? এই নিয়ে চিন্তায় ছিলাম।

দেখলাম, অম্বরিষের কপালে একটা ভাঁজ পড়েছে। ও আবেগে ভারী হয়ে বলে— এবার তোমাকে হাল ধরতেই হবে। তুমি সংগঠনের ভিতরে এসো। আমার নাটক লেখা যাতে বন্ধ না হয়, তার ব্যবস্থাটা কোরো সঙ্কুদা।

— এ-সব কথা কেন বলছিস বুঝতে পারছি না অম্বু। খুলে বল। কী হয়েছে কী? আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছি না— এভাবেই কথাগুলো বললাম।

আমি বুঝতে পেরেছি, রাজু ও মঞ্জু একটা মোক্ষম চাল দিয়েছে। সঙ্কর্ষণ নিশ্চয় সরে যেতে চেয়েছে। অনেকদিনের সভাপতি সে। মেম্বারদের কাছে তার এই পরিচয়টা ব্রান্ডের মতো হয়ে গিয়েছে। তার পদ থেকে চলে যাওয়ার কথা শুনলে তাদের জল্পনার মৌমাছিরা ভনভন করে উড়তে থাকবে। শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে অভিনয় ছেড়েছে সঙ্কর্ষণ। রাত জেগে জার্নি করে ও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে— এই ভেবে তাতে সবাই সায় দিয়েছে।

ঠিক তাই। অম্বরিষ বলল, তার সমস্যার কথা। বলল— সঙ্কর্ষণদা সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি চাইছে। এমনিতে বসন্তরা ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে কমিটির একটা পদ খালি ছিল। পূরণ করা হয়নি। এখন তা করতে হবে। তার ওপর সভাপতির পদ খালি হলে সমস্যা জটিল হবে। আমার চিন্তা হল— যদি সঙ্কর্ষণদাকে সভাপতি পদে থাকার জন্য বেশি ধরাধরি করি, ওরা মওকা বুঝে এমন দাঁও মারতে চাইবে, তাতে নিজেকে ওদের হাতে বেচে দিতে হবে। তা সম্ভব নয়। এই সংগঠনটার জন্য হাড়মাস শুকনো করে ফেলেছি। দাদা, আশঙ্কা দু'দিক

থেকে আসছে— এক, সভাপতি পদ থেকে তাকে ছেড়ে দিলে সাধারণ মেম্বারদের ক্ষোভের মুখে দাঁড়াতে হবে। দুই, ওই পদে থাকার জন্য সঙ্কর্ষণদাকে বেশি অনুরোধ-উপরোধ ইত্যাদি করলে ওরা বসন্তর খালি জায়গায় নিজেদের লোককে আনবার শর্ত চাপাবে। আমার ধারণা— ওরা ওই জায়গায় মনু অর্থাৎ মননকে আনতে চাইবে। তা হলে তো সাড়ে সর্বনাশ! আমার অনেক দিনের বড় ইচ্ছে— ওই জায়গায় মিতা, প্রমিতাকে আনব। মিতার অভিনয়ের ধার ও সংগঠনের কাজে ওর ঝোঁক ক্রমশ বাড়ছে। কমিটিতে আর একজন মহিলা থাকলে অভিনয়ের কাজে মহিলা শিল্পী জোগাড় করার ও সংগঠনকে জোরদার করার ব্যাপারটাতে উদ্দীপনা আনা যাবে। এই যুক্তিটা নিশ্চয় সঙ্কুদা, তুমি অস্বীকার করতে পার না। এটা করার একমাত্র রাস্তা হল— তোমার সভাপতি পদে আসা। তাতে সুধা-সঙ্কুদাদের ব্ল্যাকমেল করার ক্ষমতা কমবে। সঙ্কুদার জায়গায় তুমি সভাপতি হলে সভ্যরা অসভ্যতা করবে না। বরং বেশি খুশি হবে। কমিটিতে মিতাকেও আনা যাবে। আমার সাধের সংগঠন শক্তিশালী হবে তোমাকে পেলে। আমার হাত শক্ত হবে। তার মানে— আমি লেখার জোর পাব, নাটক উন্নত হবে, আমার প্রোডাকশন হবে ক্ষুরধার। আমার স্বপ্ন, তোমার বাসনার ফল ফলতে শুরু করবে— আমি নিশ্চিত। সুধা-সঙ্কুদাদের গ্রুপবাজি আস্তে আস্তে লোপাট হবে। ওরা ভেবেছে কী— আমার কলজে দিয়ে গড়া কলজে এই সংগঠন, এখানে আমাকে ওদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, নীরবে কাজ করতে হবে?

আমি ভাবিনি— অম্বরিষ এতটা ঝেড়ে কাশবে। বোঝা গেল ওর অবস্থাটা সত্যিই সংকটে। তবে এটা ওর নিজের মনগড়া। ওরা যা গুণ, ক্ষমতা, প্রতিভা যদি না-ই বলি, তা আর কারও নেই এই সংগঠনে। ও একাই নাট্যকার ও নির্দেশক। সকলে ওর গুণের ভক্ত। একটি বদনেশা— সবকিছু আপন খুশিমতো চালাবার নেশা ওকে পেয়ে বসেছে। এ-সব সভ্যরা মানবে কেন? সুধা-সঙ্কুরা সব ব্যাপারে ঠিক, এটা বলছি না। কিন্তু অম্বরিষকে আটকানোর ব্যাপারে ওদের যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। অম্বরিষ যাত্রাদলের অধিকারীর মতো হতে চায়।

এখন দেখছি, অম্বরিষ আমাকেও সংকটে ফেলল। ও আমার স্বাধীনতা নিয়ে নিতে চাইছে। অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হিসেবে সংগঠনে ভোট দেওয়ার অধিকার না থাকলেও, আমি যুক্তিতে খোলা মনে কথা বলার সুবিধে সুযোগ নিতে পারতাম, তার রাস্তায় ও কাঁটা বিছোতে চাইছে। ওরা স্বীকার করতে বাধ্য এবং সেটা করে যে, সংগঠনটির প্রতি আমার দরদ ভালোবাসা কারও চেয়ে কম নয়।

অম্বরিষের গুণের দিকে ভারি মনের টান আমার। তাই তো এখানে না ঘরকা না ঘাটকা হয়েও পড়ে থাকি। আমার মোটেই মানে লাগে না। কিন্তু ওই— ওর ওই মালিকানা আমার সয় না। মনে মনে বলি— ভিতর থেকে ওটাকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানো তোমার দ্বারা বোধহয় হবে না মালিক। ওই মালিকানা-বোধের কাছে তুমি নিজেকে বাঁধা দিয়েছ।

অনেকগুলো কথা বলার পর অম্বরিষ এখন চুপ করেছে। মাথা নিচু করে বসে আছে। ও ভাবছে নির্ঘাত— এতগুলো কথা বলে ফেলল, সবগুলো তার বলে দেওয়া ঠিক হল কিনা। তবে ও বিশ্বাস করে— ভরসা রাখে আমার ওপর— এটা আমি বুঝেছি। কিন্তু ওর এই আপাত-খোলামনের অফারটি নেওয়া যায় কি? ওকে আর একটু বোঝা দরকার।

— কী ভাবছিস অম্বু? কী করবি?

— এ তো দেখছি টিকে থাকার প্রশ্ন দাদা।

— যাঃ। তা কেন হবে। তোকে ছাড়া ওরা— ওরা নিজেদের তা ভাবেও না।

— তাহলে দিনের পর দিন পিছনে কাঠি দেবে! আর তাই নিয়ে আমি— না, এ হয় না। এ চলতে পারে না।

— আচ্ছা অম্বু, 'তারকা পুঞ্জে'র বাইরে তুই কিছু ভাবতে পারিস?

অম্বরিষ ছটফট করে উঠল। প্রায় প্রথমবারের মতোই বলে— তুমি— তুমি সভাপতির পদে এসে বসো। আমি আর কিছু ভাবব না, কথা দিচ্ছি। যদি কথাটা ধোপে টিকবে না তবু বললাম— তুই এটা ভাবছিস কী করে সঙ্কু সরে যাব? সবাই হাততালি দেবে?

ফোঁস করে ওঠার মতো বলে অম্বরিষ— কী করবে ওরা? আমি নিজে তোমার নাম প্রস্তাব করব।

— নানা ফ্যাকড়া তুলে বাগড়া দিতে পারে।

— কে দিতে পারে? তোমার নামের বিরুদ্ধে বলবে কে?

— কে বলবে জানি না। কিন্তু বলার অনেক কিছু আছে। ক্লাবের নিয়মাবলি আছে। আমি এমনই এক ব্যক্তি, যে সাধারণ সভ্যও নয়, যে কোনওদিন কমিটির মেম্বার পর্যন্ত ছিল না, সে কমিটি-মেম্বার হয়ে গেল, তার ওপর একেবারে সভাপতির পদে বসবে? এটা অশোভন, অন্যায্য।

— মোটেই অন্যায্য নয়। তোমার মতো ট্যালেন্টেড মানুষকে পেলে যে-কোনও সংস্থা বর্তে যাবে। আমার সংগঠনে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে শোভনতার কথা তুলবে, অন্যায্য বলবে?

— ধর, কেউ না কেউ বলল, তাতে আমার মান থাকবে কোথায়? ধরে নিলাম অনেকেই তোকে সমর্থন করল। তাহলেও শুধুমাত্র মেজরিটির সাপোর্টে আমি—

— আঃ। আমি বলছি, কেউ কিছু বলবে না। বললে তাকে আমার নাটকে আর দেখা যাবে না, ক্লাবেও না। অম্বরিষকে দেখতে দেখতে ভাবলাম, মনে মনে বললাম— এইরকম কথা যে ব্যক্তি অবলীলায় উচ্চারণ করে, সেই অম্বরিষের বানানো ও সাজানো চেয়ারে বসতে মন যে আমার হয় না রাজি। অম্বরিষের গুণের দিকে ভারি মনের টান আমার। তাই তো এখানে না ঘরকা না ঘাটকা হয়েও পড়ে থাকি। আমার মোটেই মানে লাগে না। কিন্তু ওই— ওর ওই মালিকানা আমার সয় না। মনে মনে বলি— ভিতর থেকে ওটাকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানো তোমার দ্বারা বোধহয় হবে না মালিক, স্বভাবে তোমার কুলোবে না কোনওদিন। ওই মালিকানা-বোধের কাছে তুমি নিজেকে বাঁধা দিয়েছ অম্বরিষ।

একটু জোক করে ব্যাপারটাকে হালকা করতে চাইলাম। বললাম— তুই প্লাস মাইনাসের অঙ্ক করবি বলছিস, অম্বু?

একটু হাসলামও। অম্বরিষের হাসি বুঝি তাতে মদত পেল। হাসতে হাসতে বলল— তুমি তো বোঝ গুরু। এই অঙ্ক না জানলে সংগঠন রাখা যায়! তুমি রাজি হয়ে যাও গুরু।

অম্বরিষের 'গুরু' ডাক শুনে আমার মুখে একটা কড়া কথা এসে গিয়েছিল। দুই ঠোঁট চেপে আটকে রাখলাম। যাই হোক, ওকে ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার।

— অম্বু, ধর আমি রাজি হলাম। কীভাবে কী করবি? মানে কমিটিতে তোর মেজরিটি কীভাবে হবে?

— তুমি সাপোর্ট দিলে খুব মজা।

— কীরকম? এখন কে কোনদিকে আছে বলতো?

একটু ভেবে নিয়ে অম্বরিষ বলল— এখন তো টালমাটাল। সুধা দুইদিকে খেলছে। এদিকে রাজু, তপা আর আমি।

— হুঁ। রাজুকে বাদ দিলে তপা, মানে তপোব্রত তোর দিকে—

— টু হানড্রেড পার সেন্ট।

— সেটা জানি। তাহলে সঙ্কু সরে গেলে সুধাকর একা হয়ে যাবে বলছিস?

— ওই সুধা— আমার এই সেক্রেটারিটা হয়েছে ব্যাটা মহাসুবিধেবাদী।

— বসন্তর জায়গায় কাকে আনবি ঠিক করেছিস? শেখর, না বিমানকে? কথাটা ইচ্ছা করেই বললাম।

চট করে মাথা তুলল অম্বরিষ। বলল— না না, ওরা টু-জুনিয়র। তৈরি হোক। ওদের মধ্যে— ওদের মধ্যে ম্যাচিওরিটি হয়েছে একমাত্র মিতার। একটু ন্যাকামি করলাম— কে? মিতা! মানে প্রমিতা?

— হ্যাঁ দাদা, তোমার আদরের পমি। মিতা ইজ নাউ কোয়াইট ফিট— ফিট টু বি ইলেকটেড অর সিলেকটেড, যা-ই বলুন, অ্যাজ কমিটি মেম্বার। কিছু না বলে অম্বরিষের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ পড়তে লাগলাম। হাসি এবং গদগদ ভাবটাকে আটকে রাখার চেষ্টা করছে চতুর নাট্য-নির্দেশক। কিন্তু পারছে না। এই প্রথম আমার ভিতরে একটা জ্বলুনি এল। ওর ব্যাপার অজানা নয় আমার। তাই সামলে নিলাম। সাবলীলভাবে বলে ফেললাম— এ-জন্য আমাকে সভাপতি করার কসরত করতে হবে না। ও এমনিতেই হয়ে যাবে।

— অ্যাঁ? হয়ে যাবে? বলছ?

জ্বলুনিটা এবার বেড়ে গেল। বুঝতে দিলাম না। হয়ে-যাবে বলছ? ওর এই কথাটার মানে হল— যদি তা হয়েই যায় এমনিতে, তাহলে তোমাকে খামাকা সভাপতি হওয়ার জন্য সাধাসাধি করার কী মানে হয়!

অম্বরিষ বলে যাচ্ছে— দাদা, ভাবছিলাম— তোমার মুখ দিয়ে মিতার নামটা প্রপোজ করাব। ওর ওয়েট বেড়ে যেত। কেউ আর এগেনস্টে কিছু বলতেই পারত না। তা— তুমি ভরসা দিচ্ছ যখন—

হঠাৎ গড়গড় করে বলতে শুরু করলাম— তুই নিজে প্রপোজ করবি ওর নাম। লজ্জা কীসের? ফালতু। ওর নামে কোনও অবজেক্শন দেবে না কেউ। দলের নীলমণি সুন্দরী হিরোইন! বিরোধিতা করার সাহসই করবে না— কেন না যদি হিরোইনের মানে লাগে! যদি দল ছেড়ে দেয়! তাহলে সব দোষ তো সেই হতভাগার মাথায় চাপবে। এই বোকামি কেউ করে! এমন বোকা তোর

তুই নিজে প্রপোজ করবি ওর নাম। লজ্জা কীসের? ফালতু। ওর নামে কোনও অবজেক্শন দেবে না কেউ। দলের নীলমণি সুন্দরী হিরোইন! বিরোধিতা করার সাহসই করবে না— কেননা যদি হিরোইনের মানে লাগে! যদি দল ছেড়ে দেয়! তাহলে সব দোষ তো সেই হতভাগার মাথায় চাপবে। এই বোকামি কেউ করে! এমন বোকা তোর যাত্রাদলে কেউ নেই রে মালিক।

যাত্রাদলে কেউ নেই রে মালিক।

আমার একটানা কথার সঙ্গে অম্বরিষ হ্যা-হ্যা করে হাসতে হাসতে খুব মাথা নাড়ছিল। শেষে গলা ছেড়ে হাসল।

ভাবছি— আমি ওভাবে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললাম কী করে এবং কেন? বলা শেষ করে বসে থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। অম্বরিষের হাসি শুনতে শুনতে পালিয়ে গেলাম বাইরে। বাইরে বসলাম। বুঝতে পারলাম— ভিতরের জ্বলুনিটার জ্বালায় কথাগুলো ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছিল।

আমি বাইরে, অম্বরিষ ভিতরে। কতক্ষণ নীরবে বসেছিলাম কে জানে। কখন সময় হয়েছে, মেম্বাররা আসতে শুরু করেছে। কে কে যেন এসে ঢুকে গেল। তাদের মুখের দিকে চাওয়া বা কথা বলার কোনও খেয়াল ছিল না আমার। কাকে যেন বললাম— এই, বলে দিবি তো আমার শরীরটা ভালো লাগছে না, বাড়ি চলে যাচ্ছি।

এমন কথায় কে কী ভাববে বা অম্বরিষ কী মানে করবে, সেটা ভাবতে আমার বয়ে গিয়েছে, এমনই এক মেজাজ নিয়ে চলে এলাম।

পারলাম না, নির্লিপ্ত তো নয়ই, উদাসীনও থাকতে পারলাম না। অথচ এমন সব ব্যাপারে 'আমার যেমন বেণি তেমনি রবে চুল ভেজাব না'— এই পলিসিটা বেশ ভালো। কী করব! স্বভাবটা হয়ে গিয়েছে প্রোঅ্যাকটিভ।

সঙ্কু ও সুধাকে একটু অন্যভাবে বিষয়টা জানাতে হল, ওরা তো প্রায় হত্যে দিয়ে পড়ল আমার কাছে। ওদের কথা হল— কিছুতেই টিমটাকে অম্বরিষের পকেটে চলে যেতে দেব না, অন্যদিকে সংগঠনটা ভেঙে যাক— এটাও সইব না। আমার প্রশ্ন— তাহলে কী করবি? ওদের জানিয়ে দিলাম— মিতাকে নিয়ে এসে অম্বরিষ দল ভারী করে নিতে পারে। ওরা বলল— মননের নাম ওরা প্রপোজ করবেই। অন্য দিকে আর একটা কাজ হল— মিতাকে কমিটিতে আনার চেষ্টা হবে শুনে সঙ্কু বলল— তাই নাকি! তাহলে আমি সরছি না। সুধারা লাফিয়ে উঠল।

পর পর তিনটে সিটিং করতে হয়েছে গোপন জায়গায়। ভারি অনিচ্ছাতেই করতে হল। টালমাটাল সংগঠন যাতে না ডোবে, তার ব্যবস্থা করতে আমাকে একদিকে দাঁড় ধরতেই হল।

হিরোইনকে কোলের কাছে নিয়ে আসছে শুনে সুধাকর বলে দিয়েছে— ইয়ে রুখেঙ্গে ইয়া ক্লাব ছোড়েঙ্গে।

আমি শুনে ওদের বললাম— সর্বনাশ। সুধাকে এমন কথা বলতে বারণ করো। মিতা অবশ্যই গ্রুপের ভ্যালুয়েবল আর্টিস্ট। বাইরে তার বদনাম হবে, এমন কথা বলা চলবে না।

অন্তরের তাগিদে সুধাকরকে নিয়ে এক জায়গায় বসলাম। ওকে বোঝালাম— দেখ সুধা, গ্রুপের কাছে অম্বরিষ যেমন অপরিহার্য, বলতে পারিস সংগঠনের অস্তিত্বের জন্য, ইদানীং প্রমিতাকেও ভীষণ দরকার। ওকে কমিটিতে আনলে খারাপ হবে না। সমস্যা একটা অন্য দিকে জন্ম নেবে। কড়া নজর রাখতে হবে। যেটা আপত্তির বিষয়, তা হল— প্রমিতা বনাম মননের ব্যাপারটা। এটা কেন হবে? কেন ওরা দু'জনেই আসবে না!

সুধা উৎসাহে বলল— ঠিক, একেবারে ঠিক। মনন ও প্রমিতা দুজনেই আসুক কমিটিতে।

— অসুবিধে হচ্ছে তো।

— কেন?

— ওটা কেবল হতে পারে সন্ধু সরে গেলে।

— সেটা কি ভালো হবে?

— হবে না। কমিটি হল সাতজনের' ক্যান্ডিডেট আট, কাকে বাদ দেওয়া যায়, সেটাই তো সমস্যা। একটু চুপ করে থেকে সুধাকর বলে ওঠে— কনটেস্ট হোক। হয় এসপার, নয় ওসপার।

জিজ্ঞাসা করলাম— কীসের এসপার ওসপার?

সুধা বলল— ওদের নাম ভোটে দেওয়া হোক। যে জিতবে—

— এমন হয়? নাকি হয়েছে কখনও? কমিটির অন্য সবাই আসবে আলোচনার মাধ্যমে, অন্য দিকে দু'জন মেম্বারের মধ্যে লড়াই হবে, এ— হয় না।

সুধা আবার চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে একইরকমভাবে বলে— কমিটির মেম্বার বাড়ানো হোক। হোক আটজন। দু'জনেই এসে যাক। মন্দ হবে না।

এবার আমাকে একটু চুপ করে ভাবতে হল। দেখলাম সুধাকর খুশির হাসি নিয়ে আমাকে দেখছে।

একটু পরে বললাম— তাতে ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না রে।

— কেন?

— বিজোড় সংখ্যার হতে হবে কমিটিকে অথবা সংখ্যাটা তিনভাগে ভাগযোগ্য হতে হবে। নাহলে মুশকিল।

— হ্যাঁ, তাই তো। আরও একজনকে নিতে হবে! সেটা আবার কে-টা হবে?

— সেটা-কেটা করে লাভ নেই। সমস্যা বাড়বে।

একটু থেমে সুধাকরকে দেখলাম। ওর দিকে চেয়ে থেকে বললাম— তোকে একটা কথা বলব সুধা?

— হ্যাঁ বল।

— তুই যদি সব ব্যাপারে সন্ধু আর রাজুর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজকম্ম করিস, তাহলে—

— করি তো।

— অমন করে না, পুরো ভর দিয়ে।

এবার সুধাকর বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে— নামেই সম্পাদক। কাজ তো করে নাট্যকার— পরিচালক। আমি নৈবেদ্যের ওপর বেলপাতা।

— সেটাই বদলাতে হবে। ওরা দু'জন সবচেয়ে পুরনো লোক। রাজু সেরা অভিনেতা। ওদের পরামর্শ নিয়ে করলে তোর হাতে অনেক কাজ এসে যাবে। ঠিক ঠিক সম্পাদকের—

কথাটা শেষ না করে ওর দিকে তাকালাম। চাইলাম বাকি কথাটা ও বলুক। সুধাকর একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলল— ঠিক।

— তবে একটা কথা বলে দিই সুধা, তোকে তো দু'পক্ষই ভাবে তুই তাদের লোক, তাই না?

কথাটা শুনে সুধাকর ক্ষুণ্ণ হল না, বরং অদ্ভুত একটা খোলা হাসি হেসে ফেলল। বললাম— বেশ। তাহলে ওদের দু'পক্ষের কাছেই ওইরকম সহবত-তরিবতটা মেনটেন করে যা, কেমন! যা বলব, করবি কিন্তু। একইরকম হাসতে হাসতে সুধাকর মাথা নাড়ে। মনে মনে ভাবলাম— দেখি, তুমি আমার কিস্তিমাতের ঘোড়া হতে পার কিনা।

সাধারণ সম্মেলনের দিন যত এগিয়ে আসতে থাকল, আমি তত ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। সম্মেলনে অবশ্যই থাকব, যেমন থাকি। দস্তুরমাফিক একটা লেকচার দিতে হয় দিই। কিন্তু সপক্ষে বিপক্ষে মতামত দেওয়ার লোক নই অর্থাৎ ভোটিং রাইট নেই আমার। এটাকে আমি বলি— আঃ। কী আরাম! বাঁচা গেল! কাছের দূরের বিভিন্ন সংস্থার লোকজন আসে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। ভালো খাওয়া দাওয়া হয়, সকলকে একটা করে কিছু উপহার দেওয়া হয়।

কমিটির সভা চলছে ভিতরের ঘরে দরজা বন্ধ করে। কেন এই ফিসফিস গুজ-গুজের আয়োজন? শৃঙ্খলা! নাটুকেপনা না করলে কি শৃঙ্খলা থাকে না? নাটকীয় হাবভাব দরকার হয় নেতাদের কেতা রাখার জন্য। অন্তরঙ্গে ভাবনা-চিন্তায় সুস্থ শৃঙ্খলা রাখতে জানলে বা তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলে কোনও দেখনদারির দরকার হয় না। বহিরঙ্গে সেই শৃঙ্খলা জন্ম নেয় আপন প্রাণের উৎস থেকে।

তবে কখনও অম্বরিষ, কখনও স্বরাজের তলব পেয়ে এখানে-ওখানে গিয়ে বসতে হয়েছে। এই ফুসুর ফুসুর, কথা চালাচালি, প্যাঁচপয়জার আমার ভালো লাগে না। সবচেয়ে কষ্ট হয় কথা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটাতে। কোনটা লুকব কোনটা বলব— এসব ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মতালু কিলবিল করে। আরও ন্যক্কারজনক ব্যাপার হল— অম্বরিষ ও স্বরাজের পরিবার তো বটেই, অন্য কমিটি মেম্বারদের পরিবার নিয়ে আলোচনা-মন্তব্য হতেই থাকে কারণে-অকারণে। অকারণ আলোচনাতে সমালোচনাটাই হয় বেশি। এড়িয়ে থাকার শত চেষ্টা আমার নিষ্ফল হয়ে যায়। কষ্ট হয় বেশি অম্বরিষকে দেখে। এইরকম গপ্পগুজবের দিকে ওর ঝোঁক বিরক্তিকর।

'তারকা-পুঞ্জে'র সম্মেলন যেমন হওয়ার তেমনি হল। বক্তৃতা-ভাষণ এবং পুরো শৃঙ্খলার মধ্যে রিপোর্ট ও হিসেব পেশ ও আলোচনা— গ্রহণ-বর্জন-সমর্থন প্রস্তাব-গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় রীতিসম্মতভাবে, যা আমার মনে হয় একান্তই যান্ত্রিকভাবে, সমাধা হল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও অর্থাৎ বিদায়ী কমিটির প্রস্তাবমতো আগামী কমিটির প্যানেলটিও বিপুল হাততালির মধ্যে গৃহীত হল যথারীতি কোনওরকম অদল-বদল বা যোগ-বিয়োগ ছাড়াই। এটাও যান্ত্রিক ভঙ্গিতে প্রসবিত একটি ব্যাপার।

তবে যে নাটুকে কায়দা কসরতের মধ্যে ওই প্যানেলটির প্রজনন ঘটেছিল, সেটা নেহাত যাতনাহীন ছিল না। ওই নাটুকে দৃশ্যপটটির সচক্ষু দর্শক আমি ছিলাম না। বরাতির বার্তায় শোনা। সে-কথাই এখন বলার।

কমিটির সভা চলছে ভিতরের ঘরে দরজা বন্ধ করে। কেন এই ফিসফিস গুজ-গুজের আয়োজন? শৃঙ্খলা! নাটুকেপনা না করলে কি শৃঙ্খলা থাকে না? নাটকীয় হাবভাব দরকার হয় নেতাদের কেতা রাখার জন্য। অন্তরঙ্গে ভাবনা-চিন্তায় সুস্থ শৃঙ্খলা রাখতে জানলে বা তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলে কোনও দেখনদারির দরকার হয় না। বহিরঙ্গে সেই শৃঙ্খলা জন্ম নেয় আপন প্রাণের উৎস থেকে।

সভা শুরুর আগে চা ও ধূমপান করার মধ্যে নানা কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা চলল অনেকক্ষণ। কমিটির মিটিং আছে জেনে অনেক সভ্যই আসেনি। যে ক'জন ছিল তারাও যোগ দিয়েছিল পান-পর্বে।

সভাপতি সভা শুরু হোক বলামাত্রই তপোব্রত উঠে গিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সাধারণ সভ্য যারা ছিল, তাদের দিকে তাকাল গম্ভীর হয়ে। কিছু বলার দরকার হল না— অতিরিক্ত জনেরা নিঃশব্দে বাইরে চলে গেল।

সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয় ঘোষণা করল ও সম্পাদককে তার কথা পেশ করতে বলল। সম্পাদক কথা শুরু করতে যেতেই নাট্যকার-নির্দেশক অম্বরিষ গলায় কিছুটা ভার চাপিয়ে বলে— আমার একটা বক্তব্য ছিল। সভাপতি বলল— আপনার বক্তব্য কি এই আলোচ্য বিষয়ের ওপরে? অম্বরিষ বলল— সংগঠনের সামগ্রিক বিষয়ে। এই আলোচ্যের সঙ্গেও তার প্রসঙ্গ আছে।

সভাপতি সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল— তাহলে আপনি সম্পাদকের বলার পরে বলুন। আলোচনার সুবিধে হবে। সম্পাদক, বলুন।

সম্পাদক যেন এখন একপায়ে খাড়া হয়েই ছিল। পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে নিয়ে বলল— সভাপতিমশাই, আমি কোনও ভাষণ দেব না। আমরা আমাদের বক্তব্য দিনরাত মানুষের কাছে বলছি আমাদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মানুষকে বলার আগে তো নিজেদের শোনাচ্ছি অহরহ। সে-কথা আর এই দরজা-বন্ধ ঘরে নতুন করে বলার কিছু নেই।

দারুণ! কথাগুলো শুনে মনে মনে বললাম— যাকে সবাই 'এলেবেলে' বলে সেই সম্পাদক সুধাকর আজ নাট্যকার-নির্দেশকের দাবার চালটাকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল! একদম ঠিক করেছে। বক্তৃতায় বাজিমাত করার কথামালাকে ছিবড়ে করে ফেলেছে অম্বরিষরা। মানুষ আর তাকে কানে তুলছে না, মনে নিচ্ছে না। নেবে না-ই তো, কাজের সঙ্গে কথার মিল নেই যে! ওই 'এলেবেলে' ছেলেটার কথায় তারই ঝংকার।

ধীরে কিন্তু শক্ত গলায় সম্পাদক সুধাকর প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যদের নামগুলো পড়ে শোনাল এবং সমর্থন চাইল। বলল— আপনারা বলুন, এই নামগুলি আমি বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে সম্মেলনে প্রস্তাব করতে পারব কিনা।

সভা নীরব। সভা বলতে ছ'জন— অম্বরিষ, সঙ্কর্ষণ, স্বরাজ, সুধাকর, তপোব্রত ও ধারা। সকলের মুখ নিচু, কেবল অম্বরিষের চোখ বার বার তিনজনের মুখের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে— তারা হল সঙ্কু, রাজু ও সুধা। তপা ও ধারার দিকে তাকাবার দরকার কী তারে!

হঠাৎ একটু কেশে নিয়ে অম্বরিষ সভাপতি সঙ্কর্ষণকে দেখে এবং বলে— সভাপতিমশায়ের কি কোনও বক্তব্য আছে, মানে নিজস্ব বক্তব্য?

সভাপতি সঙ্কর্ষণ একটু নড়েচড়ে শক্ত হয়ে বলে— না তো। এক্ষেত্রে নিজস্ব বক্তব্যের কোনও সুযোগ আছে কি?

— না, মানে যদি থাকে, তাই বলছিলাম। অম্বরিষ অপ্রস্তুত।

— এটা উপযাচনা, এটা করা যায় না। কারও বলার থাকলে তিনি নিজেই বলবেন। সভাপতি? স্বরাজের সরল মন্তব্য।

সভাপতি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই বলে— না, নেই। এখন আপনারা বলুন, সম্পাদকের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে আমরা গ্রহণ করতে পারি কিনা?

অম্বরিষ ভারী গলায় বলে ওঠে— আমাদের একটি নিয়মভঙ্গ হচ্ছে, সভাপতি।

— কীসে? সভাপতির প্রশ্ন।

অম্বরিষ বলল— কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য রাখার কোনও নিয়ম নেই।

সভাপতি বলল— নিয়ম আছে। আমাদের কমিটিতে আগে রাখা হত না। এখন প্রস্তাব করা হয়েছে। যাকে রাখা হয়েছে তার যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আপত্তি আছে কি?

সম্পাদক বলল— সংগঠন ছেড়ে দেওয়া বসন্তর জায়গায় প্রমিতার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে সঙ্গত ভাবেই। প্রমিতা প্রধান অভিনেত্রী। কমিটিতে তার উপস্থিতি দরকার। অন্য দিকে মনন অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ও সাংগঠনিক বিষয়ে অভিজ্ঞ। তার ভূমিকা মূল্যবান। তাই কমিটির সদস্যসংখ্যা সীমিত রেখেই তাকে স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসেবে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে কমিটি শক্তিশালী হবে বলে সভ্যরা মনে করে।

দু'দুটো পয়েন্টে অভাবিত ধাক্কা খেয়ে অম্বরিষ জড়ো হয়ে বসেছিল। এখন কটমট করে তাকায় তপোব্রত ও ধারার দিকে। তার ইচ্ছা ওরা কিছু বলুক। কিন্তু সে জানে, এই যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো লোক ওরা নয়। একটা অপ্রকাশ্য যন্ত্রণা অম্বরিষকে কামড়াচ্ছে বোঝা যায়।

সম্পাদকের প্রস্তাব গৃহীত হল আপাতসর্বসম্মতিতে।

পরের দিন ক্লাবে আনন্দ হিল্লোল বয়ে গেল। সকলে প্রমিতা ও মননকে নিয়ে রগড়, হই-হল্লা করল। সবাই মোটামুটি জানে— এই কমিটিই পাস হবে।

যেটা শেষে বলার তা হল— দেখলাম, মনুর কমিটিতে আসা নিয়ে খুশিতে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে মিতা। তবে তার প্রকাশটা যেন একটু আড়ষ্ট, বিশেষ করে অম্বরিষের কাছে।

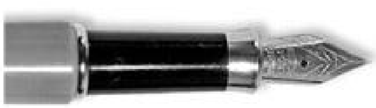

একটি নিবেদন

অনিবার্য কারণে এই ধারাবাহিক উপন্যাসটি আপাতত আর প্রকাশিত হবে না।

স্বর্ণাক্ষরে কাজের বই

বাংলা প্রত্যয়
প্রকরণ ও পদ্ধতি
শিশিরকুমার আচার্য

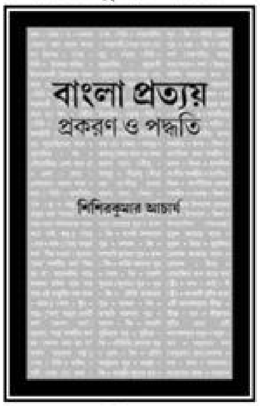

₹৯০

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

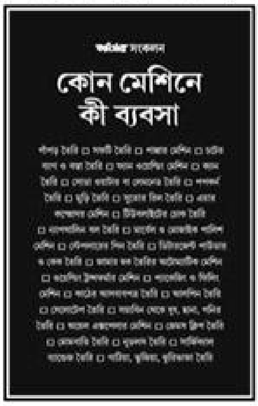

শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane
Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-Mail: info@swarnakshar.in

দিনাজপুরের ধাঁধা

হরিপদ পাল

বছরখানেক আগে দিনাজপুরের চান্দোল হাটে সংঘের মেলায় আলাপ হয়েছিল হরিপদ পালের সঙ্গে। তিনি কুনোরের কুমোর। যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় জেলা প্রতিনিধি হিসেবে মাটির নানা জিনিস নিয়ে। সে দিন বেশ অনেক রাতে মেলা শেষ করে ফিরেছি। খাওয়াদাওয়া শেষ করতে করতে প্রায় ১২টা। আমরা আছি স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘরে। দূরের কোণে শুনি মুখচোরা হরিপদবাবু ছড়া কাটছেন, ১৫/২০ জন মহিলা শ্রোতাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মহা উৎসাহে। কান উৎসুক হয়ে উঠল। মুখচোরা কুমোর হরিপদ তখন অন্য মানুষ। চোখ নাচিয়ে, গায়ের অঙ্গভঙ্গিতে গলায় সুর খেলিয়ে সে এক অচেনা হরিপদ। সেদিন শুতে শুতে ভোর গড়িয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। আমাদের অনুরোধে তিনি সেই মণিমুক্তোগুলোর কিছু নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। সেই সংগ্রহ পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া গেল বিন্দুমাত্র কলম না ছুঁইয়ে, শব্দরে জ্ঞান আর বাগবিধি অবলম্বন করে সেগুলি সম্পাদনা আর বিশ্লেষণের উদ্যোগ না নিয়ে।

■ মানুষের অখাদ্য বটে/ তবু কেউ কেউ খায়/ খাওয়ার কথা শুনলে অন্য লোকে/ করে হায় হায়।

উত্তর: বিষ

■ তিন অক্ষরে নাম মোর/ মুই নাহি মিঠে কখনও/ বা হাতে পরি কখনও পিঠে/ প্রথম অক্ষর পেলে, পান/করো সুখে গরম গরম ভালো/ লাগে তলো যদি মুখে বাকি/ অক্ষর দুটো অমনি ইংরেজি/ কথা হয় নিয়ে গিয়ে পরতে/ পারো যত মনে চায়।

উত্তর: চাবুক

■ আমি তো মরেছি, তুমিও মরিবে/ চৈতন্য (ফাতনা) ডুবিলে বুঝিতে পারিবে।

উত্তর: কেঁচো বলতে মাছকে

■ এখান থেকে দিলাম দৃষ্টি/ ওই গাছটি ভারি মিষ্টি।

উত্তর: আখ

■ দাদা দেয় একবার/ বৌদি দেয় বারবার

উত্তর: সিন্দুর

■ তিল গুড় খির নারিকেল আর, /গরিতেছে পিঠে পুলি অসেস/ প্রকার বাড়ি বাড়ি কুটুম্বের মেলা/ কোন সময় ইহা হয় বল দেখি বালা।

উত্তর: পৌষ পার্বণ

■ কালিদাস বলেছিল শিশুকালের/ কথা। এক লক্ষ তেঁতুল গাছের/ কয় লক্ষ পাতা

উত্তর: প্রথম অঙ্কুর হওয়ার সময় হয় দু'টি পাতা তাই হল দুই লক্ষ পাতা

■ বলি ভালো লোকের ঝি/ তোমার ব্যাপারটা কী/ দিতে দিতে ভুলে গেলি/ ছি, ছি, ছি।

উত্তর: মাথায় ঘোমাটা দেওয়া

■ দি তো রাস্তাঘাটে/ দি দি তো পর/ পুরুষে দি, দি তো/ যেথায় সেথায় দি/ তুমি আমা আমি/ তোমার তোমায়/ দি কে কি?

উত্তর: মাথায় ঘোমটা দেওয়া

■ কলির লি, ছাড়া/ পাঁঠার ছাড়া পা/ লবঙ্গে বঙ্গ ছা/ কিনে আনে দে যা।

উত্তর: কাঁঠাল

■ সাত ভাই সাত রং/ ঘরে ঢুকলেই এক রং।

উত্তর: পান খাওয়া

■ কুটুস সের সের সের/ ঢেপেৎ ভে..ভে...

উত্তর: ঘরের চালে কুমড়ো ছিল, ইন্দুরে বোঁটা কেটে দিয়েছে তাই কুমড়ো পড়ে গিয়েছে এক ছাগলের উপরে, ছাগল তাই ভে করে উঠেছে।

■ এক অর্থে গায়ের বস্ত্র/ আর-এক অর্থে মাছ/ অন্য অর্থে আসবাবপত্র/ আর-এক অর্থে মাছ।

উত্তর: শাল

■ হানাই পানাই সবারে ধরে।/ অসহ্য যন্ত্রণায় শির নুয়ে পড়ে।

উত্তর: মাথা ধরা

■ পাখা নাই উড়ে যায়/ মুখ নাই ডাকে/ বুক ফেটে আলো দেয়/ কান ফাটে হাঁকে।

উত্তর: বাদল মেঘ

■ যা পায় তাই খায়/ জল খাইলে মরে যায়।

উত্তর: আগুন

■ রাজবাড়ি টুল টুল/ ধপত ফুটেছে ফুল।

উত্তর: ধাপত কুপি জ্বালানো। কুপি-লম্প ধপত-বারান্দা

■ রাজার বেটি ধন্দোল পেটি/ বিনা কোদালে খুঁড়ে মাটি।

উত্তর: শূকর

■ পৃথিবীতে আছে কিবা আশ্চর্য/ এমন। কেউ তারে নাহি/ চায় করিতে গ্রহণ। কিন্তু/ সবাই পায় কি নাম তাহার হয়/ বল মহাশয়।

উত্তর: মৃত্যু বা মারা যাওয়া

■ খাদ্য নয় তবু কেউ কেউ/ খায় বৃদ্ধয় খাইলে/ কিছুদিন বিছানায় গর বরায়/ যুবায় খাইলে এদিক/ ওদিক চায়। শিশুয়ে/ খাইলে ধরা কাদিয়া ফাটায়।

উত্তর: আছাড় খাওয়া

■ পা পিষ্ঠ মাথাটা/ দুই হাত কুড়ি আঙুল/ নাকটা।

উত্তর: মানুষ-দেহের গঠন পা, পিঠ, মাথা, দুই হাত, কুড়িটা আঙুল, নাক

■ আই গে বাই, ঘর/ আছে ত দুয়ার নাই।

উত্তর: ডিম

■ আখির ভিতর (মধ্যে) পাখির/ বাসা। জলকে দিলাম সুলি/ চার পায়া উপরে পায়া চরে দুই/ পায়া নিয়ে গেল তুলি। সুলি-ঘাসের আগার শিশির

উত্তর: একটা গোরুর মরা মাথার চোখের মধ্যে একটা ছোট পাখি বাসা বেঁধেছে। সকালবেলার ঘাসের আগায় শিশির থাকাকে বলে সুলি আর পুকুরে গোরু চান করার

সময় একটা মাছ গোরুর ওপরে উঠেছিল আর-একটা চিলে নিয়ে গিয়েছিল। পায়া-পা

■ মাছ ধরতে গেল লাটু/ ছয় ঠেং তার বার হাটু/ সাক্না মাঠে ফেলে জাল/ মাছ ধরে চিরকাল।

উত্তর: মাকড়সা

■ সতত গপনে থাকে নারী/ কিন্তু নয়। রবিকর তাপে/ ম্লান অতিশয় বদলে/ ফেলিলে তারে জুরায়/ জিবোন। সভাস্থলে সবাকারে/ রাখেন সম্মান, কিন্তু/ রমনীগণ ইহা মর্ম জানে/ চিন্তকা করি বল।

উত্তর: পান

■ নারী অক্ষরে নাম তার/ ধরে কৃষ্ণ নাম। হাড়ের/ ভিতর মাংস তার চুলের/ উপর চাম।

উত্তর: নারিকেল

■ কোন নারী দরশনে পূর্ণ হয়/ রতি আলিঙ্গন মোক্ষ লাভ স্বতের/ ভারতী। চুম্বন করিলে হয় পবিত্র/ জিবেন। হেন কোন্ নারী আছে/ জগতে এমন।

উত্তর: গঙ্গাদেবী

■ এতটুকু ডোবা/ কিছু পরিলে/ হাইরে বাবা।

উত্তর: চোখ

■ এতটুকু পুকুরে চিংরি/ মাছে ভর্তি। চিংরি মাছ খেয়ে সবাই করে ফূর্তি।

উত্তর: বাদামি

■ কৃষ্ণ বর্ণ রং আর ধরে পঞ্চশীর/ রাবণের পুত্র নহে, নহে কোন বীর/ সে ঝোকায় ঝোকায় ধরে/ বৃদ্ধ কালে যুবতীর মন হরে।

উত্তর: কাবরাংগা

■ খুটার গাই মাটির বাছুর/ দুই খাবা তো বান্ধ বাছুর।

উত্তর: খেজুর গাছ

■ খালে ডোবায় নাই জল/ ফলের মধ্যে পাই জল।

উত্তর: ডাব

■ দউরী গেনু দউরী আসনু/ দউরা গঞ্জের হাট। / এমন বৃক্ষ দেখে এনু/ ফলের উপর পাত

উত্তর: আনারস

■ কোন জিবে খায় মাটি/ সেই জি হাগে মাটি/ সেই মাটি হয় পরিপাটি।

উত্তর: কেঁচো

■ জঙ্গলের বীর/ উড়ায় মারে তির।

উত্তর: বোলতা

■ উপর থেকে পরলে ধুম/ ধুম বলে তুলে আমাকে/ সুং।

উত্তর: আম

■ হিরু হিরু হিরু/ হিরুর কোমর শুরু। যখন হিরু মনে করে/ গটা লোকটাকে উপরে করে।

উত্তর: ফিতে লাগানো খড়ম

■ ভাঙ্গিম ভাঙ্গিম করে/ লাগিলে ভাঙ্গিল/ আছানি খালে কেনে।

উত্তর: হাট লাগানো ও হাট ভাঙা

■ খোক্ত পানু আছাই মানু

উত্তর: নাকের পোঁটা

■ আছার দিলে ভাঙ্গে না/ টিপলে সে সহে না

উত্তর: ভাত

■ মায়ের নাম মধুরসি/ বাপের নাম ভিম/ মায়ের পেটে ছেলে হয়/ ছেলের পেটে ডিম।

উত্তর: কাঁঠাল

■ এতটুকু হাড়িতে ভাত গুদগুদ/ করে। হাজার হাজার লোক/ খেলেও ফুরাতে না পারে।

উত্তর: চুন

■ এতটুকু বাছুর খড় খায় প্রচুর।

উত্তর: উনুন

■ আঁটির উপর কাঠি তার উপরে/ মাটি তার উপরে আগুন ছাই/ খেলেও পেট ভরে না তবু খেতে চাই।

উত্তর: হুঁকো

■ বাড়ি থেকে যখন জাইস/ দেখে শুন দিয়ে জাইস।

উত্তর: ঘরের দরজা

■ দিলে খায় না/ না দিলে খায়

উত্তর: গোরুকে জাবি মুখে লোহাই দিলে খায় না

■ ঘর ঢাং ঢাং একটা পোয়া। (খুঁটি)

উত্তর: ছাতা

■ শত শত ঘরের একটা বান্দ। (বাধা)

উত্তর: মৌচাক

■ কাচা থেকে থেল বেল/ পাকিলে সুন্দর বলে/ আবার গুরুই এসে শিষ্যাকে/ প্রণাম করে।

উত্তর: প্রতিমা, ঠাকুর

■ আকাশে ঝিকিমিকি মাটিতে/ ডোর। (সুতা) যে বুঝিতে পারে না/ সে গুষ্টিসুদ্ধ চোর।

উত্তর: ঘুড়ি ওরানো

■ মাসি, পিসি, কাকি/ জেঠাই আই। সকলের দেখেছি স্ত্রীর দেখি নাই।/স্ত্রীর কাছে বলিলে/ গালাগালি খাই।

উত্তর: বিধবা

■ গলায় সাজ মতি হাড়/ গাছের উপরে লেজ রেখে/ পুকুরের জলে করে আহার/ ধরে কিছু খায় না।

উত্তর: মাছ ধরা জাল

■ কাটিলে সকল বস্তু খাট/ কিন্তু হয়। কিন্তু যত কাট/ তত বারে এমন বস্তু কোন/ আছে এ ধরায়।

উত্তর: পুকুর বা ডোবা

■ ইরকিচি বিরকিচি নাহি/ চেচা নাহি বিচি

উত্তর: লবণ

■ নি ফুল নি ফলিয়া/শাতা কো জিবের আঠারটা/ নাক।

উত্তর: পান ও সাটি মাছ (লোটা মাছ)

■ এই ধাপতে ওই ধাপ যায়/ ধিপ ধাপ করে বাড়ি খায়।

উত্তর: ঝাঁটা

■ তিন অক্ষরে নাম/ হয় গাছের ডালে ঝোলে/ মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে/নারীর কাছে দোলে।

উত্তর: সজনা

■ গাছটা থেকরা ফল তার বাঁকা।

উত্তর: সিটি লঙ্কা

■ এক থালা সুপারি/ গুণিতে না পারি।

উত্তর: আকাশের তারা

■ দশ জনে খুঁজে/ দুই জনে ধরে/ তালা বাড়ি বিচার করে/ খলা বাড়ি মারে।

উত্তর: মাথার উকুন বাছা ও মারা

■ কোন দেশে মাটি নাই।

উত্তর: সন্দেশে মাটি নাই

■ ঘরের ভিতরে ঘর/ আছে কনে বর।

উত্তর: ঘরের মধ্যে মশারি খাটানো

■ সুর দিয়ে আহার করি/ নই আমি হাতি। পরের উপকার করি তবু/খাই লাথি।

উত্তর: ঢেঁকি

■ চার পায়ে বসি/ আট পায়ে চলি/ বাঘ নই ভাল্লুকও নই/ আগুন মানুষ গিলি।

উত্তর: পালকি

■ দেখে এলাম মাঠে/ আট পা, দুই হাঁটু/ লোক আছে পিঠে।

উত্তর: দাঁড়িপাল্লা

■ দেখে এলাম ঘাটে/ সাধুও নয় মৌলবী নয়/ তবু দাড়ি ভাসে।

উত্তর: কচুরিপানা

সৌজন্য: বিশ্বেন্দু নন্দ সম্পাদিত 'পরম'

কেন লিখি

এইসব লিখে যদি জানিয়ে যেতে পারি

মণীন্দ্র গুপ্ত

(জন্ম: ১৯২৬)

কেন লিখি। এই প্রশ্নের উত্তর অনেকবার দিয়েছি, এক-এক বার উত্তর এক-এক রকম হয়েছে। মেজাজ যেমন যেমন ছিল উত্তরও তেমন তেমন হয়েছে। তাহলে আমার চিন্তায় বোধহয় তেমন অটলতা নেই। কেন লিখি? আবারও মনের মধ্যে নতুন করে কারণ খুঁজতে থাকি। এবং আধ ঘণ্টা খুঁজেও কোনও কারণের সন্ধান পাই না।

সাহিত্যসম্রাট বলেছেন— লিখিতেই যদি হয় তবে পরোপকারের জন্য লিখিবে। কথাটা আমার একেবারে পছন্দ নয়। লেখক বিশ্ববন্ধু নন, তাঁর লক্ষ্য তিনি নিজে। তিনি লেখেন আর নিজের মধ্যে নিজেকে উপভোগ করেন।

বুদ্ধদেব বসু একজন বিদেশি কবির অনুবাদ করেছিলেন খানিকটা এইরকম: কবিমশাই, কবুল করুন আপনি কেন লেখেন। সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য? কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য? কোনও মেয়ের মন পাওয়ার জন্য? —বলুন, বলুন, কবুল করুন।

হ্যাঁ, এটা একটা অকাট্য অভিযোগ বটে। শুরুর দিকে অনেকেরই এমনটা ঘটে। আমারও ঘটেছিল। কিন্তু সে মতিভ্রম মাত্র কয়েক মাসের। তারপর দীর্ঘ এক জীবন কেটে গেল। কত সুখ দুঃখ বসন্ত হেমন্ত গেল। আপনারা যাঁরা এর মধ্যে আছেন, সবাই জানেন, একবার এই স্বতশ্চল স্রোতে গা ভাসালে, মোহানায় গিয়ে সমুদ্রে না মেশা পর্যন্ত রেহাই নেই। একটা লোককে লেখক করে রাখবার জন্য অনেক শক্তি কাজ করে। জীবন তাকে বঞ্চনা করে। দিয়ে কেড়ে নেয়, বঞ্চনার চেয়েও যা অধিক। তারপর এক সময়ে দেখা যায় কূলে কূলে সব ভরে আছে, পাড় জুড়ে সাদা কাশফুলের বন হাওয়ায় দুলছে। তারপর আবার ফাঁকা। প্রকৃতির মধ্যে শান্ত হয়ে আছে দীনদরিদ্র জীবন। মানুষের সঙ্গই মানুষের একমাত্র কাম্য নয়, প্রকৃতি এবং বনবাসী প্রাণীদের দেখে বুঝতে পারি, অর্থনীতির বাইরে তৃষিত প্রাণ কীভাবে তৃপ্ত হয়।

চলে যাওয়ার আগে, এইসব লিখে লিখে যদি জানিয়ে যেতে পারি! লিখতে লিখতে, খোয়াতে এত দূর এলাম বোধহয় এই জন্যই।

লেখার একটা অন্য দিকও আছে। অন্যের কেমন জানি না। আমার লেখার সঙ্গে আমার জীবনযাপনের মিল বোধহয় কম। আমার লেখার বীজটুকুই আসে জীবন থেকে, কিন্তু তার চাষ হয় মনের মধ্যে, ফসল যেটুকু ওঠে সবই মনের মাঠের। কিন্তু মন কেউ দেখতে পায় না, চোখে পড়ে বাইরের দীনহীন চেহারাটাই।

লেখা পড়ে পছন্দ হয়েছিল, তাই কেউ কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু দেখার পরে, আমি টের পাই, তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। একবার বহুদূর দেশ থেকে এক যুবক এল, সঙ্গে তার সদ্যপরিণীতা স্ত্রী। কেন জানি তার ধারণা হয়েছিল, আমি বোধহয় মুনিঋষি গোছের কেউ। আমাকে দেখে, অসজ্জিত আমার কথাবার্তা শুনে, প্রথম দর্শনেই তার মোহ ভাঙল।

ক'দিন আগে এক যুবক পর পর দু'দিন এল। দ্বিতীয় দিনে যাওয়ার আগে সরল এবং হতাশাভরা গলায় বলে গেল— বই পড়ে, যে পুরুষটিকে দেখব বলে আশা করে এসেছিলাম তাকে দেখলাম না।

এসব তিরস্কারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি

কেমন কাঁচুমাচু হয়ে যাই। কী করি বলুন তো, দু'-একটা বই লিখে আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে আমাকে মুনিঋষি সেজে থাকতে হবে! সাড়ে পাঁচ ফুট শরীরটাকে সাড়ে সাত ফুট বানাতে হবে! অথবা দোষটা হয়তো আমারই— লিখে লিখে আমি বোধহয় একটা ভুল প্রত্যাশা তৈরি করেছি।

আমি আশি পেরিয়ে এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি। গায়ের চামড়া এখন মাছের আঁশের মতো কোঁচকানো, হাড় পাটকাঠির মতো ভঙ্গুর। এখনও কি আমাকে অন্যের পছন্দমতো হয়ে সেজেগুজে বসে থাকতে হবে!

ছেলেবেলায় আমাদের দুধ দিয়ে যেত মনিরুদ্দি মিয়া। নীল লুঙ্গি, খালি গা, ফোকলা মুখ, ছাগল দাড়ি। চার মাইল দূর থেকে আসত, একটু নিঃশ্বাসের কষ্ট হত। সেই মনিরুদ্দির সঙ্গে এখন আমার চেহারার মিল।

আমি এখন হিন্দু মুসলমানের অতীত। শিশু বৃদ্ধের অতীত। মূর্তি ও ভাবমূর্তির অতীত। নিন্দা স্তুতি, সমস্ত মন্তব্যের অতীত জায়গায়, এখন আমাকে ছায়ায় বসে একটু ঝিমোতে দিন।

অনুভবের কথা বলতে চাই

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

(জন্ম: ১৯৩১)

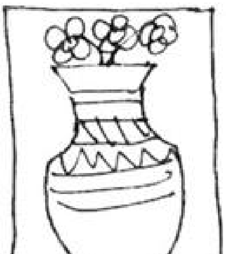

স্মরণ করার চেষ্টা করছি, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন লেখালেখি শুরু করেছিলাম, তখন আমার বয়স আঠারো কি উনিশ, কী ভেবেছিলাম তখন। সবে কলকাতায় এসেছি, কলেজে পড়ি, চাকরিও করি একটা ছোটখাটো। কাছেই বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার। সেখানে হেন বাংলা বই নেই যা পাওয়া যেত না। আমার প্রচণ্ড কৌতূহল সেই সব বই পড়ার। কিনতে হয় না, সামান্য মাসিক চাঁদা দিলেই বই আনা যায়। আমাদের বেনারসের বাড়িতে খুব বেশি বই ছিল না। সাধারণ বাঙালি পরিবারে যা থাকে— কিছু বঙ্কিমচন্দ্র, কিছু শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা। আর আমাদের গুরুজন আত্মীয় দুই লেখক— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এঁদের কিছু বই। আর ছিল রমলা, রাজলক্ষ্মী, অনুরূপা

> যুদ্ধের আগেকার বাঙালি-অন্তঃপুর ভেঙে পড়ছে আস্তে আস্তে। নির্জন রাস্তায় বা লেকের ধারে ছেলেমেয়েদের ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায় কখনও কখনও। ফিশফাশ নালিশ শোনা যায়, আব্রু বলে আর কিছু রইল না।

দেবীর গ্রন্থাবলি। বড়দের বই পড়তে নিলেই মা বাধা দিতেন। বলতেন, আগে বঙ্কিমবাবুর বই পড়ে শেষ করো। বঙ্কিমবাবুর বই হাতে নিলেই ঘুম পেয়ে যেত, এত খটমট তার ভাষা।

কলকাতায় মাসির বাড়িতে একখানা ছোট ঘরে আমার আস্তানা। নিষেধ করার কেউ নেই। কানাঘুষো শুনেছিলাম 'আঁকাবাঁকা' নাকি দারুণ বড়দের বই। জানলাম, তার লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল। রাত জেগে পড়ে ফেললাম আঁকাবাঁকা। ওঃ, কী উত্তেজনা। এখনও মনে আছে, কঙ্কর আর মীনাক্ষী— দুই বেপরোয়া নায়ক নায়িকা, যৌবন টগবগ করছে তাদের শরীরে। শুতে যাবার সময় মীনাক্ষী কঙ্করের মশারি গুঁজে দিচ্ছে। তারপর তার পায়ের বুড়ো আঙুলদুটো জোড়া করে চুমো খেয়ে বলছে, ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী ছেলের মতো। ব্যস। সারা দিন নিয়মভাঙা আর মুক্তি বিষয়ে চোখাচোখা সংলাপ দেওয়ার পর কঙ্কর টুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে। এর পরে পড়লাম মহাপ্রস্থানের পথে। সেখানেও তাই। তফাতে তফাতে থেকে ভালোবাসার কথা।

এইরকমই রেওয়াজ তখন। বরং কিছু কিছু সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনীগ্রন্থে আদিরসের স্বাদ পাওয়া যেত। যেখানে নানাভাবে তাঁদের ইন্দ্রিয়-সংযম পরীক্ষা করছে দুষ্ট লোকেরা। এই সময়ে হঠাৎ হাতে এল মিরাণ্ডা হস্টেল নামে এক রগরগে আদিরসের উপন্যাস। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেললাম। তারপর একসময় পাঠশালা পত্রিকার সাহিত্যগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে কী পঠনীয় আর কী পঠনীয় নয়, সে বিষয়ে একটা আন্দাজ পাওয়া গেল।

আসাযাওয়ার পথে লোকজন দেখি। মানুষের চলাচল দেখি।পরিচিত লোকজন, সহপাঠী, সহকর্মী, দোকানদার, ড্রাইভার— এদের মুখে নানাবিধ কাণ্ডকারখানার গল্প শুনি। তখন কলকাতায় শরণার্থীরা আসতে শুরু করেছে। যুদ্ধের আগেকার বাঙালি-অন্তঃপুর ভেঙে পড়ছে আস্তে আস্তে। নির্জন রাস্তায় বা লেকের ধারে ছেলেমেয়েদের ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যায় কখনও কখনও। ফিশফাশ নালিশ শোনা যায়, আব্রু বলে আর কিছু রইল না। কারওর সঙ্গে প্রেম করতে আমারও খুব ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে হাস্যপরিহাস দিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করি। না পেরে লিখতে শুরু করলাম। হাবিজাবি কাগজে সে-লেখা বেরোতেও লাগল।

তখন কি ভেবেছি কেন লিখছি? এখন মনে হয়, আত্মপ্রকাশের অবদমিত বাসনা থেকে কলম ধরেছিলাম। নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়তে ভালো লাগত। নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখতেও ভালো লাগত খুব। আর মনে হত, আমার আত্মীয় পরিজনদের কেউ যেন সে লেখা না দেখে ফেলে। আমার মনের অনেক গোপন কথা যে বলা রয়েছে ওর মধ্যে। একদিন রূপাঞ্জলি নামের একটা সিনেমা পত্রিকা দেখিয়ে মাসি বলল, এটা তোর লেখা? আমি তো লজ্জায় মরি। ভয় হল, এবার তাড়িয়ে না দেয় বাড়ি থেকে। মাসি একটু হেসে বলল, ভিজে বেড়াল। তারপর সেই পত্রিকা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল। তখন বাধ্য হয়ে ছদ্মনাম ধরলাম। সেই ছদ্মনাম ভাঙল কৃত্তিবাস থেকে প্রথম কবিতার বই বেরোবার সময়।

প্রথম লেখালেখি শুরু করার পর থেকে দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল। সাতটি উপন্যাস, সত্তরটা গল্প আর সাতশো কবিতা— এই আমার উৎপাদনের মোটামুটি হিসেব। এ ছাড়া কিছু খুচরো ইস্যুভিত্তিক গদ্য রচনা, কিছু অনুবাদ। বই-এর হিসেব ধরলে খান তিরিশেক। অনেক লেখাই বইয়ের মধ্যে ঢোকেনি। অনেক লেখাই হারিয়ে গেছে। যশস্বী লেখকদের তুলনায় এই কাজ সামান্য, কিন্তু যেহেতু কাজ থামাইনি, লেখাপড়া চালিয়ে গেছি, তাই, খুঁটিয়ে দেখলে, এর একটা ধারাবাহিকতা নিশ্চয় তৈরি হয়েছে। একটা ভাবনার জমি হয়তো এসেছে আমার দখলে। আমার লেখা পড়ে লোকে কিছু পায়, কিছু পেতে চায় এখনও। আমিও চাই পাঠককে সঙ্গে পেতে। আমি আর আমার পাঠক উভয়েই সক্রিয়— একথা ভাবতে ভালো লাগে।

তাই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আজ 'কেন লিখি'— এ প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়। যা লিখেছি, কেন লিখেছি, মনে হয়, বিরোধীপক্ষের উকিল এক ভিজে বেড়ালকে এই প্রশ্ন করছে। লেখক তো এক ভিজে বেড়ালই। দেখতে ভালোমানুষ কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে চতুর। অভিসন্ধিৎসু।

ধরা পড়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। শপথ নিয়েছি, সত্য কথা বলব। তাই প্রথমেই বলতে চাই যে, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার আশায় লেখা চালিয়ে যাইনি। একসময় সে আশা মিটে গেছে। তখন মনে হয়েছে, আমার আগে যাঁরা সাহিত্যরচনা করে গেছেন, তাঁরা যদি সব কথা বলে গিয়ে থাকেন, তা হলে আমার কী কাজ। আমি যে তাঁদের কাজে অনেক অসংগতি, অসম্পূর্ণতা দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা অনেক রেখে ঢেকে লিখেছেন। মানুষের মন, জীবন, চলাফেরা, সম্পর্ক নিয়ে বেশি খোঁড়াখুঁড়ি করতে চাননি তাঁরা। ওই 'আঁকাবাঁকা' উপন্যাসের নায়িকার মতো কেবল নায়কের পায়ের বুড়ো আঙুলে চুমো খেয়েই মশারি গুঁজে দিয়েছেন। আরও একটু উদ্‌ঘাটনের দরকার ছিল। দরকার আছে। আমি বুঝি, তাঁরা একটা সুরুচির আব্রু রক্ষা করে গেছেন। কিন্তু কেন। আমি তো অন্য ভাষার বইপত্রও পড়ি, তাতে আমার টনক নড়ে যায়। সাহিত্য যদি বইপড়া মানুষের জন্য লেখা বইপড়া মানুষের কথা হয়, তবে সে তো একরকম ফিশফিশানিই— প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসমাজের মধ্যে নিবদ্ধ। সে তো ছায়াচিত্রের পর্দায় ভেসে উঠছে না। লোকে দুঃখ পাবে বলে কি দুঃখের কথা উহ্য থাকবে? লোকে লজ্জা পাবে বলে কি নির্বুদ্ধিতার, অবিমৃশ্যকারিতার কথা বলা হবে না? মশকরাও নিষিদ্ধ?

লোকে কী চায়, আমরা তার কতটুকু জানি। কেবল মনোরঞ্জনে প্রত্যাশিত হলে তারা শুধু খেলাধুলো করত। বই পড়ত না। বইয়ের মধ্যে তারা আরও কিছু খোঁজে। লোকে পোশাকে প্রসাধনে আবৃত মানুষকে পায় সচরাচর, তার সঙ্গে কথা কয়। মিথ্যে আশা, মিথ্যে তথ্য, মিথ্যে স্বপ্ন দিয়ে মানুষ পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এটা ঠিক না। আমি আমার লেখায় মাঝে মাঝে সেই আবরণ সরিয়ে দিতে চেয়েছি। প্রকৃতির তৈরি মানুষকে যতটা প্রাকৃতিক দেখায় আর কী। ফুলে, ফলে, পশুপাখির শরীরে তো কোনও আবরণ থাকে না, তাতে কি তারা কিছু কম সুন্দর। কম জীবন্ত?

পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে যা আমার মনোমতো নয়। আমি এক নগণ্য ব্যক্তি, কে শোনে আমার কথা। তবু আমি চুপ করে থাকতে পারি না। প্রতিবাদ করি। নিজের অভিমত প্রকাশ করার সবচেয়ে নীরব আর নিরাপদ প্রক্রিয়া হল লেখা। যার পড়ার সে পড়বে। আমার সঙ্গে একমত হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যতা নেই। কিন্তু যদি কেউ একমত হয়, তবে তাকে আমার দলে টানব না কেন। কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হবে বলে অনেকে ভয় দেখায় আমাকে, আমি ভাবি, কী মুশকিল, কিছু কিছু লোক যে কর্তৃপক্ষের ওপর অসন্তুষ্ট, সে কথা জানাতে হবে না? যে সব কথা গল্প-কবিতায় ঠিক আঁটে না, তা খবরের কাগজে চিঠি লিখে ছাপাই। সেও লেখা, লেখালেখির মধ্যে পড়ে বলে আমার বিশ্বাস।

শুধু অপছন্দ না, আমার মধ্যে মুগ্ধতাও আছে। অনেক কিছুই আমায় অবাক করে। বিশাল গ্লোবের ওপর তুচ্ছ এক পিঁপড়ের মতো ঘুরে বেড়াই, অবাক হয়ে দেখি চারপাশের চলমান জীবন, সবকিছুর মধ্যেকার নিখুঁত আয়োজন ও সংগতি। কোথাও কোথাও বিঘ্নিত হলেও বিধ্বস্ত নয়।

এর পিছনে কারও অদৃশ্য হাত কাজ করছে, না প্রাকৃতিক নিয়মে বহু লক্ষ বছরের ভাঙাচোরার পর এসেছে স্থিরতা, জানি না, জানতে চাইও না।

আমি অনুভব করি, পড়ি, দেখি, অনুভবের কথা বলতে চাই আমার প্রিয় পাঠককে। আমার ইচ্ছে, সেও আমার মতো করে দেখুক। তার অবাক হওয়ার অভিজ্ঞতা রটিয়ে দিক চারদিকে। আমার একটা দল তৈরি হোক। আমরা দলবল মিলে পৃথিবীকে বদলে দেব। কাউকে পুজো করার দরকার নেই। কাগজে ছেপে দাও। মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে বার্তা। একটা পোকার পক্ষে এই ভাবনা হয়তো হাস্যকর। কিন্তু এ না থাকলে বাঁচব কী নিয়ে। কীভাবে জীবন কাটিয়ে গেলাম, সে কথা রেকর্ড করে যেতে হবে না?

নেশা হয় তাই লিখি

সরল দে

(জন্ম: ১৯৩৫)

কবুল করতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই যে, আমি একজন নেশাচ্ছন্ন মানুষ। তবে আমার নেশা কোনও বায়বীয় বা তরল পদার্থ নয়, আমার নেশা লেখা। এমনকী, ড্রাগের নেশা যতই সর্বনাশা হোক তারও নিরাময় আছে। কিন্তু এই যে লেখার নেশা, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ তার বাস। জীবদ্দশায়। আমার এক শিল্পী বন্ধু হাতে মদের বোতল ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, নিন, শুরু করুন, নইলে মুড আসবে কী করে? লিখতেই পারবেন না গলায় না ঢাললে। তখন আমার পাল্টা প্রশ্ন, লেখার চেয়ে বড়ো নেশা আর আছে না-কি?

সঙ্গদোষে লোকে নেশাসক্ত হতে পারে। আমার নেশা সঙ্গীহীনতায়। প্রাক-কৈশোরে মায়ের পূর্ণগ্রাস, বাবা সংসারত্যাগী। স্নেহহীন শাসনে আমি তখন বালকবেলার বালুকাবেলায় নুড়ি কুড়িয়ে অলীক পরশ পাথরের স্বপ্ন দেখি। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কিন্তু কলমের ডগায় অপটু হস্তাক্ষরে ফুটে ওঠে একটি দু'টি অক্ষম অক্ষর।

সেই সময় আমি শহর থেকে দূরে ছায়া সুনিবিড় এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে আঁকাবাঁকা এক ছোটো নদীর তীরভূমিতে আমার অবাধ বিচরণ। একা। বাঁশের সাঁকোয় পারাপার করে আমার খেলা।

কথার সঙ্গে কথা মিলে গেল একদিন। সাঁকোয় দুলতে দুলতে। 'বাঁশের সাঁকো কেন আমায় ডাকো।' ব্যস, শুরু হয়ে গেল পদ্য-পদ্য খেলা। এই সময় বাবার পরিত্যক্ত র‍্যাক থেকে হাতে উঠে এল নজরুলের সঞ্চিতা। না, বিদ্রোহী কবিতা নয়। অন্য একটি কবিতা নজরে এল। সেই যে— সখি পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা/সখি খাস লো মাথা...

ওই কবিতাই আমায় খেলো। সুরেলা কথার মূর্ছনায় আমি মুগ্ধ। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র পাল্কি চলে-র ছন্দের সেই দুলুনি, সেই দৃশ্যময়তা আমায় আচ্ছন্ন করে রাখল, নেশা ধরাল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? তিনি তখনও পাঠ্যবইয়ের পাতায়।

এবার নেশার কথায় আসা যাক। হ্যাঁ, লেখার নেশা। কবিদের ভালো ভালো কবিতা

সঙ্গদোষে লোকে নেশাসক্ত হতে পারে। আমার নেশা সঙ্গীহীনতায়। প্রাক-কৈশোরে মায়ের পূর্ণগ্রাস, বাবা সংসারত্যাগী। স্নেহহীন শাসনে আমি তখন বালকবেলার বালুকাবেলায় নুড়ি কুড়িয়ে অলীক পরশ পাথরের স্বপ্ন দেখি।

পড়ি। আর লিখি। লেখা মানে অক্ষম অনুকরণ। গদ্য লেখাতে আমার চেষ্টা ছোট মাথায় বড়ো ভাবনা নিয়ে। কিন্তু কী যে মাথামুণ্ডু লিখি! লিখে কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিই।

তবু না লিখে পারি না। কারণ নেশা অতি বিষম বস্তু।

তারপর মধ্য-কৈশোরে বড়োদের চোখ এড়িয়ে গল্প-উপন্যাস পাঠ। সবই বয়স্কপাঠ্য। এভাবেই রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়েছি শরৎচন্দ্রের দেবদাস। পড়ে আড়ালে চোখের জল ফেলেছি। সে বয়সে যা-কিছু লিখেছি সবই বড়োদের মতো করে লেখা। পাকামি আর কাকে বলে!

ছোট থেকে যখন ক্রমে বয়ঃসন্ধির অন্তর্জ্বালায়, আবার শহরে তখন ফিরে আসা। সে সময় আমার এক পিসতুতো দাদা সিনেমা দেখতে নিয়ে গেল। সেই হল-এ তখন রমরমিয়ে চলছে একটা ছবি— উদয়ের পথে।

দেখে তো আমার নেশার পারদ আরও চড়ে গেল। আমিও লিখতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, উপন্যাস। প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো করে লেখা হল উপন্যাসের নাম, চলার পথে। কিন্তু হায়, শুরুতেই শেষ! আমার এক কাকার নজরে পড়ল। কী লিখলি, দেখি। বলে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন সদ্য-শুরু সেই চলার পথের পাণ্ডুলিপি।

লেখাপড়ার সময় নাটক-নভেল লেখা হচ্ছে? ছেলে আমার রবি ঠাকুর হবেন, শরৎ চাটুয্যে হবেন! এটা চলার পথে, না উচ্ছন্নের পথে? কাকার তর্জন-গর্জন।

তারপর আমার 'চলার পথে' চলল রন্ধনশালায়। সেখানে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হল আমার অসমাপ্ত সেই উপন্যাস।

এই শেষ নয়, লেখার জন্য বারংবার তিরস্কৃত, এমনকী প্রহৃতও হতে হয়েছে। কিন্তু লেখার নেশা ছাড়াবে কে? নেশার ঘোরে লিখে যাই।

না, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র হওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আমার নেই। জানি জীবন যৌবন ধনমান-এর মতো আমার সব লেখাই কালের করাল স্রোতে ভেসে যাবে। তবু লিখে যাই নেশা হয়, তাই লিখি। কবি-সাহিত্যিক কোনও দিন হতে চাইনি। হয়েছে কি? না।

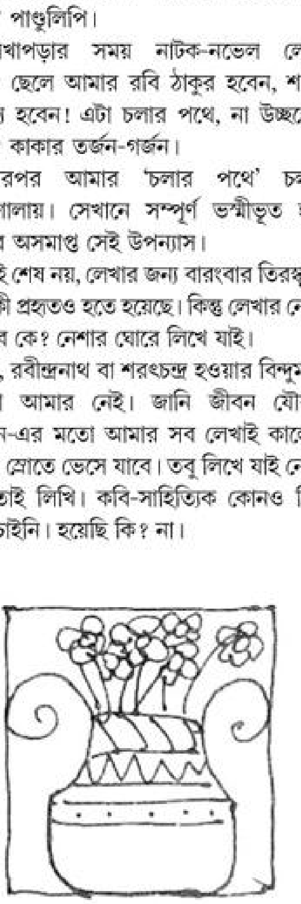

ব্যাধ যেমন পাখি ধরে খাঁচায় ভরে, লেখক সেই রকম জীবন থেকে জীবন ধরেন। অক্ষরের সাজে সাজিয়ে জীবনের তারে ঝুলিয়ে দেন। জন্ম, মৃত্যু, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বিচ্ছেদ, বিরহ, যন্ত্রণা।

পাঠক কেন পড়েন?

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

(জন্ম: ১৯৩৬)

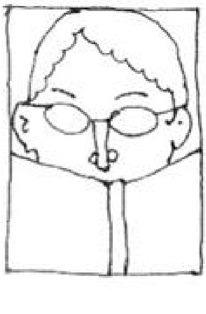

কেন লিখি— এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। অনেক কারণ তৈরি করা যেতে পারে, আসল কারণ অজ্ঞাত। মানুষ কেন কথা বলে? কথা আসে— তাই বলে। ভাব প্রকাশের মাধ্যম। অনেক কথা— এমন কথা, যা লিখতে হয়। লেখার কারণ, কেউ পড়বে। তাহলে একটা চিঠি লিখি। ভাব-ভাবনার ব্যক্তিগত আদান-প্রদান।

আবার যদি এমন হয়, আমি অনেককে জানাতে চাই। সে কি বিজ্ঞাপন?

ম্যানিফেস্টো! সমাজকে বদলে দেব! আহ্বান, নিবেদন, প্রতিবেদন, আবেদন?

লেখার হরেক রকম। তাহলে পাল্টা প্রশ্ন 'লেখক কাকে বলে?' প্রবন্ধকার, উপন্যাসিক, কবি, গীতিকার? কবিতায় দর্শন, আবেগ; প্রবন্ধে জ্ঞান, গল্প-উপন্যাসে কাহিনি। প্রবন্ধ লেখকের একটা উদ্দেশ্য থাকে, নির্দিষ্ট একটা বিষয় থাকে। কবিতায় থাকে অভিমান, উপন্যাসে থাকে বিনোদন।

লিখলেই কি আর লেখক হওয়া যায়? যায় না। ব্যাধ যেমন পাখি ধরে খাঁচায় ভরে, লেখক সেই রকম জীবন থেকে জীবন ধরেন। অক্ষরের সাজে সাজিয়ে জীবনের তারে ঝুলিয়ে দেন। জন্ম, মৃত্যু, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বিচ্ছেদ, বিরহ, যন্ত্রণা। খাবলা মেরে খানিকটা তুলে নেওয়া। পাঠক পড়বেন। কেন পড়বেন? অবসর বিনোদনের জন্য? কিছু শেখার জন্য?

কেন লেখেন? এই প্রশ্নের আগে প্রশ্ন করতে হবে— 'পাঠক কেন আপনি পড়েন?'

জানি-ই না কেন লিখি!

দেবেশ রায়

(জন্ম: ১৯৩৬)

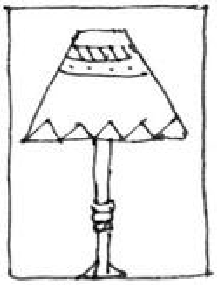

আমরা যখন সল্টলেকের বাসা-বাড়িতে থাকতাম, তখন কাছেই থাকতেন নিশীথেশ ব্যানার্জি— বেশ লম্বা মতো ভদ্রলোক। কারও সঙ্গেই খুব একটা কথাবার্তা বলতেন না, আমার সঙ্গে ভুরু কাঁপানো আলাপমাত্র ছিল। ওঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেই ঘরের ভিতর উল্টো দেওয়ালে জ্বলজ্বল করত কোনও-না-কোনও ছবি। একদিন দেখি ভ্যানগঘের 'সূর্যমুখী'র হলুদ। দেখে আর থাকতে না পেরে ওঁর বাড়িতে ঢুকে গেলাম। ছবি আঁকেন। ছবি নকল করেন। এই ঘটনার পর থেকে কোনো ছবি আঁকা হয়ে গেলে উনি আমাদের বাড়ির বসার জায়গায় রেখে দিয়ে যেতেন। আমাদের বাড়ির সদর দরজা রাতদিনই হাটখোলা। অনেকে দেখতে পাবে তাঁর ছবি। তাহলে নিশীথেশবাবুও ছবি আঁকেন লোকজনকে দেখাতেই।

তিনিই এক ঠা ঠা দুপুরে ঘামতে-ঘামতে আমাদের দরজায় হাজির, বগলে দড়ি দিয়ে বাঁধা কাগজে মোড়া ভারী মতোই কিছু একটা। দরজায় দাঁড়িয়েই বললেন, 'গিয়েছিলাম বেয়াইবাড়ি। ওঁদের তো বনেদি ঘর— বাড়ির আজেবাজে জিনিসপত্র এক শিশিবোতলওয়ালাকে দিয়ে দিচ্ছিল। সঙ্গে দেখি এই ফ্রেম। আরে। আমাদের ফ্রেমের জন্য ছবি আঁকা হয় না আর ওঁরা ছবিছাড়া ফ্রেম বেচে দিচ্ছেন। কী বলব। তুলে নিয়ে এলাম ফ্রেমটা।' বলে উনি মাটিতে সেই ফ্রেম খাড়া করে দড়ি খুলে, কাগজ খুলে ওই ফ্রেমটা আমাকে দেখালেন। আমি আর ছবিছাড়া ফ্রেম দেখে কী বুঝব? বরং ময়লা, চটাওঠা একটা ফাঁকা চৌখুপি একটু অলক্ষ্মীর মতোই লাগল। মুখে বললাম, 'বেশ বড়ো একটা ছবি হবে।' উনি

একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'যেমন ফ্রেম তেমন ছবি। ফ্রেমটা তো হল। ছবির কথা এখন ভাবছিই না।'

'কেন লিখি'র লেখার জন্যে সুভাষদা তাগাদা দিতেই অনেক দিন আগের এই ঘটনা দুটি জেগে উঠল। দু-একদিন চেষ্টা করলাম, ভুলে যেতে। কিন্তু কথাটা মনে থেকেই গেল। ফ্রেম পাওয়াটাই তো আসল। ফ্রেম পাওয়া গেলে আর লিখতে কতক্ষণ? আর, ফ্রেম পুরনো শিশিবোতলওয়ালার ভ্যানরিক্সা থেকেও কুড়িয়ে পাওয়া যায়— যদি সে রকম বেকুব বেয়াই থাকে, বা যদি তেমন চোখ থাকে।

আমি আসলে জানিই না, আমি লিখি কেন। তাই নানা জনের নানা কথা ভেবে-ভেবে ঘাড় হেলাতে চাইছি। সাঁইত্রিশ বছর যার সঙ্গে ঘর, সে, কাকলি, আমারই চোখের সামনে একদিন একজনকে বলেছিল, 'ও তো তাড়াতাড়ি লিখতে পারে বলে লেখক—'। যাকে বলেছিল সে শিল্প-সাহিত্যরচনার এমন অচিন্তিতপূর্ব কারণ শুনে বুঝতে চেষ্টা করছিল কাকলির কোনো আপত্তি বা প্রতিবাদ লুকনো আছে কী না কথাটিতে। আর আমার লেখার এমন প্রশংসা আমি আগে বা পরে কখনো শুনিনি। তবে হাতের লেখা ভাল হলে, নিজের হাতের লেখা দেখার আনন্দে অনেকে হয়তো লেখে। আমার বন্ধু অরুণ সেনের হাতের লেখা এত সুন্দর যে সে যেচে অন্যের লেখা কপি করে দেয়। আমি অরুণকে অনেকবার বলেছি, 'ভগবানের বিচার দেখুন, আমাকে যদি আপনার মতো হাতের লেখা দিতেন, তাহলে আমার বইগুলো আরও কত মোটা হত।'

সাইজ দেখেও অবিশ্যি কখনো-কখনো আমার লেখার কথা মনে হয়েছে। একবার এক আড্ডায় একটা বই হাতে-হাতে ঘুরছিল। তিনশ-চারশ পৃষ্ঠার মতো মোটা। 'বিশ্বভারতী'র বইগুলোর মত ম্যাড়মেড়ে হলদে বোর্ড-বাঁধাই। আমি একবার বইটি হাতে নিলাম না, আড়চোখে বইটির নামও দেখলাম না পাছে রহস্য ভেঙে যায়। ততক্ষণে লোভ লেগে গেছে— ওই সাইজের একটা বই লিখলে হয়।

বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে প্রধান দুটি ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না আমার লেখক হওয়া আর আমার কমিউনিস্ট পার্টি করা।

পরেরটা আগে বলি। আগেও দু'-একবার দু'-এক জায়গায় বলেছি। জলপাইগুড়ি শহরে ওই যুদ্ধ দুর্ভিক্ষের সময় লোহাদার বাড়িতে ছিল পার্টি অফিস। তার সামনে বেশ বড়ো মাঠ। ছোটবেলাতেও আমি খুব খেলাধুলো করতাম না। কী করে সেই মাঠে থাকতাম, মনে নেই। মাঠে থাকলে আর ধুলো পায়ে ঘরে ঢুকতে কতক্ষণ? ৪৮-৪৯-এ আমার বয়স যখন

বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে প্রধান দুটি ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না আমার লেখক হওয়া আর আমার কমিউনিস্ট পার্টি করা।

বারো-তেরো তখন বে-আইনি পার্টির কুরিয়ারের কাজ করি। আমি বরাবরই পার্টিতে খুব আদর পেয়েছি। সব মিলিয়ে কোনো দিন মনে করতেই পারিনি— এ সংসারে কাউকে ঢুকতে হয়। পার্টি ভাগাভাগির সময় যে অমন কুম্ভ সেজেছিলাম সে ওই সংসারের ভাঙন ঠেকাতে বা ভাঙন সত্ত্বেও সংসার বাঁচাতে। পরে, নিশ্চয়ই লোকে যেমন পড়াশোনা করে বা আন্দোলন গড়ে পার্টিতে আসে তেমনি কিছু আমারও ঘটেছিল। সে সব না করলেও আমার পার্টিতে থেকে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারত না। আমারও কিছু করার ছিল না।

এবার লেখক হওয়ার কথা। এ-ব্যাপারেও আমার কিছু করার ছিল না। কারণ আমার দাদার বয়স যখন চোদ্দো-পনেরো তখনই দাদা ঘোষণা করে দিয়েছিল, সে সাহিত্যিক। আমার তখন যে বয়স তাতে সাহিত্যিক হওয়া বলতে কী বোঝায় তা আন্দাজ করাও মুশকিল। এমন নির্বোধদের জন্য দাদা তার ঘরে মাত্র একটিই ছবি কাচে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছিল— শরৎচন্দ্রের সেই বিখ্যাত ছবিটি যেখানে তাঁর কপালে চুল এসে পড়েছে। দাদা, দিনেশচন্দ্র, নিজের সৌন্দর্য ও গায়ের রঙ সম্পর্কে সেই বয়সেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কোনো এক ভাবে দাদার ধারণা হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল আছে। সেই সুবাদেই শরৎচন্দ্রের ছবি।

দাদা যে ঘরে থাকতেন, তার জানলার বাইরে একটা গন্ধহীন বুনো লতানে গোলাপের ঝাড় ছিল। দাদা সেই লতানে গোলাপকে নিজের জানলার ওপর দিয়ে লতিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। শুনেছিলাম, সাহিত্যিকদের ঘরের জানলায় নাকি ওরকম লতাপাতা রাখতে হয়।

দাদা যেমন নিজের চেহারা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তেমনি নিজের হাতের লেখা সম্পর্ক নিঃসন্দেহ ছিলেন। হাতের লেখা খারাপ হলেও সাহিত্যিককে তো লিখতেই হবে। আমাদের বাড়িতে সবথেকে ভালো ছাত্রী ছিলেন মিনু মাসি। সবচেয়ে ভালো হাতের লেখাও ছিল মিনু মাসির। ভালো হাতের লেখা ও নির্ভুল বানানের যোগ্যতায় দাদা মিনু মাসিকেও নিজের শ্রুতিলেখকের কাজে বহাল করলেন। মিনু মাসি নাকি আসলে আমাদের ভাগ্নী ছিলেন। তিনি বড়ো বলে তাঁকে আমরা, ছোটরা, মাসি ডাকতাম আর তিনি এক দাদাকেই 'দিপুমামা' ডাকতেন।

দাদার ডিকটেশনে মিনু মাসির হাতের লেখায়— তখন দোয়াত-কলমে লিখতে হত— একটা এক্সারসাইজ খাতা ভরে উঠল। উপন্যাসই হবে হয়তো। এখন হাতের লেখা সাহিত্যকীর্তিকে স্থায়িত্ব দিতেই দাদা খবরের কাগজ থেকে 'পুরাতনী' কথাটি কেটে সেঁটে দিলেন, অর্থাৎ লেখাটির নাম। ভিতরে ওই রকমই কাগজকাটা একটা ছবিও ছিল— নীচে গোলাম মোস্তাফার কোনো কবিতা থেকে দুই চরণ।

দাদার পরে দুই দিদি। তারপর আমি। ফলে দাদার জামা ছোট হয়ে গেলে আমি পরি, প্যান্ট ছোট হয়ে গেলে আমি পরি, এমনকী জুতো ছোট হয়ে গেলেও আমি পরি। তাহলে দাদা যদি লেখক হয়ে যায়, আমার আর লেখক হওয়া ছাড়া কী করার থাকে? এমনকী দাদা যেমন ফটো টাঙিয়ে, গোলাপ লতিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিল, 'আমি সাহিত্যিক', আমার বেলায় তারও কোনো সুযোগ ছিল না। বাড়িতে সবার জানা ছিল, 'খোকা লেখে, ও-ও লিখবে।' শহরে জানা ছিল, 'দিনেশের ভাই তো—' পাড়ায় জানা ছিল, 'সাহিত্যের বাড়ি।' এরপর পনেরো-ষোলো বছর বয়স হয়ে গেলে একটা ছেলে না লিখে আর কত দিন কাটাবে?

তাও আমি ইস্কুলটা প্রায় না লিখেই কাটিয়েছি। তখন প্রধানত সম্পাদকই ছিলাম— হাতের লেখা কাগজের তো বটেই, ছাপা-কাগজেরও শিশু বিভাগেব। কলেজে গিয়ে লেখক হওয়া আর পেছনো গেল না। আমাদের কলেজের, জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের, প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল ২ সেপ্টেম্বর। ওই উপলক্ষে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখালেখির, গানের, বক্তৃতার, বিতর্কের প্রতিযোগিতা হত। সারা শহরেই সেটা খুব একটা হইচই ফেলা ব্যাপার ছিল।

১৯৫২-তে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই মাস দুয়েকের মধ্যে দোসরা সেপ্টেম্বর। গান বাদ দিয়ে সব প্রাইজ জিতে নিতে না পারলে তো মুখ দেখাতে পারব না। গল্পও একটা লিখতে হল। কিন্তু ওই সম্পাদনার অভিজ্ঞতাতে বুঝেছিলাম— ওই গল্পে প্রাইজের শিকে ছিঁড়বে না। দাদার পিছন পিছন ঘুরতে লাগলাম— দাদা যদি কিছু বলে

দেয়। দাদা তো ততদিনে কলেজ-টলেজ শেষ করে আমার নাগালের বাইরে। আমাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না। শেষে মা দাদাকে বকলেন, 'দে না বলে, ছেলেটা বলছে, না বলে দিলে ও পারবে কী করে?' তখনই দাদা বললেন, 'নিয়ে আয়। পড়।' আমি চার-পাঁচ লাইনের প্যারাটা পড়ে শেষ করেছি কী করিনি, দাদা বললেন, 'লেখ'। ব্যস, তারপর টানা বোধহয় আট পৃষ্ঠা ডিকটেশন। ওই প্রথম প্যারাটিতেই গল্পের লোকজনের নাম ছিল। দাদার পক্ষে ওইটিই যথেষ্ট। সেই গল্প কলেজে সে বার ফার্স্ট হল। দাদার ডিকটেশনের গল্প দিয়ে ফার্স্ট প্রাইজ নিতে সেদিন আমার নীতিবোধে আটকায়নি। আজও আমার নীতিবোধে আটকাচ্ছে না। দাদা যদি নিজেকে 'সাহিত্যিক' ঘোষণা না করত, তাহলে তো আমাকে দিনেশের ভাই হিসেবে যাবজ্জীবন 'সাহিত্যিক' থাকতে হত না।

এই ঘটনাটি বলতে হল এই কথাটিতে আসতে— আজও আমি ডিকটেশন না শুনে লিখতে পারি না। কার ডিকটেশন, জানি না। দাদার গলায় না। নিজের গলা কিনা, বলতে পারব না। অনেককে দেখেছি, বলে-বলে লেখে। অর্থাৎ যে শব্দটি লেখে, সেটা বলে নেয়, গুনগুন করে। আমার ও রকম কিছু হয় না। কিন্তু লেখার সময় স্পষ্ট ওই ডিকটেশন শুনতে পাই। যারা ডিকটেশন ভালো নেয়, তারা তাড়াতাড়ি লেখে। কাকলি সেই কারণেই হয়তো আমাকে তাড়াতাড়ি লিখতে দেখেছে।

অনুপ্রেরণাবাদীদের নিরস্ত করতে বলা ভালো, আমি যেমন শুনে লিখি, সব লেখাই, গল্প-উপন্যাস আমি দেখেও লিখি। শুনে লিখি আর দেখে লিখি। ফিল্ম দেখে যেমন স্ক্রিপ্ট লেখা হয়— অনেকটা সেরকম।একবার টিভি স্টুডিওতে দেখেছিলাম— টিভিতে খেলা দেখতে দেখতে একজন জীবন্ত ধারাবিবরণী দিচ্ছেন— অনেকটা সেরকম। দেখা আর বলার মধ্যে সময়ের খুব সূক্ষ্ম একটা ফাঁক ঘটতেও পারে, লেখাতে তা ঘটে না। একবার জলপাইগুড়ির গ্রামাঞ্চল নিয়ে একটা গল্প লিখছিলাম। তাতে আমি ঠিকমতো দেখতেই পাচ্ছিলাম না, যেখানে বনের ভিতরের রাস্তাটা তিনমুখে গেল, সেখানে গাছটা পিপুল না বাবলা। একবার ভাবলাম— একটা গাছেরই নাম তো, যা হোক একটা লিখে দিই। লিখেও দিলাম। দু'লাইন এগোতে না এগোতেই আটকে গেলাম। গাছ তো আর খাড়া থাকার জন্য গাছ হয়নি। পথ তো আর শুয়ে থাকার জন্য পথ হয়নি। ওই পথ দিয়ে, গাছতলা দিয়ে তো মানুষজন হাঁটবে। আমার সেই গল্পের মানুষজন ওই না-জানা গাছের তলা দিয়ে হাঁটতে পারল না। বাবলা গাছের তলা দিয়ে মানুষ যেমন হাঁটে, পিপুল গাছের তলা দিয়ে তেমন হাঁটে না। তারপর কী করে সেই গাছের কথা জানা গেল সেটা অন্য বৃত্তান্ত।

হয়তো নির্ভুল সীমানা ছকার একটা নেশা আছে বলেই গল্প উপন্যাসই আমি লিখি। রেজিস্ট্রি অফিসের বটতলায় বসে, এখন কোথাও কোথাও চালাঘর হয়েছে, যাঁরা জমিজমা বেচাকেনার দলিল লেখেন তাঁর আগের দলিল থেকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বের করে নেন এই জমির সীমানার নির্ভুল সব নিশানা। চারটি নিশানা বের করতে পারলেই জমির পাক্কা ফ্রেম তৈরি হয়ে যায়। সারা বসুমতীই তো জমি। এই ফ্রেমের জোরেই কোনো জমি আমার, কোনো জমি আমার নয়। এই নিশানা গড়ার, এই ফ্রেম করার একটা নেশা আছে। সেই নেশার একটা টান আছে। অমন নেশার টান না-থাকলে যখন এই বয়সে বানিয়ে বানিয়ে কে আর গল্প-উপন্যাস লিখতে যায়? গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে নথি তৈরি করা, দলিল তৈরি করা, বাড়ির প্ল্যান তৈরি করা— এই সবকিছুকে মিলিয়ে ভাবটা আমার অভ্যাসে এসে গেছে। এতই ভিতরের সেই অভ্যাস যে কোনো একট গল্প বা উপন্যাসের কথা ভাবার সময় এই কাজটাই আমাকে লোভ দেখায়। শরীর রোমাঞ্চ নিঃসাড় হয়। পায়ে জ্যান্ত-শরীরের গন্ধ পাওয়া বাঘের চলন আসে। আর নিজেকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সে সব ওই গল্পে বা উপন্যাসে কোথায় ছড়িয়ে যায়, হারিয়ে যায়, তা হয়তো আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়া যায় না, বা খোঁজার কথা মনেই আসে না, এমন সব তথ্যপ্রমাণেই একটা গল্প বা উপন্যাস বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। আমি 'বিশ্বাস্য' লিখতে চাইনি। গল্প-উপন্যাসের পক্ষে 'বিশ্বাস্য' হয়ে ওঠা খুব সহজ কাজ। বিশ্বস্ত হয়ে ওঠা সবচেয়ে কঠিন কাজ, কার কাছে, জানি না। এক উপন্যাসে লিখেছিলাম, মা বেঞ্চিতে বসে দেখছেন, তাঁর ছেলের পরিচয়ে এক মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি তাঁর আঁচল দিয়ে নাক-মুখ-চিবুক ঢাকেন। আর-একটি উপন্যাসে লিখেছিলাম, শান্তিনিকেতনের ট্যুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে একটি বিবাহিত মেয়ে রিক্সায় উঠছে, এই প্রথম সে শালোয়ার কামিজ পরেছে। রাস্তায় হঠাৎ সে তার বুক ঢাকতে দুই কাঁধ এগিয়ে আনে। যার কথা লিখছি, এ বোধহয় তার শরীর ও মনের কাছে বিশ্বস্ততা।

কিন্তু এ তো নীতিবোধের কথা হল— হোক না আমার ব্যক্তিগত নীতিবোধ। এ বোধ অবিশ্যি লেখার প্রথম ভাবনাতেই মিশে থাকে। তখন না লিখে পারা যায় না? সত্যি কি না লিখে পারা যায় না? এই প্রশ্নের উত্তরে এত মিথ্যা প্রচলিত হয়ে আছে যে বলতে ইচ্ছে করে, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর জানি না। কোনো কোনো সময় এমন হয় যে গল্পটির বা উপন্যাসটির নানা আলাপ, নানা ঘটনা, নানা দৃশ্য, নানা ধ্বনি শারীরিকভাবে এমন আবিষ্ট করে ফেলে যে 'ধুত্তোর' বলে লিখতে বসতেই হয়। অথচ গল্প-উপন্যাস এমনই অনেকটা সময় ধরে, কখনো বা কয়েকটা বছর ধরে, করার মতো কাজ যে 'ধুত্তোর' বলে বসা যায় না, লিখে ফেলাও যায় না। তার জন্য অনেকগুলো কুড়ুল থেকে একটা কুড়ুল বাছতে হয়, তার মানে কোন গাছের বনে ঢুকতে হবে তা দেখা থাকা চাই। কুড়ুলে শান দিতে হয়, তার মানে রাস্তায় শান দেওয়ার পাথর থাকবে না তা জানা থাকা চাই। দুই তিন পেট ভরে জল নিতে হয়, তার মানে যে রাস্তায় যাওয়া সে রাস্তার মাটির কতটা তলায় জল তারও নিশানা থাকা চাই। এত সব কিছু জানা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অজানার দিকে টুপ করে একদিন হাঁটা দেওয়া!

এর ভিতর একটা গোলকধাঁধা আছে।

অনেক দিন ধরে লিখতে লিখতে এখন হাল এমন হয়েছে যে না লিখে ফেললে আমি বুঝতেই পারি না, কী ঘটল, বা কী বুঝলাম, বা কী দেখলাম। আবার, লিখতে গিয়ে চমকে চমকে উঠি— এই ঘটনার সঙ্গে ওই ঘটনার বা এই চোখ জোড়ার সঙ্গে ওই পা জোড়ার যে এমন মিল তা তো জানতাম না। যাকে রোজ দেখি, বা, যা রোজ দেখি, এক লিখতে গিয়েই বুঝি তাকে কতটাই আলাদা করে দেখেছি, বা, সেটার গড়ন কতটাই অন্যরকম। যখন দেখি, শুনি, ছুঁই বা গন্ধ পাই তখন একবারের জন্যও মনে আসে না এগুলো লেখার বিষয় বা লেখার সময় এ-সব আবার দেখতে বা শুনতে পাব, ছুঁতে পারব, বা এ সবের গন্ধ পাব। অথচ যখন লিখতে বসি, তখন যা দেখিনি তাও দেখি, যা শুঁকিনি সে গন্ধও পাই। গল্পের বা উপন্যাসের ভিতর দিয়ে এই দ্বিতীয় বারের দেখা বা শোনা বা ছোঁয়াই, আমার আসল দেখা বা শোনা বা ছোঁয়া। যা আমি লিখি না, তা আমার সবটা দেখা হয় না, বা শোনা হয় না, বা ছোঁয়া হয় না। কী যে লিখব তাও তো আগে জানা থাকে না। ফলে দেখা, শোনা, ভুলে যাওয়া, মনে আনা, এ-সব নিয়ে একটা গোলকধাঁধা তৈরি হয়েই থাকে বা এমন এক গোলকধাঁধার মধ্যেই সব সময় ঘুরতে থাকি। গোলকধাঁধার ভিতরও নানা গোলমাল আছে। যা দেখি, বা ছুঁই বা শুঁকি তাই নিয়েই যে সব সময় লিখি তা তো নয়। লিখতে লিখতেই সেই সব দেখা হয় বা ছোঁয়া হয় বা শোঁকা হয় যা লেখার বাইরে কখনো ঘটেইনি। সব মিলিয়ে একটা ভুবুণ্ডির মাঠ। এ জন্মের স্বামীর দাবিতে আর এক জন্মের বউ তালগাছ থেকে মড়াৎ করে নেমে আসে। কতগুলো পূর্বজন্মের কতগুলো বউ আছে কত তালগাছে তা কি কেউ জানতে পারে?

সব মিলিয়ে খুব, খুবই বিষাদ। সে এমনই এক শোক যে শোক ভুলব ভাবলে নিজের

বাঁচার ইচ্ছে চলে যায়। এই বাঁচার যেন একটাই মাত্র মানে— সেই শোক, সেই বিষাদ কোনোদিন ভুলব না। আর লেখা মানে তো সেই বিষাদ আর শোকে, স্মরণে আর বিলাপে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা।

আমার মৃত্যুর আগেই যদি চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, কান প্রতিধ্বনিহীন হয়ে যায়, গলা স্বরহীন হয়ে যায়, পা চলনহীন হয়ে যায়, সে সবই আমি সইতে পারব যদি তখনও লিখতে পারি। সব দেখা-শোনা-বলা-চলা তখন সম্পূর্ণ করতে থাকব। মানুষ হিসেবে জন্মেছি বলেই তো জন্মসূত্রে চোখ-কান-মুখ-পা পেয়েছি। ওতে আর আমার বাহাদুরি কী? মানুষকে তো আমি আমার লেখাটুকুই দিতে পেরেছি। ওটুকুই আমার একেবারে নিজের। যা পেরেছি, আমিই পেরেছি। আর কেউ পারত না। আর কেউ পারবেও না।

পৃথিবীর সঙ্গে লেখকের একক লড়াই

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

(জন্ম: ১৯৩৬)

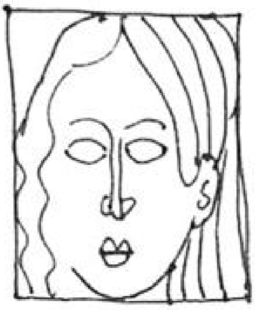

অনেক কাল বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত আছি। অনেক কালই — পঁয়তিরিশ বছর কি তারও বেশি হবে। যুক্ত আছি প্রধানত কবিতার সঙ্গে। কিন্তু কেন আছি— এ প্রশ্ন নিয়ে এবার ভাবতে হচ্ছে। হতে পারে— লেখাপড়ার সংসারে জন্মেছি বলে। কিন্তু সৃজনশীল লেখায়, বিশেষত কবিতা লেখায় গেলাম কেন? মনের মধ্যে কী ইচ্ছে ছিল? বাইরের ঘটনা তো উপলক্ষমাত্র, ফস করে দেশলাই জ্বালানো যেমন। আসল কথাটা কী, বোঝা দরকার।

অনেক কাল কিন্তু কিন্তু করে প্রকাশ্যে লেখার সাহস হল যখন, তখন ছয়ের দশক। তখনই তো সেইসব অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজনৈতিক আদর্শের ওলটপালট, সামাজিক সম্পর্কের কাটাছেঁড়া, নিজের ব্যক্তিজীবনের পরিবেশবদল, উপার্জন, স্বাধীনতার দীর্ঘচ্ছেদ, আর কলকাতাকে ছেড়ে যাওয়া। অগত্যা অনভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতায় পাক খেতে খেতে

কবি যা লেখে, তা তার নিজ সময়ের এক বিশেষ দলিল। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার টানাপোড়েনের ব্যক্তিগত নথি। সমাজে তার অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা। পরিবেশের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষতচিহ্ন।

আমার লেখাগুলি একান্তে বাড়তে লাগল কবিতার কাঠকুটোয়। বাড়তে বাড়তে একের পর এক কাব্যগ্রন্থ বেরোল, প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন যেগুলোর দাম দুই থেকে পাঁচ টাকার মধ্যে। এখন তেমন বই ছাপা হলে অবশ্যই দাম হবে কুড়ি থেকে তিরিশ টাকা।

লিখেছি কেন তখন? নানাভাবে বলার চেষ্টা করা যায়। একটা ব্যাপার অনুভব করছি, মনে হচ্ছে এই ভাবনাকে ভাষায় রূপান্তর করলে একটা অপূর্ব কিছু তৈরি হবে, সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলছি। আপনাআপনিই স্থির হয়ে যাচ্ছে আঙ্গিক-আঁটোসাটো বা হালকা ছন্দে, কখনও বা গদ্য চেহারায়। আমি নিজেই তার শিক্ষক, সমালোচক বা ছাত্র— বের করছি ফন্দিফিকির লেখার কায়দা, শব্দ বদলের রহস্য। পাঠক সঙ্ঘের সঙ্গে গড়ে উঠছে এক একতরফা সম্পর্ক, সে আর এক সুখ দুঃখের খেলা। সে আর এক অদ্ভুত আনন্দ। তবে এ তো ঠিক যে নিজের লেখার বিষয়ে বা লিখনভঙ্গি বিষয়ে সচেতনতা খুব চট্ করে আসে না। যা লিখছি তাকে বিষয় আর গঠন দুই মিলিয়ে, শুদ্ধ মৌলিক রচনা হতে হবে একথা জানা ছিল। কিন্তু ক্রমে জানা গেল— ঐতিহ্য, সময়, সমাজ, আধুনিকতা এসবের সঙ্গে ব্যক্তি আমি'র মোকাবিলা হয় লেখায়। ক্রমে অধুনা বেশি গুরুত্ব পায়, সে চায় ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে। যে কোনও সফল লেখা হচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে লেখকের একক লড়াই, অবিশ্রাম। যত লড়াই, যত উদ্বেগ, তত সফলতা, ততটাই আত্মবিশ্বাস।

কোনও লেখক কখনও কখনও কৃত্রিমভঙ্গি তৈরি করে নেয়, যাতে বৈশিষ্ট্য বেশি করে চোখে পড়ে। পড়েও এবং কাজটা লোভনও বটে। কিন্তু কষ্টকল্পিত বা কৃত্রিম লেখার ঝুঁকি খুব বেশি। আর উপলব্ধিমূলক লেখার স্থায়িত্ব ও প্রভাব বেশি, জায়গাও বিশাল। যা লিখব তা প্রভাবশালী হবে, তাতে থাকবে আবেগ জাগাবার ক্ষমতা, সে লেখা চিন্তিত, আলোড়িত করবে অপর কবি-স্বভাবকে, তবেই সে লেখা ওজনদার; দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়, যুক্তাক্ষরে নয়। সম্পূর্ণ বানানো লেখা অনেক সময় সুন্দর হয়, কিন্তু সে বিশ্বাসের জমিতে সম্ভবত স্থায়ী চিড় ধরায়।

ক্রমে বুঝি, লিখতে লিখতে লেখার হাত তৈরি হয়, যেমন পড়তে পড়তে পড়ার ধাত। লিখতে লিখতে লেখক-পাঠক সংযোগ তৈরি হয়। নিজের পাঠককে আবিষ্কার করার বা তাকে লেখার প্রতি অভিমুখ করার দায়িত্ব তো লেখকেরই।

লেখকসত্তা ছাড়াও মানুষের অন্যান্য সত্তা থাকে, সারাক্ষণ কেউ লেখার কাজ করে না। কিন্তু সেই অন্য সত্তা যখন অন্য কাজ করে, তখনও লেখকের ভিতরে চলতে থাকে লেখার সঙ্গে আলাপচারি। লেখার জন্য ভালোবাসা যদি থাকে, তবে ভিতরের স্থির কেন্দ্রটি পরিচালকের ভূমিকা নিয়ে নেয়; ফলে পরিবেশ থাকে নিয়ন্ত্রণে, জাগ্রত থাকে চিৎশক্তি।

ক্রমে বুঝতে পারা যায়— কবি যা লেখে, তা তার নিজ সময়ের এক বিশেষ দলিল। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার টানাপোড়েনের ব্যক্তিগত নথি। সমাজে তার অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা। পরিবেশের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষতচিহ্ন। এই পৃথিবীতে কবির বেঁচে থাকার সময়খণ্ড তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে কথার লিপি থাকে তার লেখার মধ্যে।

এইসব ভাবি আমি। ভাবতে ভাবতে সংশয়ে কুঁকড়ে যাই— সত্যি কি লেখাকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়েছে এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে! না লিখতে পারলে কি শূন্য বোধ করি। একটা যথাযথ লেখা লিখে উঠতে পারলে কি প্রাপ্তি-সুখে মন ভরে যায়? নয়তো দৈনিক এত দূষণ গলাধঃকরণের পরেও বেঁচে থাকি কেন। লেখা থেকেই তো বোঝা যাবে শেষমুহূর্ত অবধি সার্থকতার সংজ্ঞা অটল থাকে কিনা। ক'খানা বই, ক'টা পুরস্কার, কীরকম গণমাধ্যমসংযোগ— এসব হিসেবের ক্ষমতা অর্জন করতে পারিনি। পারলে আমার লেখা আর আমার লেখা থাকত না। এখনও লিখে যাচ্ছি তার কারণ, সম্পর্ক নির্ণয়-চেষ্টা করে যেতে হবে। জীবন আর তার সৃষ্টির সম্পর্ক। বিরাট জলোচ্ছ্বাসের ওপরে একফোঁটা নৌকো নিয়ে পারাপারের চেষ্টা। ও-ই চেষ্টা, ও-ই লড়াই, ও-ই সার্থকতা।

সৌজন্য: ঋত্বিক ত্রিপাঠী সম্পাদিত *জলদর্চি*

জলদর্চি সংগ্রহ করতে চাইলে ঋত্বিককে ফোন করুন: ৯৭৩২৫-৩৪৪৮৪

নাসের হোসেনের চারটি কবিতা

ব র্ম

কোনো কি অনুষ্ঠান হবে, সকলে এসে বসেছে চেয়ারে
বিভিন্ন পোশাক পরে আছে তারা, বিভিন্ন স্তরের তাদের
যাপনপ্রণালী, ফলে এটা বেশ মহামিলনের মেলা
ভারতের ভাষার সংখ্যা তো কম নয়, প্রত্যেকের
দু-পাশে এমন দু-জন বসেছে যারা কেউ কারো
ভাষা বুঝতে পারে না, তাতে যে অসুবিধের কিছু
ঘটেছে তা অবশ্যই নয়, দিব্যি খোশমেজাজে একে
অপরকে নানান অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে, কেউ কারো
ভাষা না-জেনেও এই যে নিজের ভাষায় সংযোগস্থাপন
এ যে না দেখেছে সে ধরতে পারবে না ব্যাপারটা
ঘটছে কীভাবে, এবার আসবেন ডাক্তারবাবু, রোগী
দেখবেন শুধু নয়, কথাও বলবেন সম্পূর্ণ তাঁর নিজের
ভাষায়, ডাক্তারখানায় এলেই রোগীরা অনেকটা সুস্থ হয়ে যায়

নী চে

অনেকগুলো মাছ খেলা করছে, অ্যাকোয়ারিয়ামে নয়
সমুদ্রের নীচে, ডিসকভারি চ্যানেলে দেখছিলাম, নিজেই
সরাসরি ডিসকভার করার সুযোগ যখন নেই তখন
এই টিভি দেখার সুযোগটাকে কাজে লাগাই, কত রকমের
মাছ আর কত তাদের রং, সমুদ্রের নীচে প্রায়-অন্ধকার
সেখানে এত রং দেখছে কে, নিশ্চয়ই রংগুলো কাজে লাগে
প্রকৃতি কোনোকিছুই এমনি-এমনি করে না, কোনো-না-কোনো
কাজে লাগাবেই, শুধু কি মাছ, আরো কতরকমের জলজ
প্রাণী, এছাড়াও রয়েছে ডুবোজাহাজ, যার ভিতরে বসে আছি
এখন এই জাহাজটাই হচ্ছে অ্যাকোয়ারিয়াম আর সমস্ত
জলজ জীব ভিড় করে দেখে যাচ্ছে আমাদের, কেউ বয়ে
আনছে খাবার, সে-খাবার কি খাওয়া যায় রে ভাই, যায় না
আর আসছে তাদের স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা, জলের স্কুলের

গৌ র

রিক্সাভর্তি কেবল পিতলের ঘড়া, জলহীন, শব্দহীন,
রিক্সাঅলা নেই, কোথাও খেতে গেছে সম্ভবত, রিক্সাটা
একা দাঁড়িয়ে, তার সমগ্র শরীরে বেঁধে রাখা আছে
ঝকঝকে কাঁচা-হলুদ রঙের পিতলের ঘড়া, সদ্যনির্মিত
কারখানা থেকে সেসব নিয়ে যাওয়ার আলাদা গাড়ি আছে
তবু কীভাবে এবং কেন যে রিক্সায়, রিক্সাঅলা যতক্ষণ
না আসছে জানার উপায় নেই, নিশ্চয়ই কোথাও পৌঁছতে
হবে, কিন্তু এখন যেটা ঘটেছে সেটা হল পৌঁছনোর
আগে অন্য কোথাও পৌঁছে যাওয়া, এটাও তো জানা কথা
যে ঘড়ারা সবসময় তৃষ্ণার্ত থাকে, তার ভিতরে যখন
জল ঢোকে সে যে কী অবিশ্রাম তৃষ্ণা মেটানো, আর
এটাও তো ঠিক যে তৃষ্ণার্তরাই তৃষ্ণার্তদের মর্ম বোঝে, তারা
নিজেরা জলে ভরে উঠলেই তৃষ্ণার্তদের জলদানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে

খে দ

খেজুরগাছ খুব কম দেখা যায়, তবু এই যে চারপাশে
এতগুলো খেজুরগাছ দেখতে পাচ্ছি এ আমার ভাগ্য
দুর্ভাগ্য যেটা সেটা হল এর প্রত্যেকটিতে কোনো
কলস ঝোলানো নেই, পাতাগুলোও কেমন কুঁকড়ে
ছোটো হয়ে যাচ্ছে, পাশের পুকুরে জল নেই, কয়েক
গোছা শীর্ণ ঘাস কোনোরকমে নিজেদের অস্তিত্বের
প্রকাশ ঘটাচ্ছে, কিন্তু এমন দুর্দশা হল কী করে, এই
তো পাশেই যে নবকেষ্ট গ্রাম সেখানে দেখলাম
জল ও ইলেকট্রিকের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, আবার
এই হতবেষ্ট গ্রাম কীরকম 'বেশ তো, এমনটাই হয়'
গোছের মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে, লোকগুলোই
বা গেল কোথায়, এখন আর আগের দিনের মতো
মহামারী হয় না, বৃষ্টি যদি নাই-ই হয়, মানুষ দেখবে না?

কলকাতার ইতিবৃত্ত

কলকাতা শহরের ইতিহাস অতীতে নানা মহাজনের কলমে নানা আঙ্গিকে আমাদের পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। রাধারমণ মিত্র থেকে শুরু করে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত কিংবা শ্রীপান্থ থেকে পূর্ণেন্দু পত্রী — প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের মতো করে প্রাচীন এই শহরের ইতিবৃত্ত শুনিয়েছেন আমাদের। মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে শুরু করে কালীঘাটের পটে 'মোহন্ত-এলোকেশী'র বৃত্তান্ত, এমনকী কলকাতার রাস্তায় ফেরিওয়ালার ডাকের বিবর্তন পর্যন্ত চমৎকার ভাবে উঠে এসেছে এঁদের লেখায়। সম্প্রতি কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্তের একটি বই পড়ার সৌভাগ্য হল, সেও আপনার পত্রিকারই 'বই-ঠেক' শীর্ষক কলমে বইটির হদিশ পেয়ে। বইটির নামটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, সংক্ষেপে 'বোতলের কৌতুক' নামে উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরনো পাঁজি ও সাময়িক পত্রে ছাপা হওয়া বিজ্ঞাপন থেকে আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতা শহরকে ব্যাখ্যা করার অনবদ্য এক প্রয়াস মুগ্ধ করেছে। কলকাতা শহরকে নিয়ে এতশত কাজের মধ্যে অধিকন্তু, যার উল্লেখ না করলে নেহাতই শহরটার সঙ্গেই প্রতারণা করা হবে— সেটি হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়'। নবীনকুমার তথা বাস্তবে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তৎকালীন সমাজকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার যে-ছবি প্রয়াত কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই বিপুলায়তন উপন্যাসে এঁকেছেন, এককথায় তার কোনওই বিকল্প নেই। কোনও নীরস গবেষণা নয়, অথচ পুরনো কলকাতার কোনও অপূর্ণতাই যেন এই বইয়ে নেই। অনেক সমালোচক 'সেই সময়'কে সুনীলবাবুর অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলেন— তাঁরা কিছু ভুল বলেন না।

বস্তুত ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত গাইতে বসেছি। যে-কারণে এত কথা মনে এল, তা হচ্ছে, আপনাদের সাহিত্যপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'স্ট্রিট লেন বাই-লেন' শীর্ষক লেখাটি। পুরনো কলকাতার কথা বলতে গিয়ে তপনবাবু কলকাতার প্রাচীন অলিগলি-রাস্তার ওপর নির্ভর করেছেন। আঙ্গিকটি অভিনব না হলেও, তপনবাবুর অনুসন্ধিৎসু মন এবং লেখনী কলকাতার ইতিহাস রচনার ধারায় এই ধারাবাহিকটিকে স্বতন্ত্র করেছে।

কলকাতার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তাঁর লেখায় বর্ণিত ঘটনাপরম্পরার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার সায় পাচ্ছি। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেক অজানা বিষয়ও প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে, যা থেকে শিখছি। এপ্রিল সংখ্যায় তপনবাবুর লেখাটি বেশি ভালো লাগল কারণ, জন্মসূত্রে আমিও শ্যামবাজার অঞ্চলেরই বাসিন্দা। তপনবাবুর লেখাটি পড়তে পড়তে তাই পুরনো অনেক স্মৃতি চোখের সামনে ভাসতে থাকল। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার একসময়ের গর্ব 'যুগান্তর'-এর প্রসঙ্গ এসে যেন স্মৃতিবিহ্বল করে তুলল।

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ কয়েকটা সরু গলি পেরিয়ে যুগান্তর অফিসের কাছে পৌঁছতাম। পৌঁছতাম অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়, প্রথমত ছাপার মেশিন চলার শব্দটা ভালো লাগত আর দ্বিতীয়ত, যুগান্তর-এর ক্যান্টিনটি ছিল অল্পমূল্যে অনবদ্য স্বাদের খাবারের আকর। আর সেখানে সকলেরই জন্য ছিল অবারিত দ্বার। আমরা ছেলেরা দল বেঁধে যেতাম দুপুরেই বেশি। তখন একজন-দু'জন করে নামী সাংবাদিক ও লেখকরা আসতে শুরু করতেন। তখন তো টেলিভিশন ছিল না। কাজেই লেখককে বা সাংবাদিককে সহজে চেনা যেত না। এর জন্য হত কী, যুগান্তর অফিসে যাওয়া-আসা করা সকলের প্রতিই আমাদের ছিল বিশেষ সম্ভ্রমের ভাব। মনে আছে, মণীন্দ্র রায়কে প্রায়ই দেখতাম তাঁর একচিলতে ঘর আলো করে একাই বসে আছেন। মণীন্দ্র রায় তখন 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক। কোথায় গেলেন সেই মানুষেরা! কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব মুগ্ধ করা দিন! এখন হাতে রইল শুধু পেনসিল!

পরিশেষে এইটুকু বলার— আমরা যারা কলকাতা শহরটাকে বন্ধুর মতোই ভালোবেসে এসেছি, তাদের কাছে 'স্ট্রিট লেন বাই-লেন'-এর মতো মণিমুক্তোসম রচনা অনেক বেশি প্রাপ্তি। এই ধারাবাহিকটি আরও উপভোগ্য হোক, এই শুভকামনা থাকল।

শ্যামল গুপ্ত
শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা

কমলকুমারের চিঠি

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার বিগত তিন সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত পত্রস্মৃতি ১ ও পত্রস্মৃতি ২ শিরোনামে যথাক্রমে কমলকুমার মজুমদার ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত'র চিঠির ঝাঁপি নিঃসন্দেহে হৃদয় আকুল করে তুলল। বিশেষত কমলকুমারের চিঠিগুলি যেন সোনার খনি। কমলকুমারের দুর্ভাগ্য, তিনি আড্ডারসিক ও 'মিথ' হিসেবে যতখানি আলোচিত হন, ততটা আলোচনা কখনওই হয় না তাঁর লেখালেখি নিয়ে। কিন্তু চিঠিগুলির পরতে পরতে তাঁর আত্মাভিমান ভীষণই স্পষ্ট। সেই সঙ্গে অসহায় খেদ— গল্পগুলি সরল বলেই লোকের কাছে তা কঠিন ঠেকে— যেন হৃদয়ে ঘা দিয়ে গেল। মনে হল, লেখক হিসেবে কমলকুমারের পুনর্মূল্যায়নও বোধহয় খুব জরুরি।

সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, *সিঁথি, কলকাতা*

একাত্তরের শেষভাগ

'একাত্তরের দিনগুলি' শেষ হয়ে গেল। খুবই মর্মস্পর্শী ও উপভোগ্য একটি লেখা পড়লাম, সন্দেহ নেই। একটি গৃহবিপ্লব ও তার বীভৎসতা কীভাবে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনেও আঘাত হানে, তার করুণ কাহিনি বিবৃত করেছেন লেখিকা। বাংলাদেশে শহীদের মা হিসেবে মানুষের মনে এখনও তাঁর স্থান খুবই উচ্চে। রচনাটির শেষ পর্যায়ে স্বামীর মৃত্যু এবং বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এই দুই আপাত বিপরীতধর্মী অনুভূতির উল্লেখ করেছেন লেখিকা। যদিও তাঁর বিপ্লবী পুত্র রুমীর সম্পর্কে আর কিছু লেখেননি। এখানটায় কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ মনে হয় লেখাটি। তবু, আগামী দিনে 'কালের কষ্টিপাথর'-এ এমন একটি উপভোগ্য রচনা থাকবে না ভেবে খারাপ লাগছে।

স্বপন দাস, *বারাসাত*

কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

এসপ্লানেড

সাহিত্যিক শংকরের বিখ্যাত উপন্যাসের শুরুটা এরকম: ওরা বলে এসপ্লানেড, আমরা বলি চৌরঙ্গী।

তারও অনেক আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতার কয়েক লাইন উল্লেখ করা যাক:

ট্রাম-বাসের ঠাসাঠাসি
আর ট্রাক, মোটর, লরির
ধোঁয়া-ছাড়া ধুলো-ওড়ানো কাৎরানিতে....

এসপ্লানেডের রঙীন কটাক্ষ
হয়তো তাকে নাচাতে চাইবে।
কিন্তু গড়ের মাঠের পাড়-বসানো গাছগুলো
থেকে থেকে মৃদু মর্মরে
তাকে মন্ত্রণা দেবে এলায়িত প্রশান্তির....
(দিনটা/প্রেমেন্দ্র মিত্র)

আসলে যারা বহু বছর ধরে কলকাতার বাসিন্দা, তাঁরা এসপ্লানেড শব্দটির উল্লেখমাত্রে অবলোকন করেন এক কল্লোলিনী তিলোত্তমার চোখ-ধাঁধানো রূপ। এখন তার যেদিকে চোখ পড়ে শুধু বিপণনের তীব্র আমন্ত্রণ, নানা প্রলোভনের শতবাহু হাতছানি, সন্ধের পর তার

নিয়ন-হ্যালোজেনের হুল্লোড়-মেশানো রোশনাই। পাশাপাশি অনেকগুলি প্রেক্ষাগৃহ, নানা কোম্পানির ঝকঝকে শোরুম, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বইয়ের স্টল, স্টুডিও, পেল্লাই সব বাড়িতে নানা অভিজাত কোম্পানির অফিস। চতুর্দিকে হোর্ডিংয়ে হোর্ডিংয়ে ছয়লাপ।

আর আছে যানবাহনের ভিড়, তাদের চমৎকারিত্ব।

কলকাতার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে হলে এসপ্লানেড ছুঁয়ে যাওয়াটা কিছুকাল আগেও ছিল বাধ্যতামূলক, এখন আর নয়। যাঁরা বাইরে থেকে কলকাতায় আসেন, তাঁদের কাছে এসপ্লানেড মানে আসল কলকাতা। দিল্লির কনট প্লেস যেমনটি।

এসপ্লানেড এলাকার আরও একটি নাম আছে— ডিহি বিজরি। গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের ভাই জর্জের এক বিশাল সম্পত্তি ছিল এই ডিহি বিজরিতে। বার্ষিক খাজনা দিতেন মাত্র সাতশো উননব্বই টাকা। ছ'শো বত্রিশ বিঘা জমি তিনি পনেরো বছরে মোট বারো হাজার টাকায় কিনে নিতে পারবেন এই ছিল নাকি শর্ত। ভাবা যায়!

কিন্তু এই এসপ্লানেড গড়ে উঠতে সময় লেগেছে কয়েকশো বছর। ছিল অসাড় জঙ্গল, থাকত নানা হিংস্র জীবজন্তু। জায়গাটা ঠিক কীরকম ছিল তা আমার জানার আগ্রহ হয় উনিশশো নব্বই সালে যখন সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতার জন্মের তিনশো বছর পালিত হয় খুব ধুমধাম করে। ষোলোশো নব্বইয়ের ১৬ আগস্ট জব চার্ণকের কলকাতায় পদার্পণ উপলক্ষকে জন্মদিন বলে ধরেই এই উৎসব। কিন্তু আমি সেই ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে জানতে পারি জব চার্ণক আসার আগেও ছিল এক সমৃদ্ধ লোকালয়। সপ্তগ্রামের শেঠ-বসাকরা সরস্বতী নদী মজে যেতে তাঁদের তাঁতের মহল্লা তুলে চলে এসেছিলেন এখন যেখানে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং সেখানে মাটির তৈরি বিশাল বাড়ি করে। আর যেখানে মনুমেন্ট, সেখানে বসিয়েছিলেন কয়েকশো তাঁতিকে। সেই ইতিহাস ভারি রোমাঞ্চকর। আমি লিখেও ফেলেছিলাম একটি উপন্যাস, 'শিকড়ের খোঁজে মানুষ'। কিন্তু কলকাতা জানার খিদে তার পরেও মেটেনি আমার। এখনও সময় পেলেই খুঁজে খুঁজে ফিরি পুরনো কলকাতার পরশপাথর।

এসপ্লানেড বিষয়ে অনেকটাই জানা যায় কলকাতা বিষয়ক ইতিহাসবিদ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের লেখায়। ১৯১৫ সালে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'সিরাজউদ্দৌল্লা যে সময়ে কলকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সহরের মধ্যে ইংরেজদের ৭০ খানি বাড়ি ছিল। এখন যাহা এসপ্লানেড, চৌরঙ্গী ও ফোর্ট উইলিয়াম, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দেও তাহা জঙ্গলময় ছিল।'

অন্যান্য ইতিহাসবিদেরও অনুমান তার পর থেকেই শুরু হয় এলাকার জঙ্গল কাটাই। ক্রমে ইংরেজরা দখল করতে থাকে ক্ষমতা। জঙ্গল কেটে কেল্লা তৈরি হওয়ার দিন থেকেই এলাকার উন্নয়নের শুরু। তবে শোনা যায় ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি একটুও খুশি হননি জঙ্গল কাটানোর সিদ্ধান্তে, কেননা তিনি মাঝেমধ্যে বন্দুক নিয়ে শিকারে যেতেন ওই এলাকায়।

জঙ্গল কাটাই হচ্ছে, একটু একটু করে হাসিল হচ্ছে জমিন। ইংরেজ সভ্যতা ঢুকছে পায়ে-পায়ে। একটা একটা করে বাড়িও তৈরি শুরু হয়েছিল এ সময়। পুরনো কলকাতার যে-সব ছবি বইপত্রে দেখতে পাই তারও শুরু অনেক দেরিতে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে গড়ে উঠছে এই এলাকার অভিজাত পত্তন।

ক্রমে এসপ্লানেডের শরীরে রং ধরতে শুরু করে। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের দু'টি ঘটনার কথা জানলে অনুধাবন করা যায় সেই বিবর্তনের রূপ। ১৭৮৫ সালে কোনও একজন মি. উইনটল রাত আটটা-ন'টা নাগাদ একটি বেলুনে চড়ে শূন্যে উঠেছিলেন, কিয়ৎক্ষণ শূন্যে বিচরণ করে, সোয়া মাইলের মতো ওপরে উঠে আবার নেমে আসেন নীচে। দ্বিতীয় ঘটনাটিও বেশ চমকপ্রদ। একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, 'নতুন কোর্ট হাউসের কাছে এসপ্লানেডে যে সুন্দর বাড়িটির ভাড়া মাসিক ছ'শো টাকা ছিল, তা পাঁচশো টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটির সত্বাধিকারীর নিকট আবেদন করুন।'

১৭৮৯-এর একটি ঘটনাও বেশ চিত্তাকর্ষক। পুলিশের পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে, এসপ্লানেডের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে, সেই রাস্তা ও তৎ-সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে ২০ মার্চ থেকে আর কেউ ঘোড়া-ব্রেক করতে পারবেন না। সহিস ও কোচোয়ানদের যেন সম্যক অবহিত করে দেওয়া হয় এই আদেশটি।

১৭৯০ সালে এসপ্লানেডে, যেখানে এখন ট্রাম-গুমটি আছে, তার কাছাকাছি ভালো পুষ্করিণী না-থাকায়, সেখানে জঙ্গল কেটে একটি পুষ্করিণী খননের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৭৯৫ সালে একটি নোটিস জারি করা হল এই বলে যে, এসপ্লানেড ও কেল্লার রাস্তায় রাহাজানি বেড়ে গিয়েছে, এ-বিষয়ে অনুসন্ধানে জানা যায় কয়েকজন গোরা-সৈনিক এ-কাজে জড়িত। যাঁদের জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছে তাঁরা যেন অবিলম্বে অভিযোগ জানান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

অতঃপর বিচারে রায় হল, তিন গোরাসৈনিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের হাতের একটা অংশ পুড়িয়ে দেওয়া হবে ও সেইসঙ্গে দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

১৮২২ সালে ফ্যানি পার্কস নামে এক ইংরেজ মহিলা বাস করতেন এখানে, তাঁর লেখা স্মৃতিচিত্রণ কলকাতার অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। তিনি এখানে যে-বাড়িটিতে বাস করতেন, তার ভাড়া ছিল তিনশো পঁচিশ টাকা। পাশাপাশি বাড়িগুলির ভাড়া ছিল চার থেকে পাঁচশো।

এসপ্লানেড ক্রমে জনবহুল হয়ে ওঠায় হেয়ার স্ট্রিট থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (পরে নাম হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরি) সরিয়ে এসপ্লানেডে আনা হয়েছিল, পরে নিয়ে যাওয়া হয় বর্তমান স্থান বেলভিডিয়ারে।

এসপ্লানেড অঞ্চল ক্রমে নির্দিষ্ট করা হয় লাটসাহেবের বাড়ি গড়ে তোলার জন্য। তৈরিও হল সেই বাড়ি, কিন্তু প্রথমদিকে তার নির্মাণ এতই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, হেস্টিংস কখনও এখানে থাকেননি, থাকতেন আলিপুরে একটি বড় বাড়িতে। সেসময় একজন ইংরেজ রাজপুরুষ লাটভবন দেখতে এসে মন্তব্য করেছিলেন, এসপ্লানেডের নিকট এই দ্বিতল বাড়িটি তত জাঁকালো শ্রীসম্পন্ন নয়, বরং তার আশপাশে অনেক ভদ্রলোকের বাড়িঘর দেখতে অনেক সুন্দর। পণ্ডিচেরির গভর্নরের বাড়িও অনেক সৌন্দর্যময়।

হয়তো তাঁর মন্তব্যেই নতুন রাজভবনের শুরু।

তবে এসপ্লানেডের গরিমার পূর্ণ প্রকাশ ঘটার শুরু ১৮২৮ সালে মনুমেন্ট নির্মাণের সময় থেকে। একজন ইংরেজ বীরসেনা স্যার ডেভিড অক্টারলোনির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় নির্মিত হয় এই স্মৃতিসৌধটি।

১৮৪১ সালের 'বেঙ্গল অ্যান্ড আগ্রা গেজেটিয়ার'-এ লেখা আছে, 'ফোর্ট উইলিয়াম অ্যান্ড এসপ্লানেড আর দ্য সাইটস হয়্যার দিস ফরেস্ট অ্যান্ড দ্য টু ভিলেজেস অ্যাবাভ-নেমড স্টুড।'

তবে এসপ্লানেড নামটি কেন হয়েছিল তা উল্লেখ করা নেই কোথাও। সমস্ত নথিতে লেখা আছে চৌরঙ্গী রোডের কথা। আসলে এসপ্লানেড এই ইংরেজি শব্দটির অর্থ 'একখণ্ড সমতলভূমি যা সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য। নিকটবর্তী দুর্গ থেকে শহরকে পৃথক করে রাখে সেই সমতলভূমি।' সম্ভবত ইংরেজরা চৌরঙ্গী নামে খ্যাত এলাকাটিকে তার বিশেষত্বের কারণেই অভিহিত করেছিলেন এসপ্লানেড নামে। তাই এসপ্লানেড শব্দ চালু হওয়ার অনেক আগে থেকে চৌরঙ্গী শব্দ পরিচিত। তার ফলে চৌরঙ্গী শব্দটিই লেখা আছে সমস্ত নথিতে। পুরনো কাগজপত্রে যেমন এলাকাটার নাম চৌরঙ্গী, তেমনই রাস্তার নামও চৌরঙ্গী রোড।

এই চৌরঙ্গী নামটির রহস্য উদঘাটনেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন গবেষক, লেখক ও সরকারি কর্মচারীরা। তার দু'টি প্রধান কারণের একটি, এখানে যে-জঙ্গলময় এলাকা ও তার ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ ছিল, সেখানেই বাস করতেন নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু সাধু চৌরঙ্গীনাথ। তখন এই এলাকায় প্রবল উপদ্রব ছিল ডাকাতদের। তাই এলাকার নাম চৌরঙ্গী। কিন্তু ইতিহাসবিদ এ কে রায় বলেছেন, সাধু চৌরঙ্গী কখনও কলকাতায় এসে বসবাস করেছিলেন তার কোনও লিখিত প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় কারণের সূত্রপাত পুরাণ থেকে। কলকাতার তৎকালীন সেন্সাস রিপোর্টে লেখা আছে, 'বিষ্ণু যখন তাঁর চক্রের সাহায্যে সতীকে টুকরো টুকরো করে চিরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতময়, তখন সতীর এক চেরা পদাঙ্গুলি ছিটকে পড়েছিল এখানে, সেই চির বা চেরা শব্দ থেকেই উৎপত্তি চিরাঙ্গী বা চেরাঙ্গী শব্দটি। তা থেকেই চৌরঙ্গী।

তৃতীয় আর একটি কারণও খুঁজে বার করেছেন গবেষকরা। 'দ্য স্কোয়ার' শব্দটি হিন্দুস্থানিদের কাছে চৌরঙ্গী। স্থানীয় কিছু মানুষ এই জায়গাটির কথা বলতে গিয়ে ব্যবহার করতেন চৌরঙ্গী শব্দটি। তাইই—

এই উৎসটাও বোধ হয় একেবারে ফেলনা তা নয়!

যখন এসপ্লানেড বা চৌরঙ্গী কোনও নামই খ্যাত হয়নি, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালীঘাট পর্যন্ত চলাচলের একমাত্র রাস্তাটিকে তীর্থযাত্রীরা মুখে মুখে বলতেন, 'কালীঘাটে যাওয়ার পথ'। সাহেবরাও প্রথম-প্রথম উল্লেখ করতেন সেই একই নামে 'রোড টু কোলিগট'। হলওয়েল সাহেব কলকাতার যে-মানচিত্রে এঁকেছিলেন তাতেও লেখা 'রোড টু কোলিগট'।

ডিহি বিজরিই হোক, এসপ্লানেডই হোক, আর চৌরঙ্গীই হোক, এখন তার পূর্ব-ইতিহাস এখনকার নানা ঝকমকির আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছে কবে! এমনকী সেদিনকার ঝকঝকে মেট্রো কিংবা ছারপোকা-সমৃদ্ধ টাইগার কিংবা একটু আড়ালে থাকা যমুনা— সব প্রেক্ষাগৃহও ক্রমে হয়ে উঠছে ইতিহাসের অঙ্গ। বদলাবে আরও কত কী!

ছি ন্ন বি চি ন্তা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আড্রিয়াটিক সমুদ্রকূলের কাছে ছোট মফস্‌সল শহর রেকানাতি

পুঁথি থেকে দৃশ্যে। দৃশ্য থেকে স্বভাবতই পরিস্থিতিতে— স্থানে, জনে, সমাজবিভঙ্গে। পুঁথিও দেখার জিনিস। ছবিতে লেখায় মেলানো হোক, কি শুধুই লেখা। লেখার হরফ, বা হরফ বন্ধনও একরকমের ছবি। শুধু ছবি এঁকেও লেখা হত এককালে, মিশরে, সে হল প্যাপিরাসের পাতায় লেখা চিত্রলিপি। হরফবন্ধ, অর্থাৎ একটা পদ বা কথা প্রথম বাজিয়ে তোলে ধ্বনি, নিবিষ্ট হলে পরে তাতে ভেসে ওঠে বস্তু বা কোনও ভাবাংশ। যাঁরা পুঁথিকার, রচয়িতা, কুশের আসনে বসে চৌকির উপরে যখন পাতা ভরে তোলেন, ছন্দের নিক্কনের পাশাপাশিই তিনি দেখতে দেখতে চলেন তার লেখার বস্তু, ভাবনা। দীপ জ্বলতে থাকে কোণে, দীপমগুলের মাঝখানে সেই পুঁথি আর পুঁথিকার, বাইরে জগৎ নেই আর। আর পড়ুয়া পাঠক যিনি, তিনিও পুঁথি পাঠ করছেন তন্ময় হয়ে, পুঁথির বিষয়ের বাইরে তাঁরও জগৎ নেই।

পর্ব: ৪

চৌদ্দ বছর বয়সে মস্ত শুভদিন এল তাঁর জীবনে, বাবা যেদিন তাঁর বিশাল লাইব্রেরি খুলে দিলেন ছেলেকে। বহুদিন ধরে সঞ্চিত হয়ে ওঠা নানা ভাষা, নানা বিষয়ের বিপুল বিচিত্র সংগ্রহ।

জগৎকে কি সর্বৈব উপেক্ষা করা চলে? চলাচল রহিত রাখা যায় পথে, সামাজিক পথে? গিরিবাসী বনবাসী হলে এক কথা, না হলে লোকস্পর্শ, লোকের আসঙ্গ মানতেই হয়। তখন? যাঁরা লোক বুঝাইতে বা লোকের তৃপ্তিবিধান করতে সাহিত্য, কাব্য লেখেন তাঁরা লোকপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন উত্তরোত্তর। যাঁরা স্বাভিলাষী লেখা লিখতে বসেছেন? উনিশ শতকের কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী তিক্তকণ্ঠে বলেছিলেন : 'আগ্নভরা, বিষভরা, রে রে স্বার্থভরা ধরা', বরং তিনি ভাবছেন এদেশ ত্যেজে এমন কোথাও চলে যাই 'যথায় নগর গ্রাম নহে মানুষের ধাম / পড়ে আছে ভগ্ন অবশেষ।' সহজিয়া লেখকেরা মানুষের ধাম পরিহার করেই থাকতে চান সচরাচর। কিন্তু

লেখক তো যতি নন, সমাজেরই তিনি একজন। একজন বিদেশি কবির কথা এখানে বলি। বিশ্রুত পণ্ডিত এবং প্রসিদ্ধ, প্রভাবী ইতালীয় কবি, গিয়াকোমো লেওপার্দি। আত্মপরিচয় লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলেছিলেন : আমার জন্ম মহৎ বংশে, কিন্তু অতি ইতর শহরে। জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর তাঁকে সে ইতর শহরেই থাকতে হয়েছে। যতদূর সম্ভব না থেকে। কিন্তু তার ফলে পরম নৈরাশ্যবাদী বলে তাঁর পরিচয়।

আড্রিয়াটিক সমুদ্রকূলের কাছে ছোট মফস্বল শহর রেকানাতি, সেখানকার এক বড় মানুষের প্রাসাদোপম পুরীতে গিয়াকোমোর জন্ম, ১৭৯৮ সালে। বারো বছর বয়স অবধি বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর শিক্ষণ, তারই মধ্যে অভ্যস্ত করেছেন বেশ খানিকটা লাতিন, তা ছাড়া অলঙ্কার, ধর্মতত্ত্ব আর পদার্থবিদ্যার পাঠ। স্কুলে না গিয়ে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠার চেষ্টাই স্থির হল তারপর। চৌদ্দ বছর বয়সে মস্ত শুভদিন এল তাঁর জীবনে, বাবা যেদিন তাঁর বিশাল লাইব্রেরি খুলে দিলেন ছেলেকে। বহুদিন ধরে সঞ্চিত হয়ে ওঠা নানা ভাষা, নানা বিষয়ের বিপুল বিচিত্র সংগ্রহ। কিশোর শিক্ষাভিলাষী পরম আগ্রহে ঘাঁটতে শুরু করলেন সে মহার্ঘ্য ভান্ডার। সারাদিন, তারপর বহু রাত পর্যন্ত কাটতে লাগল তাঁর লাইব্রেরিতে। সতেরো বছর বয়সের মধ্যে বহু পাঠের পাশে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে, পুরনো ক্লাসিক্যাল লেখকদের ভুলভ্রান্তি বিষয়ে আস্ত বই ছাড়াও নাটক, কবিতা, অনুবাদের বই। দার্শনিক সন্দর্ভ এবং বহুতর উচ্চাশী লেখা লিখে ফেললেন পর পর। সন্ধ্যায় সমুদ্রের ঠান্ডা বয়ে যায় প্রাসাদের কক্ষগুলির মধ্য দিয়ে। মরিয়া হয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে, পাগলের মতো তিনি নিবিষ্ট হয়ে আছেন শুধু পড়ায়, কিংবা রচনায়। আঠারো বছর বয়সে একদিন যখন আয়নার মধ্য দিয়ে নিজেকে চোখে পড়ল, শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে, কুঁজ গজিয়ে গিয়েছে পিঠে। আর বিশ বছর না হতে নিজেকে তাঁর কুচ্ছিৎ, বিধ্বস্ত বলে বোধ হল।

একুশ বছর বয়সে লেওপার্দি বুঝলেন রেকানাতির ছোট মফঃস্বল শহরে তাঁর কিছু পাওয়ার নেই। তাঁর অমন বিশাল প্রাসাদ, বিপুল বইয়ের সংগ্রহ হঠাৎ তাঁর কয়েদখানা বলে বোধ হতে লাগল। এতখানি বয়স পর্যন্ত তিনি বাইরে কোথাও পাননি। নিজে আয় করতেও শেখেননি। দেখলেন বাবার দেওয়া মাসোহারা ছাড়া তাঁর কোনও নির্ভর নেই। ছেলের পাণ্ডিত্য নিয়ে বাবার গর্বই ছিল। কিন্তু সে যে কবিতাও লেখে, তার মধ্যে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত কবিতাও আছে, জানতে পেরে প্রমাদ গুনলেন তিনি। অস্ট্রিয়া তখন উত্তর ইতালির বৃহদংশ অধিকার করে আছে। অস্ট্রিয়া সরকারের গুপ্তচর চারিদিকে। তাদের নজরে পড়লে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা তাঁর বারে বারে মনে হতে লাগল। তার একটা কারণের কথা তাঁর লেখার মধ্যে উল্লেখ করেছেন লেওপার্দি। তাঁর নিরন্তর মনে হতে লাগল। বাবার নির্ভর হয়ে থাকলে তিনি কখনও পুরো মানুষ হয়ে উঠতে পারবেন না। অবশেষে চব্বিশ যখন বয়স, সত্যিই তিনি বাড়ি ছাড়লেন, এক কাকার সঙ্গ নিয়ে চলে গেলেন রোম নগরীতে।

বিশ্রুত রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতিজড়িত বৃহৎ রোম নগরী। আসার কালে মনে হয়েছিল চলেছেন ফলদ ভাগ্যের অন্বেষণে, এসে দেখলেন মিনার-সৌধে পরিকীর্ণ পাষাণময় নগরী, লোকেরা বাইরের সব প্রত্যাহার করে কেবল অন্দরে আত্মগত। মলিন ছোট মফঃস্বল শহরে দিনগুলো একঘেয়ে, কিন্তু একে অপরকে চেনে, চাইলে ঘনিষ্ঠতা করা যায়, মানবিক সম্বন্ধের তাপও আছে তাতে। বড় শহরে সব চাইতে ভয়ঙ্কর তার অমানবিক উদাসীনতা। লেওপার্দির মনে হল রোমের অতিকায় সব স্থাপত্য, বীরত্ব চিহ্নিত স্থান যেন মানুষের সাথে মানুষের মেলার বাধা হয়ে আছে, তার বিশাল আয়তন মানুষের মধ্যে শুধু দূরত্ব রচনা করেছে। রোমকে তাঁর অমানুষী, দানবিক মনে হতে লাগল। রেকানাতির নিঃসঙ্গ জীবন ছিল একরকম, বইপত্রের সঙ্গ ছিল ইচ্ছা হলে, রোমের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজেকে তাঁর দুঃস্থ, বিধ্বস্ত মনে হতে লাগল। পরে বলেছেন, সমূহ বা mass identity-র মধ্যে ব্যক্তিকে যা বিলয় করে দেয়, তাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না।

> রেকানাতি এখন শুধু তিক্ত নিঃসঙ্গতায় ভরা। বইয়ের সঙ্গ আর ভালো লাগে না। কাজেই চূড়ান্তভাবে বসলেন কেবল লেখায়।

রেকানাতিতে লেওপার্দির মূর্তি

শুধু বন্ধুত্বের, ভালোবাসার কথা ভেবে, সেই টানেই রেকানাতিতে ফিরে এলেন লেওপার্দি। ফিরে তো এলেন, কিন্তু সেই পিতৃনির্ভরতা। সে ফের দুর্বহ লাগতে লাগল এবারে। এমন সময়, প্রায় অপ্রত্যাশিত নিষ্কৃতির মতো মিলানের এক প্রকাশক তাঁকে কিকেরো-র একটি সংস্করণ প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। মনোমতো কাজও বটে তাঁর। কিন্তু মিলান তখন রাজনৈতিক আবর্তের একটা কেন্দ্র, রোমের মতো ব্যক্তিকে নিয়ে তারও মাথাব্যথা নেই। অনেকখানি আশা করেছিলেন, কিন্তু এখানেও কারও আগ্রহ, কারও নজর তিনি পেলেন না। ক'মাস না যেতেই চলে গেলেন দক্ষিণে, বোলোনায়। এখানকার গ্রামীণ শহরের শিক্ষিত শীলিত পরিবেশে লেওপার্দি শেষ পর্যন্ত স্বস্তি পেলেন। ঘরবাড়ি, রাস্তা, রাস্তার পাশে পাশে পথচারীদের পথ— সব মিলিয়ে নিকট, অন্তরঙ্গ বোধ হল। বোলোনার সাহিত্যসমাজেও তিনি সুগৃহীত হলেন। তাঁর কাব্য, পাণ্ডিত্য দুয়েরই স্বীকৃতি হল এখানে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর এতদিনে নিজেকে তাঁর সফল মনে হল। কিছুদিন বোলোনায় কাটিয়ে, গেলেন তিনি ফ্লোরেন্সে, তারপর পিসায়। ১৮২৫-এ এসেছিলেন

মিলানে, ১৮২৭ পেরিয়ে গেল এইভাবে। এর মধ্যে স্থায়ী কোনও নিয়মিত আয়ের উপায় তিনি করে উঠতে পারলেন না। অতএব নিজ গৃহে ফিরে না গিয়ে আর উপায় কী? কিন্তু রেকানাতি এখন শুধু তিক্ত নিঃসঙ্গতায় ভরা। বইয়ের সঙ্গ আর ভালো লাগে না। ইতিমধ্যে দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কাজেই চূড়ান্তভাবে বসলেন কেবল লেখায়। তাঁর নিজস্ব ভাষায় পরমা শুদ্ধতার আত্মপ্রভায় সব কবিতা, আর উজ্জ্বল চিন্তার বা দর্শনের প্রণালীবিহিত সব গদ্য লেখায়। এতদিনে স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন, সত্যিকার সুখ, মানুষে যা চায়, দুনিয়াতে সে অলভ্য; যদি পারে, সুখ সে পেতে পারে একমাত্র মনে মনে বিভ্রম রচনা করে নিয়ে। কিন্তু আধুনিক মানুষ তার প্রবল জ্ঞানস্পৃহায় যাবতীয় মায়া বা বিভ্রম মূলেই ধ্বংস করে ফেলেছে। কবি সেই মায়া রচনার ক্ষমতাকে পুনরায় গড়ে তুলতে চান। লেওপার্দির পক্ষে নৈরাশ্যযাতনার থেকে অব্যাহতিও স্বরচিত মায়ামণ্ডলে।

দেহদুঃখ, অপরিচয়ের দুঃখ, খ্রিস্টিয়তায় বিশ্বাসভঙ্গ— সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর নেতি বা শূন্যতার মুখোমুখি হয়ে, লেওপার্দি লিখেছেন। তাঁর দম আটকে আসছিল চারিদিকের অনন্ত না-এর মাঝখানে। একটা বিভ্রম না হলে তাঁর ক্ষণকালও আশ্রয় মেলে না। নিজের বিধ্বস্ত পরিস্থিতি আর নিঃসহায় চেতনার পরিক্রান্ত স্বচ্ছ একটা রূপ লিখে তুলতে চেষ্টা করলেন তিনি গদ্যে পদ্যে। তাঁর সামাজিক লেখার ভাগ সামান্য হলেও তার একটা উল্লেখ জোড়া দি এখানে। সে হল হোমারের নামে প্রচলিত 'বাত্রাকোমুয়োমাখিয়া' ব্যঙ্গকাব্যের নিদর্শে লেখা একখানি অনুকৃতিকাব্য, সেখানে ভেক আর মূষিকের রূপে সমকালীন অস্ট্রিয়াবিজিত ইতালির তথাকথিত দেশপ্রেমী বীরদের কথা আর কৃতির তীক্ষ্ণ পরিহাস। আমার সম্পাদিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' বইয়ের আলোচনায় বিশদে তার কথা লিখেছিলাম।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৮৩০-এ ফ্লোরেন্সের এক ধনবান অনুরাগী বন্ধুর আর্থিক পোষকতার আশ্বাসে তিনি বাস নিলেন গিয়ে ফ্লোরেন্সে। বন্ধু আনতোনিয়ো রানিয়েরি। জীবনের শেষ সাত বছর বন্ধুর আশ্রয়ে এখানেই তাঁর কেটেছে। অন্য রচনার মধ্যে এখানে তাঁর পর্যবেক্ষণের চিন্তাকণিকার একখানি দিনলিপি পুস্তক ছিল 'জিবালদোনে', আর তার পরিশেষ্টোপম সুভাষিতের বই 'পেনসিয়েরি'। ১৮৩২-এ ফ্লোরেন্স থেকে রানিয়েরির সঙ্গে হাওয়াবদল করতে গিয়েছিলেন নেপলসে, সেখানেই 'জিবালদোনে' লেখার পরিসমাপ্তি। 'পেনসিয়েরি'ও দীপ্তিমান চিন্তাকণা। মৃত্যুর আট বছর পর 'একশো এগারো পেনসিয়েরি' নামে রানিয়েরিই সে বই প্রকাশ করেন।

'পেনসিয়ারি'র প্রথম সংস্করণ

পুঁথি থেকে দৃশ্যে। দৃশ্যে নেমে দাঁড়িয়ে জীবন আর জগৎকে কীভাবে পেলেন লেওপার্দি? দৃশ্যে প্রথমেই চোখ যায় রমণীয় প্রকৃতিতে। সুখী লোকেও আনমনা হয়ে পড়ে যে রম্য বিস্তারের মাঝখানে। লেওপার্দি কীভাবে দেখলেন? মায়া বা অধ্যাস নয়, 'জিবালদোনে'তে লিখেছেন, প্রকৃতি হল চিত্তহীন নিষ্ঠুরা শক্তি, সৃষ্টি আর বিনাশের পারস্পরিক বিধানে যাবতীয় প্রজাতির সৃষ্টি করে তারপর জন্মমুহূর্ত থেকেই তাদের ধ্বংস করার জন্য তাড়া করে ফিরছে। নিয়মিতভাবে, চিরন্তনভাবে সে জীবনের স্রষ্টা ও তার প্রাণঘাতী শত্রু।

> লেওপার্দি দেখেছেন, সভ্যতার অগ্রগতি হয়, জনগণ উপকৃত হয়, কিন্তু ব্যক্তি তার শক্তি, তার রুচি, তার পরিশীলন, তার সুখ হারিয়ে ফেলে।

মানুষের দেখা পেলেন কী রূপে, তারও একটুখানি তুলে দি 'পেনসিয়েরি'র দর্শনকণিকা। লেওপার্দি দেখেছেন, সভ্যতার অগ্রগতি হয়, জনগণ উপকৃত হয়, কিন্তু ব্যক্তি তার শক্তি, তার রুচি, তার পরিশীলন, তার সুখ হারিয়ে ফেলে। দেখেছেন, কোনও কিছু পাওয়ার আশায় আপ্রাণ শ্রম আর কষ্ট করেও যা পাওয়া গেল না আর একজনের বিনাশ্রমে সহজেই তা পেয়ে গেল। কিন্তু এই অশ্রমে অনায়াসে পাওয়া নিতান্ত ঘৃণাজনক। যেমন ঘৃণাজনক কাজ না করে সারাদিন ঘামঝরানো শ্রমিকদের সমান মজুরি পাওয়া। আরও দেখেছেন সমাজের সংখ্যাগুরু জোটবদ্ধ বদমাশদের। কদাচিৎ তারা নিম্নবিত্ত। একটা সৎ লোক যদি দারিদ্র্যে পড়ে, কেউ তার সাহায্যে এগোয় না। বরং মজা করে তাকে নিয়ে। কিন্তু একটা বদমাশ যদি বিপাকে পড়ে সারা শহর ছুটে যায় তাকে তুলতে। কারণ খুবই স্পষ্ট। আপনার লোকের দুর্দশায় স্বভাবতই আমরা বিচলিত হই, তেমন দুর্দশায় আমরাও পড়তে পারি আশঙ্কায়। কাজেই যে যা পারে তাকে সাহায্য করতে ছোটে, না হলে তাদের বিপদ হলে অনুরূপ ব্যবহার পাবে না। তা ছাড়া তাদের যে জোট আছে তারই স্বার্থে প্রয়োজনে সবার সাহায্যে আসা তারা বাধ্যতামূলক বলে মানে। যদিও জানে এতই উপায় তাদের আয়ত্তে আছে যে কোনও বিপদই তারা সামলে দিতে পারবে।

লেওপার্দি পুঁথি থেকে দৃশ্যে নেমে দাঁড়িয়ে যা দেখেছেন তাতে দেখি সৎ সাধারণ লোকের পক্ষে বড়ই সঙ্কুল এই দুনিয়া। মিথ্যা আর কপটতার কাছে সম্ভাবনা পদে পদে লাঞ্ছিত। কাজেই মানুষের অনুভূতির পরমা অবস্থাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন noia, যার সাধারণ অর্থ হল বেদনা বা দুঃখ, দান্তে এই অর্থেই noia শব্দের ব্যবহার করেছেন। লেওপার্দি 'জিবালদোনে'তে বলেছেন, সে হল সর্বাত্মক না-এর সন্তান, আর শূন্যতার জননী।

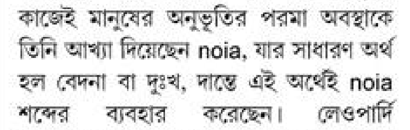

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** *সংগীত ও পরিচালনা:* **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার** *গান:* **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায় ₹৯৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র কিংবা সমকালীন রূপকথা।

₹২০০

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: info@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

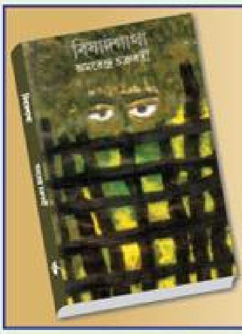

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান
অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস।
নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।
₹২০০

Subscribe Online ▸www.swarnakshar.in

ভ্রমণ
www.bhraman.com

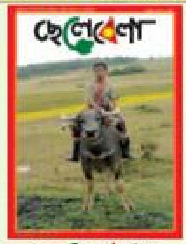
ছেলেবেলা
www.echhelebela.com

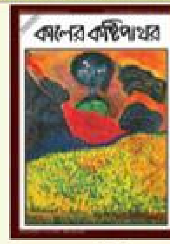
কালের কষ্টিপাথর
www.ekashtipathar.com

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

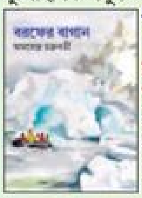
বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার রহস্যময়
তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০

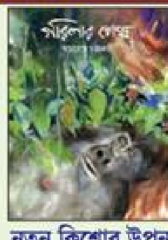
নতুন কিশোর উপন্যাস
গরিলার চোখ ₹৮০

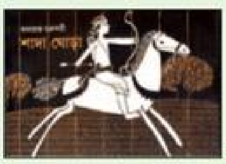
শাদা ঘোড়া ₹৩০

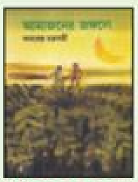
আমাজনের জঙ্গলে
সপ্তম মুদ্রণ ₹৭০

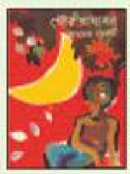
গৌর যাযাবর
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১২০

লেখকের অন্যান্য বই: ঋষিকুমার ₹২০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ ভূতের বাঁশি ₹৪০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি ₹২০

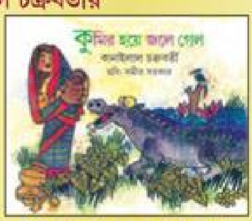
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

Buy Online ▸www.swarnakshar.in

সিডি হীরু ডাকাত বই

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে
জমজমাট
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
হীরু ডাকাত
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি
সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়। ₹৯৯

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ
করা ডাকাতের গল্প

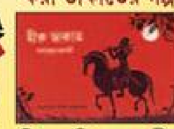
শিশুসাহিত্যে জাতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত।
৯ম মুদ্রণ ₹৪৫

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

১ম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com
www.ekashtipathar.com

আমাদের সব বই
সব পত্রিকা ও
হীরু ডাকাতের সিডি
এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম
চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা ₹৫০ আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০ আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া।
সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান।
অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 2 No. 10 □ 1 June 2014 □ Rs. 30
RN WBBEN/2012/50069 Postal Regn. No. KOL RMS/460/2014-2016

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com